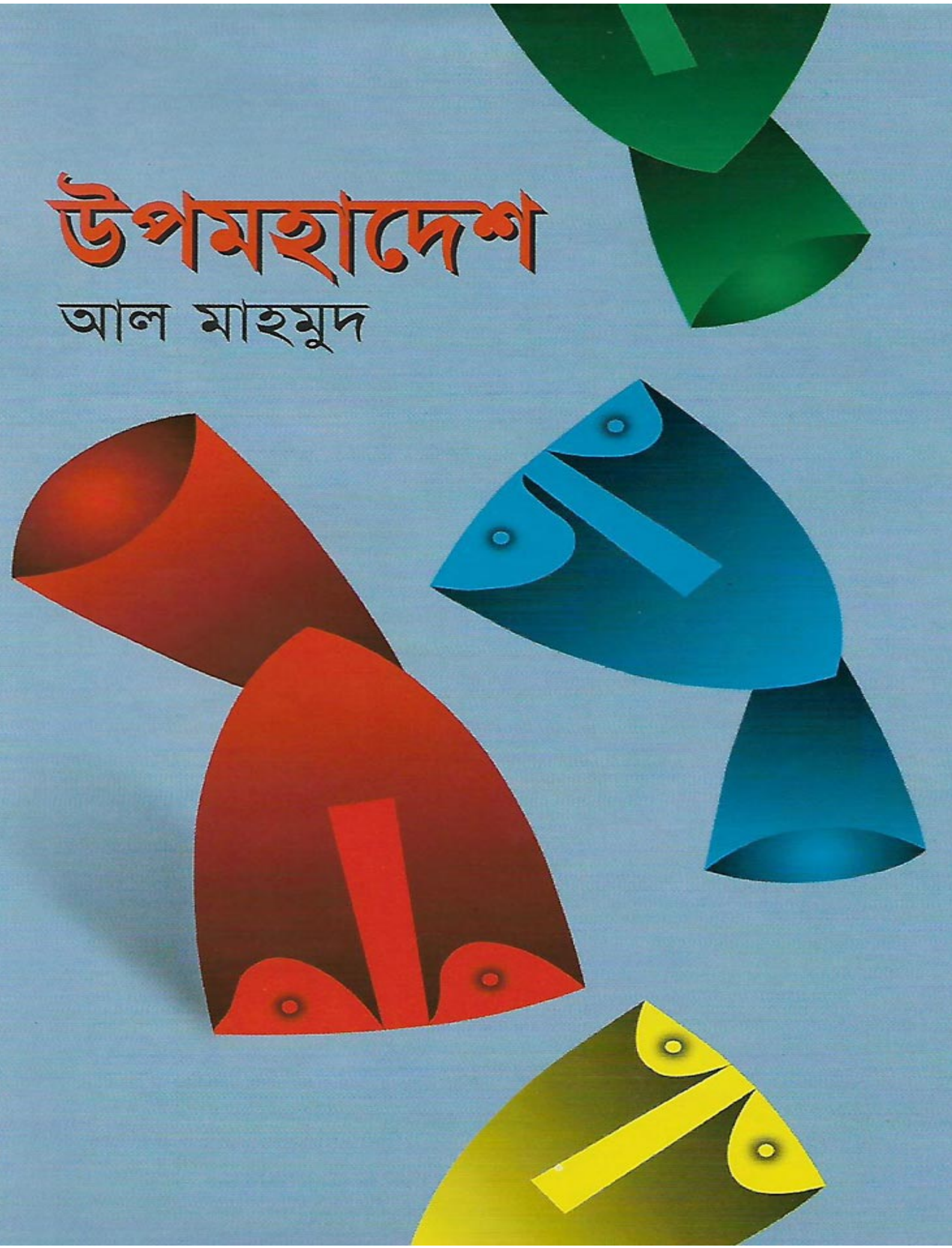
উপমহাদেশ

আল মাহমুদ



০১. অন্ধকারে হঠাৎ গুলীর শব্দ

এ বইয়ের সকল চরিত্রই কাল্পনিক। তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, আমলা, বুদ্ধিজীবীর নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে কেবল মুক্তিযুদ্ধে তাদের সম্পৃক্ততাকে সম্মানিত করতে। তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন বলেই। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের কাহিনীর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। উপন্যাস তো উপন্যাসই।

–লেখক

০১.

অন্ধকারে হঠাৎ গুলীর শব্দে নৌকাটা দুলে উঠল। যাত্রীরা উবুড় হয়ে পড়ল এ- ওর গায়ের ওপর। নৌকার পেটের ভেতর থেকে ময়লা পানির ঝাপটা এসে আমার মুখটা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিল। সার্ট ও গেঞ্জির ভেতর ছলছলানো পানি ঢুকে ঝুলতে লাগল। আর ফোঁটা ফোঁটা চুঁইয়ে পড়তে লাগল পাটাতনে। ততক্ষণে বুড়ো মাঝি ও তার ছোটো ছেলেটা বৈঠা গুটিয়ে নিয়ে পাটাতনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। কে একজন ছিটকে এসে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। কান্না ও শরীরের ছোঁয়াতেই আমার বুঝতে বাকি রইল না, একটা মেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাচ্ছে। আমার অস্তিত্বের সমর্থন পেয়েই কিনা জানি না, মেয়েটার কান্না আরও শব্দ করে একটু রোদন বা বিলাপের মতো হয়ে উঠল। আর সাথে সাথেই আখাউড়ার দিক থেকে সারিবাঁধা পটকা ফাটানোর মতো গর্জন করে বইতে লাগল গুলীর শব্দ। সীসার বাতাস কেটে চলে যাওয়ার শিস উঠছে। এর মধ্যেই আমাদের গাইড আনিসের বাজখাই গলা শোনা গেল, কে কাঁদছে? এই হারামজাদি একদম চুপ করে থাক।

ধমক খেয়ে মেয়েটার ফোঁপানি বিকৃত হয়ে অবরুদ্ধ গোঙানির মতো হয়ে উঠল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করব। মেয়েটা আমার পিঠের ওপর উবুড় হয়ে আমাকে দুহাতে জাপটে ধরে কাঁদছে।

আনিসের গলা যে এতটা রুঢ় ও দয়ামায়াহীন হয়ে উঠতে পারে একটু আগেও এই নৌকার কেউ আমরা আন্দাজ করতে পারি নি। যদিও আমার সাথে পরিচয় হওয়ার সময়ই আমি আনিসকে সশস্ত্র দেখেছি। দেখেছি চাদরের ভেতরে উঁচু হয়ে আছে এস, এল, আর- এর ঝাফরিকাটা ছোট নল। তার কোমরের বেল্টে সাবধানে ঝুলিয়ে রাখা দুটি হ্যাণ্ড গ্রেনেডও হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম। যেন দুটি বারুদের পাকা ফল নিয়ে আনিস হাঁটছে। কিন্তু আমার কাছে যখন নিজের পরিচয় দিয়ে চাটগাঁ থেকে আগরতলায় পালিয়ে যাওয়া আমার বোন ও ভগ্নীপতির লেখা একটি

চিঠি হস্তান্তর করে বলল, আপনাকে আমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আগামীকাল ভোরে, রাত থাকতেই রওনা হব। তৈরি হয়ে থাকবেন। কোনো ভারী বোঝা নেবেন না। আসি তাহলে।

আমি এমুহূর্তে দেশ ছেড়ে পালাব কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই ছেলেটা কথাগুলো বলে খামটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। তার দাড়িভরা মুখের আকৃতিটা ঠাহর করতে না পারলেও, হাসির মধ্যে এক ধরনের বিশ্বস্ততা দেখে আমি আর কথা বলতে পারি নি।

এখন এই আনিসের কাছ থেকেই এমন একটা রূঢ় ধমকানি বেজে উঠবে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমি ফিসফিস করে বললাম, দাঁড়াও, আমি সামলাচ্ছি। আমরা কি ধরা পড়ে যাবো?

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমরা ঘাটের কাছে এসে পড়েছি। ওরা সম্ভবত নৌকাটিকে আঁচ করে ফেলেছে। এখন নৌকার মধ্যে কান্নাকাটি আর হুটোপুটি শুরু হলে নাওটা ডুবে যাবে। তাছাড়া শত্রুরাও টহল বোট নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তখন আমরা পালিয়ে বাঁচলেও মেয়েরা আর বাচ্চাগুলো গুলী খেয়ে মরবে।

অনুচ্চকণ্ঠে আনিস পরিস্থিতিটা আমাকে বুঝিয়ে দিল। আমি বুঝলাম, আনিস আমার খুব কাছেই উবুড় হয়ে আছে। যদিও অন্ধকারে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু একটু নড়াচড়ার মুহূর্তে তার ধাতব অস্ত্রের নল আমার মাথায় ঠুকে যাওয়াতে বুঝলাম সে নদীর দিকে এসএল, আরটা বাগিয়ে পজিশন নিয়ে আছে। আমি অন্ধকারেই আমার কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম। আনিসের গলার স্বর নেমে এল, লাগল?

না।

মেয়েটাকে ফোঁপাতে মানা করুন। এ অবস্থায় কান্নাটা খুব খারাপ। একবার অযথা ভয় ধরে গেলে নৌকার সবগুলো মেয়েছেলে আর বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে। বাঁচবার জন্য হুটোপুটি করে নাও টলিয়ে দেবে। আপনার কথাতেই তো এতগুলো মেয়ে যাত্রীকে নৌকায় তুললাম।

আনিস আমার বিরুদ্ধে একটু অনুযোগ করল। কারণ নারায়ণপুর বাজার থেকে গতকাল শেষরাতে নাও ভাসাবার সময় ভৈরবের এক শিক্ষয়িত্রী ও তার বোনকে আমাদের সঙ্গে নিতে আমি আনিসকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম। মেয়ে দুটি সত্যি অসহায় হয়ে পড়েছিল। শিক্ষয়িত্রীর স্বামী ২৩শে মার্চ ঢাকায় গিয়ে আর ফেরে নি। এদিকে ভৈরব ও আশুগঞ্জে যখন পাক হানাদার এসে ঢুকল তখন অন্যান্য পলায়নপর মুসলিম। পরিবারের সাথে এরাও নারায়ণপুর বাজারে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচায়।

আমাদের নৌকা শেষ রাতে যখন ঘাট ছেড়ে ভাসানোর তোড়জোর চলছে তখন খালের পার ধরে মেয়ে দুটি দৌড়ে এসে আনিসের হাত চেপে ধরে, আমাদের নিন। আমরাও আর সকলের মতো ভাড়া দেব। শুধু বর্ডারটা পার হতে পারলেই হল।

আনিস বলল, আমাদের এ নৌকায় তিরিশ জনের বেশি যাত্রী ধরে না। এর মধ্যেই বত্রিশ জন উঠে বসেছে। বাচ্চাগুলোকে তো গুণতিতেই ধরি নি। আমি আর রিস্ক নিতে পারি না। আপনারা পরের কোনো নৌকায় আসুন। আর না হলে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন। আমরা দরকারি কাজে আবার এদিকে আসবো। তখন আমাদের সাথে যাবেন।

আনিস না বলাতে মেয়ে দুটি একসাথে আর্তনাদ করে উঠেছিল। না, তাদের নিতেই হবে। তাদের যুক্তি হল তাদের কোনো আশ্রয় নেই। নারায়ণপুর বাজারে একটা খোলা চালার নিচে তারা দেড়টা মাস কাটিয়েছে। এখানকার হিন্দুরা অনেক আগেই অর্থাৎ ঢাকায় ২৫শে মার্চের ঘটনার পর দিন থেকেই বর্ডার পার হবার জন্য সীমান্তের দিকে ছুটছে। শিক্ষয়িত্রী সীমা ও নন্দিনী শুধু যেতে পারে নি। কারণ তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভরসা রেখেছিল যে অজয় ঢাকা থেকে নিরাপদে ফিরে আসবে। কিন্তু ভৈরবের তরুণ ব্যবসায়ী ও আড়তদার অজয় চক্রবর্তী যখন মে মাসের সাত তারিখেও ফিরল না, তখন সীমা ও নন্দিনী আশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এদিকে ভৈরব থেকে ক্রমাগত উদ্বেগজনক খবর আসছিল যে হানাদাররা নারায়ণপুর বাজারেও হানা দিতে পারে। আর সীমাদের চেনাশোনা যুবকগণ যারা ভৈরবের আশপাশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো থেকে এই নিরাপদ অঞ্চলে এসে জুটেছিল তারাও একে একে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে কিংবা অস্ত্রের ট্রেনিং নিতে আগরতলা পাড়ি জমাতে লাগল। এ অবস্থায় হতোদ্যম একজন মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও তার কলেজে পড়া বোন আর কতদিন এখানে স্বামী ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারে?

আমি মেয়ে দুটোর কাতরতা দেখে বিব্রত হয়ে আনিসকে বললাম, ভাই, এদের নাও। আমি বরং পরের সপ্তাহে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমি তো মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয়েই আছি। আর স্থানীয় ছাত্ররাই আমাকে দেখাশোনা করছে। আমি বরং আমার স্ত্রীর জন্য আর কয়েকটা দিন এখানেই অপেক্ষা করি। তারও তো কোনো খবর পাচ্ছি না। অথচ সে আমার এখানে এসে পৌঁছার দুদিন আগেই আমার ছোটো ভাইয়ের সাথে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছে। হানাদার বাহিনী ভৈরব দখলের অন্তত দুদিন আগেই আমার স্ত্রী হামিদার ভৈরব বাজারে আমার ছোটো বোনের বাসায় এসে পৌঁছার কথা। যদিও আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছে ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের বাড়িতে এসেই থাকবে। সেও শিক্ষিকা। চিন্তাভাবনাও সাদামাটা। তার ধারণাটা ছিল পঁচিশে মার্চের ঘটনাটা একটু বাড়াবাড়ি হলেও, সাময়িক। শেখ মুজিবের সাথে ইয়াহিয়া খানের শেষ পর্যন্ত সমঝোতার ব্যাপারে হামিদার তেমন সন্দহ ছিল না। যেমন ছিল না আমারও। কিন্তু সবকিছু

গোলমাল হয়ে গেল যখন বাঙালিরা তাদের জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে পা বাড়াল। অর্থাৎ পাকিস্তানী সামরিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিজেরাও সামরিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

হামিদা একদিন আগে রওনা হয়েও ভৈরব বা পরিচিত আত্মীয় স্বজনের বাসায় যখন এসে পৌঁছাল না তখন স্বভাবতই আমার মনে উৎকণ্ঠার তুফান বইতে লাগল। এর মধ্যে একবার একটা উড়ো খবর পেলাম। একজন তরুণ গায়ক এসে বললো, স্যার, আমি আর্টস কাউন্সিলের স্টাফ আর্টিষ্ট। আপনার ভাই ও স্ত্রীর খবর আমি জানি। তারা ইণ্ডিয়ায় চলে গেছে। ঢাকা থেকে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গিয়েছিল। কিন্তু শহরটা পাকিস্তানীদের দখলে চলে যাওয়ায় তারা ভৈরবে আসতে চেয়েছিল। যখন জানল যে, ভৈরব ও আশুগঞ্জের পতন হয়েছে তখন একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সাথে আপনার স্ত্রী সীমান্ত পার হয়ে গেছে।

ছেলেটিকে আমি আর্টস কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে মাঝে মধ্যে দেখেছি এতক্ষণে মনে পড়ল। আমি বললাম, তুমি জানলে কি করে আমার স্ত্রী ইণ্ডিয়ায় পালাতে পেরেছে? তুমি কি আমার স্ত্রীকে চেনো?

ছেলেটি বলল, বারে, আপনি আমাদের লাইব্রেরিয়ান। আমি প্রায়ই সঙ্গীত বিষয়ক বইপত্রের জন্য আপনাকে বিরক্ত করে থাকি। সেখানে আপনার কাছে আপনার ম্যাডামকে আসতে দেখি না বুঝি? আপনি এখন সম্ভবত আমাকে ঠিকমত রিকগনাইজ করতে পারছেন না। তাছাড়া আপনার ভাই আরিফও তো আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। আমরা অন্নদা স্কুলের ছাত্র। আমিও তো কাজীপাড়ারই ছেলে।

এবার ছেলেটিকে আমি খানিকটা চিনতে পারলাম। সেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে বলেই তার বক্তব্যে আমার উদ্বেগ কেটে গেল। তাছাড়া আমি আর্টস কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক আর সে সেখানকার স্টাফ আর্টিষ্ট। প্রায়শই হয়তো দেখা সাক্ষাৎ ঘটে। তবে আমার পেশাগত অন্যমনস্কতার দরুণ আমি বোধহয় ছেলেটির প্রতি তেমন মনযোগী ছিলাম না। এখন তার দিকে ভাল করে তাকালাম, তুমি কি ভাল করে জানো, আমার স্ত্রী বর্ডার ক্রস করেছে?

হ্যাঁ জানি। রামরাইলের ব্রীজে মুক্তিযোদ্ধারা শেষ প্রতিরোধ বাঁধিয়েছিল। কিন্ত টেকেনি। এসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সব শহরবাসী ইণ্ডিয়ার দিকে পালিয়ে যায়। ঐ পালানো লোকদের মধ্যে আমি ও ভাবি ছিলাম। আমরা সিঙ্গারবিলের দিক দিয়ে বর্ডার ক্রস করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা দুজনের গ্রুপ করে করে হানাদারদের চোখ এড়িয়ে একটা পাহাড়ের টিলায় উঠে যাচ্ছিলাম। টিলার ওপাশেই ভারত। প্রথম গ্রুপেই ছিলেন আপনার স্ত্রী। তখন আমার ভাই আরিফকে আর দেখি নি। এরা টিলায় উঠে নিরাপত্তা সংকেতও পাঠিয়েছিল। এরপর এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ ভারত বর্ডারের ভেতরে চলে গেলে আমরা আরও দুইজন যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি তখুনি শুরু হল হানাদারদের গুলী। আমি হলপ করে বলতে পারি আপনার স্ত্রী নিরাপদে ভারতের

মাটিতে পা দিয়েছেন। তবে তিনি এখনও সেখানে আছেন কিনা, না আবার দেশের ভেতর ফিরে এসেছে, তা আমি জানি না। ছাত্র ও শিক্ষকেরা তো আবার দেশের ভেতর ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের খুঁটিনাটি কাজ শুরু করেছে। আপনি এদের জন্য আরও কয়েকটি দিন অপেক্ষা করে দেখুন। যারাই আগরতলা থেকে দেশের ভেতরে এ্যাকশানে আসছে তাদের সকলেই তো নারায়ণপুর, রায়পুর ইত্যাদি এলাকায় এসে জমা হচ্ছে। এখানেই ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা রাজনৈতিক ক্যাডাররা বেশি জমা হয়েছে। আপনার ভাইও আসবেন।

এই ঘটনার পর আমিও আরও কয়েকটা দিন নারায়ণপুর আমার আশ্রয়দাতাদের বাড়িতে অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার বোন ও ভগ্নীপতির কাছে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের মারফত আমার অবস্থানের খবর জানিয়ে আগতলায় চিঠি পাঠালে তারা আনিসের মারফত অবিলম্বে আগরতলায় চলে যেতে চিঠি দেয়। সেই চিঠিই আনিস আমাকে পৌঁছে দিয়ে এখন আমাকে এনে নৌকায় তুলেছে।

এসময় মেয়ে দুজন এসে আমার হাত ও কাঁধ জড়িয়ে ধরলো, না, আপনি কেন আমাদের জন্য নেমে যাবেন। আমরা দুটি মাত্র প্রাণী উঠলে আর এতবড় লম্বা নাও ডুবে যাবে না। আমাদের নিতে হবে। অবলা মেয়েমানুষকে আপনারা এখন কোথায় ফেলে যাবেন? অগত্যা আনিসকে রাজি হতে হল। এখন আনিস আমাকে সেই খোটাই দিচ্ছে।

আমি মেয়েটার, আমাকে জড়িয়ে ধরে, এই ফোঁপানি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। নৌকায় ওঠা অবধি দুবোনকে সামনে গলুইয়ের কাছে পাটাতনে দুটি ত্রস্ত চড়ুইয়ের মত কাঁপতে দেখছিলাম। কোনো কথা হয় নি। নৌকোর বত্রিশজন যাত্রীর মধ্যে আমি ও আনিস ছাড়া আর সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সকলের চোখ মুখই ফ্যাকাশে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঠের মতো নিষ্ক্রিয়, অসাড়। এর মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। একবার আমি ভয়ে নিশ্চল মেয়ে দুটিকে তাদের পরিচয় ও নামধাম জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলাম তাদের সমস্যাও আমার মতোই। তারাও তাদের অভিভাবককে হারিয়ে খুঁজছে। তার নাম অজয় আড়তদার। অনেক টাকা নিয়ে সে ঢাকায় মাল কিনতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। সেও কি ঘটনাচক্রে বা দৈবক্রমে ভারতেই পালিয়েছে? আমি একবার এদের পরিচয় জানতে গিয়ে এদের কার কী নাম তা জিজ্ঞেস করতেই ছোটো বোনটি আগে জবাব দিল, আমি নন্দিনী। আর ইনি আমার বোন সীমা। ভৈরব রেলওয়ে স্কুলের হেড মিসট্রেস। ২৩শে মার্চ আমার জামাই বাবু ঢাকা গিয়ে আর ফেরেন নি। আমরা এখন কোথায় যাবো, কি করব বুঝছি না। আমাদের বাঁচান।

শেষ বাক্যটা এমন মর্মান্তিকভাবে উচ্চারিত হল যে আমি পর্যন্ত ভয় পেলাম। নন্দিনীর চোখ ভয়ে বিস্ফারিত। দেখতে মেয়েটি গৌর বর্ণের হলেও উদ্বেগ- উৎকণ্ঠার জন্য তার দিকে চোখ রাখা যায় না। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। পরনে একটি ভারতীয় ছাপা শাড়ি। হলদেটে কালো ব্লাউজ। শাড়ির আঁচলে বাহু দুটি ঢাকা থাকায় স্বাস্থ্যের দীপ্তিটা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তবে নৌকায় বসার ধরন ও

নাওয়ের দুলুনিতে অভ্যস্ত থাকার লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। তার বিশাল বেণী যেন নদীতে একটা সাপ নেমে যাওয়ার কসরৎ করছে।

সীমা দীর্ঘাঙ্গী ও একটু আলুথালু। শাড়ির আঁচল অসাবধানে বুক থেকে সরে যাওয়াতে তার পূর্ণ নারীরূপ আমি একবার দেখে ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তার বর্ণও গৌর। নাক টিকলো। চোখে শিক্ষিকার অপরিহার্য চশমা। সম্ভবত চোখ তেমন খারাপ নয়। ভ্রূরেখা স্পষ্ট। চুল খোঁপায় শক্ত করে টেনে বাঁধায় দৃষ্টি একটু উদভ্রান্ত হলেও চিবুকের গড়নটা দৃঢ়চেতা মহিলার মতো।

হঠাৎ গুলীর শব্দ খুব কাছে চলে এল বলে মনে হল। প্রচণ্ড শব্দ। এতক্ষণ আমাদের দক্ষিণ পাশ থেকে অর্থাৎ আখাউড়ার দিক থেকে আসছিল। এখন মনে হয় নদীর ভেতর থেকে শব্দটা আসছে। হানাদাররা কী তবে আমাদের বোট নিয়ে তাড়া করছে। এবার সত্যি আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার পিঠের ওপর সওয়ার হওয়া মেয়েটা ভয়ে চুপ হয়ে গেল। তবে তার ভেতরে আতংকিত অসহায় অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছিলাম। তার ফোঁপানি ও কান্নার উথলানো ধকলটা তার ভেতরেই গুমরে মরছিল। আমি একটা ভয়ার্ত দেহের কম্পন আমার ঘাড় ও পিঠের ওপর বহন করছিলাম। কিন্তু অবস্থাটা আমার কাছে অসহনীয় মনে হওয়ায় আমি পিঠের ওপর থেকে তাকে গায়ের জোরে একপাশে নামিয়ে এনে নৌকার পাটাতনে আতে উপুড় করে শুইয়ে দিলাম। আনিসকে উদ্দেশ করে বললাম, এখন উপায়?

আনিস আমার কথার জবাব না দিয়ে নৌকার সকল যাত্রীর দিকে গম্ভীর গলায় বলল, পাঞ্জাবিরা বোট নিয়ে এদিকে আসছে। সাবধানে কেউ একটু টুঁ শব্দ করবেন না। নৌকায় যারা জোয়ান পুরুষ আছেন সকলেই পানিতে নেমে পড়ুন। বুক পানির বেশি হবে না। ঐ নদীর পার এদিকেই হবে বোঝা যাচ্ছে। এই মাঝি, তুমিও নামো। নাও ঠেলে দ্রুত কিনারায় নিয়ে যেতে হবে। মেয়েরা আর বাচ্চারা নৌকায় থাকবে। সাবধান, হুটোপুটি করে সবাইকে ধরিয়ে দেবেন না।

আনিসের কথায় আমি নিঃশব্দে পানিতে নেমে গেলাম। তার আন্দাজ ঠিকই। এখানে বুক পানির মধ্যে পা মাটিতে ঠেকলো। আমরা দ্রুত নৌকাটাকে বাঁদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলাম। চতুর্দিকে মিশমিশে অমাবস্যার অন্ধকার থাকলেও নদীর তীরটা ঠাহর করা যাচ্ছে।

আনিসের ধমকে এবং গুলীর ক্ষণ- বিরতির ফাঁকে নৌকার সমস্ত আরোহীরাই ভয়ে পাথর হয়ে আছে। কারো কোনো সাড়া বা নড়াচড়া নেই। আমি পানির ভেতর দিয়ে সর্বশক্তিতে নৌকাটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আনিস বলল, সামনেই ঘাট। আমাদের লোকজন থাকার কথা। থাকলে রক্ষা, না থাকলে আন্দাজে চলতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা নৌকা টেনে পাড়ে এনে ভিড়ালাম। না, এখানে কেউ আমাদের জন্য অপেক্ষায় নেই। নাওটা পাড়ে এসে লাগামাত্র সকলেই অন্ধকারে একসাথে তীরের দিকে লাফিয়ে

পড়ল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নদীর তীরে ঝোপ জঙ্গল থেকে টর্চের আলো এসে পড়ল আমার ও আনিসের মুখের ওপর। একটা লোক টর্চের আলোর ভেতর একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল আমাদের দিকে তাক করে এগিয়ে এল, খবরদার কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। আমরা নৌকাটা সার্চ করবো। কারো কাছে হাতিয়ার থাকলে আমাকে দিয়ে দাও। আমরা কারো ক্ষতি করবো না।

আমাদের কারো বুঝতে বাকি রইল না যে আমরা কাদের হাতে পড়েছি। আনিস মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে পানির নিচ দিয়ে পা বাড়িয়ে আমাকে ইশারা করলো। আমি অন্ধকারের দিকে ফেরা মাত্রই সে তার এস. এল. আরটা কাঁধ থেকে ডান হাতে নিয়ে খুব আস্তে করে নৌকার তলায় ডুব দিল। আনিসের সাহস দেখে আমি হতভম্ব হয়ে নৌকা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এ সময় টর্চঅলা লোকটা, যার মুখ আমরা কেউ দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমার দিকে আলো ফেলে হেঁকে উঠল, এই তোমার পাশের মানুষটা কোথায়? ডুব দিয়ে পালিয়েছে নাকি? আমি ত্বরিৎ সাহসে বলে উঠলাম, না বোধ হয়। সে ভয় পেয়ে বেহুঁশ হয়ে ডুবে গেছে। তাকে দয়া করে পানিতে নেমে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করুন। তা না হলে মরে যাবে।

মরে যাবে না, জাহান্নামে যাবে।

আমার মুখ থেকে টর্চের আলো সরিয়ে লোকটা বিদ্রূপ করে উঠল। ততক্ষণে তার টর্চের আলো এসে পড়েছে নদীর পাড়ে লাফিয়ে পড়া যাত্রীদের ওপর।

খবরদার কেউ নড়বে না।

সব অসহায় নারী পুরুষ তখন ভয়ে স্তব্ধ। লোকটা টর্চের আলো ফেলল সীমার ওপর। সে তখন নৌকা থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়েছে। লোকটা অনেকক্ষণ তার ওপর টর্চ জ্বেলে রাখল। নন্দিনী তখনও নৌকায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। আমি একটু আগে অন্ধকারে বুঝতেই পারি নি কে আমার কাঁধ জড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। এখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে নন্দিনীই গুলীর শব্দে ভয় পেয়ে শেষ অবলম্বনের মত আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

লোকটা আবার আলো নৌকার ওপর ফেলল। আলোটা নৌকার ওপর পড়া মাত্রই আমি বললাম, এখানে আরও একজন অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই নন্দিনী উপুড় হয়ে থাকা অবস্থায় থেকে মাথা তুললে টর্চের আলোর বৃত্তটা নন্দিনীর মুখের ওপর এসে স্থির হল। লোকটা অনেকক্ষণ অসভ্যের মতো আলোটা নন্দিনীর মুখের ওপর স্থির করে রাখায় নন্দিনী আর চোখ ফেলতে পারছিল না। এই

অসভ্যতা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আলোটা সরান। দেখছেন না চোখ মেলতে পারছে না?

টর্চটা নিভে গেল।

সবাই ওপরে উঠে এসো।

লোকটা আদেশ করল। টর্চের অপর্যাপ্ত আলোয় আন্দাজ করলাম এরা সংখ্যায় মাত্র চার-পাঁচজনের বেশি হবে না। সবার হাতেই থ্রি নট থ্রি রাইফেল। প্রত্যেকটা অস্ত্রের মুখই আমাদের দিকে ফেরানো। আমি নৌকার গলুইটা যাতে নদীর পারের মাটিতে ঠেকে সে কারণে নৌকাটি ধাক্কা দিলাম। নন্দিনী যাতে শাড়ি না ভিজিয়ে ডাঙায় নামতে পারে সে জন্যই অবশ্য নৌকাটাকে ঠেলে দিলাম। লোকটা হাত বাড়িয়ে নাওয়ের মাথাটা ধরলো। আর এক লাফে নৌকায় উঠে এসে নন্দিনীর চুলের খোঁপা মুঠো করে ধরে টান দিল, নেমে আয় মাগী, নেমে আয়। বেহুঁশ হওয়ার পরে অনেক মওকা পাবি।

চুলের মুঠো ধরে টেনে লোকটা নন্দিনীকে নৌকা থেকে পাড়ে নামিয়ে আনল।

আমি তখন পানি থেকে ভেজা কাপড় নিয়ে ডাঙার দিকে পা বাড়ালাম। লোকটির অন্যান্য সঙ্গীরা একটুও কথা বলছে না বা আনন্দ প্রকাশ করছে না। এখন অন্তত চার পাঁচটা টর্চ এক সঙ্গে জ্বলে উঠল নৌকা আর ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ওপর। নারী- শিশু ও বৃদ্ধ মিলিয়ে প্রায় ৩৪টি প্রাণী। সবাই ভয়ে কাঁপছে। এমন কি শিশুরাও বুঝতে পেরেছে আমরা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে গেছি। আমাদের আর রেহাই নেই।

আমি ডাঙায় উঠে দাঁড়ানো মাত্রই একজন বন্দুকধারী লোক টর্চের আলো আমার মুখের কাছে এনে বলল, এই মেয়েটা তোমার বোন?

আমি চট করে মিথ্যা কথা বললাম, না, আমার বৌ।

ও।

আমি বললাম, আমরা আগরতলা যাবো। আমাদের কেন আটকেছেন? আমাদের ছেড়ে দিন, তা না হলে আপনাদের বিপদ হবে। কারণ আমাদের নিয়ে যেতে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এখানেই থাকার কথা। সম্ভবত তারা আশেপাশেই আছে। আমাদের ছেড়ে দিলে আমরা আপনাদের ক্ষতি করতে দেব না।

কথাগুলো বলে আমি নদীর পানির দিকে তাকালাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবে আবছায়ার মত দূরে দূরে কচুরিপানার ঝোপগুলো বোঝা যায়। আমি আনিসের ডুব দিয়ে পালানোর পর কোথায় গিয়ে ভেসে উঠতে পারে তা মনে মনে আন্দাজ করছিলাম। সম্ভবত সে এসব কচুরিপানার ঝোপের মধ্যেই চুপচাপ মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা ডাঙায় উঠে পালিয়েছে।

আমার কথায় লোকটা প্রথমে কোনো জবাব দিল না। পরে সামনে এগিয়ে এসে বললো, তোমরা হারামির বাচ্চা। ভারতের দালাল। দেশটাকে হিন্দুদের কাছে বেচে দিতে যাচ্ছো। সবকয়টাকে কুত্তার মত গুলী করে মারবো। যাও, সবগুলো একঠাঁই জমা হয়ে দাঁড়াও।

লোকটা আমার কাঁধে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে একটা ধাক্কা মারল। আমি অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ছিটকে পড়লাম। মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে হাত বাড়িয়ে কে যেন আমাকে ধরলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, কে?

আমি সীমা।

আমি বললাম, আপনার বোন কোথায়, নন্দিনী? অনুচ্চকণ্ঠে আমার প্রশ্ন শুনে পাশ থেকে নন্দিনী জবাব দিল, এই তো আমি। এরা কি আমাদের গুলী করবে?

আমি কোনো জবাব দিলাম না। কীই বা বলবার আছে? লোকগুলো যে আশপাশ এলাকার মাস্তান ধরনের লোক তা বুঝতে পারলাম। এটা যে মুকুন্দপুর স্টেশনের কাছাকাছি কোনো এলাকা আমি তা আন্দাজ করেছিলাম। কাছেই হয়ত কোথাও বামুটিয়া বাজার। এখন অন্ধকারে কোনো কিছু বুঝতে পারছি না। নন্দিনী ও সীমা আমার গায়ের সাথে গা লাগিয়ে যেন একটু নির্ভরতা নিয়ে দাঁড়াল। আমি ফিসফিস করে নন্দিনী ও সীমাকে বললাম, জায়গাটা আমার চেনা লাগছে। কাছেই খাটিঙ্গা নামের একটা গাঁয়ে আমার জ্ঞাতিকুটুম্বদের বাড়ি। ভাবছি আত্মীয়দের পরিচয় দেব কিনা। এলাকাটা সম্ভবত আমার দাদার মুরীদদের এলাকা।

নন্দিনীরা কোনো জবাব দিতে পারল না। একটা হতভম্ব ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের ঘিরে নারীশিশু ও বৃদ্ধ- বৃদ্ধসহ পুরো দলটা। রাইফেলধারী লোকগুলো আমাদের থেকে চারপাঁচ হাত দূরে। অন্ধকারে অস্পষ্ট হলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে এরা আমাদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে। যে লোকটা একটু আগে আমাদের গুলী করার ভয় দেখাচ্ছিল সে একটা সিগ্রেট রাতে দেশলাই জ্বালালে আমি তার মুখটা এক ঝলক দেখতে পেলাম। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং ফর্সাই মনে হল। বয়েসও আমার মতই ত্রিশ- পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। সিগ্রেট ধরিয়েই সে আমার দিকে এগিয়ে এল, বৌয়ের সাথে ফিসফিস করে কি বলছিলে? কোন্ গায়ে তোমার আত্মীয় আছে?

খাটিঙ্গা আবু সর্দারের বাড়ি। নাসির মাষ্টার আমার চাচাতো ভাই।

মুহূর্তে আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। লোকটা টর্চ আমার মুখের ওপর ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে আলোর গোলটাকে নামিয়ে আনল পায়ের ওপর। আলোটা এখন আমার নগ্ন পায়ের পাতায় স্থির হয়ে আছে। নৌকা থেকে পানিতে নামার সময় জুতো খুলে ফেলেছিলাম। পায়ের পাতা দুটি এখনো শুকোয় নি।

তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

নারায়ণপুর বাজার থেকে।

সেটা আবার কোথায়?

ভৈরব বাজারের কয়েক মাইল পেছনে। ঢাকা জেলার রায়পুরা থানা এলাকা।

আমি জবাব দিলাম। লোকটা সিগ্রেটে পরপর কয়েকটা সুখটান মেরে বলল, তুমি কোথাকার লোক, কি নাম, কি কর?

আমি বললাম আমার নাম হাদী। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আমি কবিতা- গল্প লিখি। ঢাকায় পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের লাইব্রেরিয়ান।

সরকারি চাকুরি?

বললাম, হ্যাঁ।

কবি সাহিত্যিক মানুষ সরকারি চাকুরি ফেলে কেন আগরতলা যাচ্চো? মালোয়ানের গোলামি করতে চাও?

আমি চুপ করে রইলাম।

বি. এস. এফ ক্যাম্পের ট্রেনিংয়ে দু'একটা ব্রাস ফায়ার আর হাতবোমা মেরে ভেবেছো পাকিস্তান ভেঙে ফেলবে? পারবে না।

লোকটা সিগ্রেট ফেলে দিল। আবার অস্পষ্ট অন্ধকারে তার মুখ ঢেকে গেল।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করবো আমরা। সর্বহারা পার্টি। সিরাজ শিকদারের নাম শুনেছো?

আমি বললাম, তার নাম সবাই জানে।

ভবিষ্যতে আরও জানবে। তিনিও কবি।

বেশ দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো উচ্চারণ করল লোকটা। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক আমরা রাজাকার বা আলবদরের হাতে পড়ি নি। কেন যেন মনে হল এরা আর যাই করুক আমাদের জানে মারবে না কিংবা মেয়েদের বেইজ্জত করবে না। আমি মনে মনে ইন্নু কুনতু মিনাযজলেমিন পড়তে লাগলাম। লোকটা ততক্ষণে তার ক্ষুদ্র সশস্ত্র গ্রুপটির কাছে এগিয়ে গিয়ে কি যেন পরামর্শ করল। তারপর ফিরে এসে বলল, তোমাদের গুলী করে মারাই উচিত ছিল। কিন্তু তুমি খাটিঙ্গার যে বাড়িতে আত্মীয়তার দাবি করলে তারা তোমার আত্মীয় হলেও হারামির বাচ্চা নয়। নাসির আমার বন্ধু। তার ভাই আর বৌয়ের ওপর গুলী চালাতে চাই না। আমাদের সামনে থেকে এক্ষুণি পালাও। আর এক মুহূর্ত দেরি নয়।

লোকটার কথার মধ্যে এমন শ্লেষ ছিল আমরা যেন চাবুক খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমরা কেউ জানতাম না কোনদিকে যাব। এখনও অন্ধকার কাটে নি। ঝিঁঝি পোকার তীক্ষ্ণ শব্দে রাতের গভীরতা বোঝা যায়। কোনোদিকে পায়ে চলার কোনো পথ ঠাহর করতে পারছি না। আমি বুকে সাহস এনে লোকটাকে বললাম, আমরা তো পথঘাট চিনি না। কোন দিকে যাব অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না। বর্ডারে যাওয়ার পথটা একটু দেখিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হয়।

আমার কথায় লোকটা আবার টর্চের আলো ফেলল আমাদের ওপর। আলোটা প্রথম সীমার মুখ থেকে নন্দিনীর মুখে। তারপর সরে এল আমার মুখে।

একটু আগে যে মুক্তিদের ভয় দেখাচ্ছিলে তারা কোথায়?

লোকটা একটু এগিয়ে এল আমার দিকে। আলোটা এখনও আমার মুখের ওপরই আছে। চোখ মেলতে পারছি না।

আমি বললাম, তারাইতো আমাদের নদীর পাড় থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। এখানে থাকার কথা।

আনিসের কথা বলতে গিয়েও বললাম না। কি জানি একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সাথেই ছিল একথা বলে আবার কোন বিপাকে পড়ি। লোকটা হঠাৎ আলো নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বলে উঠল, জাহান্নামে যাও। আমরা তোমাদের হিন্দুস্তানের পথ দেখিয়ে দিতে পারি না।

কথাগুলো বলে তার রাইফেলধারী গ্রুপ নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর তক্ষুণি আকাশে গুড়গুড় শব্দে বিদ্যুতের কয়েকটি চমক হেনে ঝমঝম শব্দে নেমে এল বৃষ্টি। আমরা সকলেই সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। এতক্ষণ পরে আমাদের দলের দুএকটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। নৌকায় থাকতে আনিসের ভয়ে এতক্ষণ সবাই চুপ মেরে ছিল। পরে ধরা পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড আতংক সকলকেই প্রায় বোবা করে রেখেছিল। এখন সেই নৈশব্দে ফাটল ধরেছে। সীমা আমার হাত ধরে বলল, চলুন আমরা সকলেই হাত ধরাধরি করে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করি। দেখা না গেলেও পথ তো একটা আছে?

আমি বললাম, সেটা মন্দ নয়, তবে এতগুলো বুড়ো মানুষ আর বাচ্চাকাচ্চা লাইন বেঁধে ঠিক মতো ঠিক ডিরেকশনে চলতে পারবে তো?

ডিরেকশন আবার কি, আমরা সামনের দিকে সমানে হাঁটতে থাকব। সামনে থাকবেন আপনি। আমরা একে অন্যের কাপড়ের খুঁট ধরে হাঁটতে থাকবো সকাল হওয়া পর্যন্ত কোথাও না কোথাও গিয়ে তো পৌঁছুব?

এ হল নন্দিনীর কথা যদিও তার মুখে দেখা যাচ্ছে না তবুও তার মরিয়া- ভাবটা পাশে থেকে আমি টের পেলাম। তার প্রস্তাব শেষ হওয়া মাত্র আমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, সাব আমার ভাড়াটা দিন। আনিস সাবেরে এখন কই পামু। তার সাথে কথা হইছিল জনপ্রতি সত্তর টাকা। বাচ্চা কাচ্চার কোনো পয়সা লাগবে না। ভাড়া পাইলে আমি পোলাডারে লইয়া নাও ভাসাই। আল্লাই জানে আন্দাইর নদীতে আমাগো কপালে কী আছে। হুনলেন তো পাঞ্জাবিরা বোড ভাসাইয়া গুলী চালাইতেছে। আমরা তো আর নাও চালাইয়া ইণ্ডিয়া যাইতে পারুম না।

মাঝির দাবি সকলেরই কানে ঢুকলেও কেউ কিছু বলছে না। বলবেই বা কি, সকলেই প্রবল বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাউয়ার মতো ভিজছে। টাকাটা অবশ্য দিনের বেলায় নদীতে থাকতেই শোধ করে দেওয়া উচিত ছিল। এখন বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে গাট্টিবোস্কা খোলার যেন কারো কোনো শক্তি বা বা প্রবৃত্তি নেই।

আমি বললাম, আপনারা একটু কষ্ট স্বীকার করে মাঝির টাকাটা দিয়ে দিন। বেচারা গরিব। আমাদের জন্য যথেষ্ট রিস্ক নিয়েছে। আপনারা ভাড়ার ব্যাপারে যে যেই কথাবার্তা বলে এনেছেন এখন তা শোধ করে দিন। আমরা এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। সামনে এগোব।

আমার কথায় কাজ হল। বৃষ্টির তোড় ও মিশমিশে অন্ধকারের মধ্যেও অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিগুলোর একটু নড়ে ওঠার আভাস পেলাম। যেন এই আতংকের মুহূর্তে তারা কারো আদেশেরই অপেক্ষা করছিল। মানুষ সর্ব অবস্থায়ই সম্ভবত একটা নেতৃত্ব কামনা করে। একটা কণ্ঠস্বর শুনতে চায় যা অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং নির্ভরশীল।

আন্দাজে একে একে সকলেই ভাড়ার টাকা হাতড়ে হাতড়ে আমার হাতে খুঁজে দিতে লাগল। আমি অভিভূত হয়ে অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝরঝরানির মধ্যে এইসব বিপদগ্রস্ত ও মৃত্যু তাড়িত মানুষের সততায় মুগ্ধ হয়ে থাকলাম। আমার হাতের ভেতর টাকাগুলো ভিজতে লাগল। নন্দিনী আমার বাঁ দিক থেকে বলে উঠল, এই নিন। এখানে দুশোর দুটি নোট আছে। ভাংতি খুঁজে পাচ্ছি না। মাঝিকে দিন।

আমি এগিয়ে গিয়ে মাঝির হাতে টাকাগুলো তুলে দিলাম। নিজের পকেট থেকেও একশোর একটি নোট।

আশাকরি এখানে যা আছে তাতে হিসেবে কম পড়বে না। যদি কিছু কম হয় আমাদের মাফ করে দিও।

আল্লাহ আপনেগো সহিসালামতে পৌঁছাক। আমরা গিয়া নাও ভাসাই। আয়রে বাজান।

মাঝি তার ছেলেটিকে হাতড়ে খুঁজে পেয়ে পাড়ের ঢালুতে নেমে গেল। আমরা অন্ধকারে বৈঠার শব্দ শুনতে পেলাম।

আমরা লাইন বেঁধে এক জনের পেছনে একজন এভাবে হাঁটছিলাম। যদিও ভোর হয় নি তবে বৃষ্টিটা ধরেছে। মনে হয় এখন ইলশেগুঁড়ির মত ঝরছে। আমাদের সবার চোখও অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। পথ দেখতে না পেলেও গাছপালা বা ঝোপজঙ্গলের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হচ্ছে না। আমি সবার আগে। আকাশের পাখির ঝাঁকের সর্দার পাখিটির মতো। আমার পেছনে সীমা আমার বেল্ট ধরে। তারপর নন্দিনী বোনের শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়িয়ে হাঁটছে। এভাবেই পুরো দলটা একের কাপড় ধরে অন্যে।

এটাই পথ কিনা জানি না, তবে পায়ের তলার মাটি, কাদা ও পানিতে ভয়ানক পিচ্ছিল। এখানকার লালমাটি বৃষ্টিবাদলে ভিজলে এমনিতেই হাঁটা মুস্কিল। আর চলছি পায়ে হাঁটা পথের হদিস হারিয়ে। আমি পা টিপে ভর রেখে এগোতে পারলেও সীমা পা পিছলে বার বার পড়ে যাচ্ছিল। সাথে নন্দিনীও। কোমরের বেল্টে হেঁচকা টান পড়লেই আমি বুঝতে পারতাম সীমা হুমড়ি খেয়েছে। বেল্টটা ছুটে গেলে আমি আবার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিই।

এভাবে ঘন্টাখানেক চলার পর হঠাৎ একটা মাঠের মতো ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হল ছেলেদের খেলার মাঠ। মাঠে ঢোকার আগে আমি একটু দাঁড়ালাম। পোশাকআশাক বৃষ্টির পানিতে এখনও সপসপ করছে। মাঠের ভেতর থেকে বাতাসের ঝাপটা এসে আমার গায়ে লাগাতে হঠাৎ শীত করতে লাগল। আমি পেছন ফিরে বললাম, আমরা যদি ঠিকমতো এসে থাকি তবে বর্ডারের খুব কাছাকছি এসে গেছি। আপনারা কেউ হল্লাচিল্লা করবেন না। আমরা

সামনের এই ফাঁকা জায়গাটায় ভোর না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব। মনে হচ্ছে এটা কোনো গাঁয়ের খেলার মাঠ। সামনে যে গাছপালার মতো দেখা যাচ্ছে এর আড়ালে নিশ্চয়ই মানুষের বাড়িঘর আছে। এসব এলাকার লোকজন ভালো নয় বলে জানি। আমরা ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি শুনলে লুটতরাজ করে সব কেড়ে নেবে। ধরিয়েও দিতে পারে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আকাশ একটু খুললেই গাঁটা পেরিয়ে যাব। মানুষজন জাগার আগেই। আপনারা আমার পেছনে কথাবার্তা না বলে এগোন।

সীমা বলল, দাদা, যদি গাঁয়ের মানুষ বদলোক হয়ে থাকে তবে তো ভয়ের কথা। চলুন না কষ্টেসৃষ্টে গাঁটা পার হয়ে যাই।

আমি বললাম, এই গাঁ পেরুলেই যে ইণ্ডিয়ান বর্ডার পাব এটাতো জানি না। একটু ফর্সা হলে এলাকাটা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পাব। হয়তো আমরা বর্ডারের খুব কাছেই আছি। কিংবা এর মধ্যেই বর্ডার পেরিয়ে ত্রিপুরার ভেতরে চলে এসেছি। একটু সকাল না হলে আর এগোনো ঠিক হবে না।

আমার কথা শুনে পেছন থেকে সকলে একবাক্যে সীমার কথার প্রতিবাদ করল, না আমরা মাঠে একটু জিরাবো। আর চলতে পারছি না বাবা।

আমি দলটাকে নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি চলে আসা মাত্র সামনের গাছপালার ভেতর থেকে আচমকা একটানা গুলীর শব্দ ফেটে পড়ল। আমি মুহূর্তমাত্র হতভম্ব না থেকে চীৎকার করে বললাম, শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। আপনারা শুয়ে পড়ুন। নন্দিনী, সীমা–

আমার মাটিতে লুটিয়ে পড়া শরীরের ওপর মেয়ে দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সীমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, দাদা, আমাদের বাঁচান। আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবেন না।

আমি সীমার কানের কাছে মুখ রেখে বললাম, ভয় নেই, আপনাদের ফেলে পালাব না।

আমার কথা নন্দিনীরও কানে গেল সে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, আমাদের ফেলে পালালে ভগবানের কাছে দায়ি থাকবেন। নদীর ঘাটে আমি আপনার কে হই যেন বলেছিলেন, মনে রাখবেন। আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছিলাম, আপনি কবি সৈয়দ হাদী মীর। আপনার সব বই আমার কাছে আছে, জানেন? আমিও লিখি।

গুলীর শব্দ হঠাৎ থেমে গেল।

০২. খানিক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা

খানিক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা।

আমি বুঝতে পারছিলাম আমাদের চারদিকে দলের নারী- পুরুষ সবাই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমার ভয় ছিল ছোটো বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। কিন্তু তারাও আশ্চর্যজনক ভাবে নিশ্চুপ। কারো গলা দিয়ে কোনো কান্না, চীৎকার বা উশখুশের শব্দ শোনা গেল না। মৃত্যু বা বিপদের সম্মুখীন হলে মানুষ যে বয়েস নির্বিশেষে নির্বাক হয়ে যায় এ অভিজ্ঞতা আমার এমনভাবে আগে কখনো হয় নি। আমি সীমাকে বললাম, আরও কতক্ষণ এভাবেই থাকুন। দেখা যাক কপালে কী আছে। আমার মনে হয় যারা গুলী ছুঁড়েছে, তারা বুঝতে পেরেছে আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। আনিসের দলও হতে পারে।

হায় ভগবান।

সীমা ফুঁপিয়ে উঠল।

আমার ওপাশ থেকে নন্দিনী আমার হাত চেপে ধরে আমাকে ইশারা করে বলল, কারা যেন আসছে।

আমি মাথা তুলে মাঠের অপর দিকে মাথা উঁচু করা মাত্রই দেখতে পেলাম কয়েকটা ছায়ামূর্তি মাঠের মাঝামাঝি এসে গেছে। খুব সতর্কতার সাথে তারা এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকে সামনের দিকে ঝুঁকে কোনোকিছু খোঁজার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। সম্ভবত এদের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল বা স্টেনগান বাগানো আছে। মুহূর্ত মাত্র। লোকগুলো আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বলে মনে হল। আমি বুকে ভরসা নিয়ে চীৎকার দিয়ে উঠলাম। আনিস আমরা, গুলী ছুঁড়ো না।

উঠে দাঁড়া হারামজাদা। তোর আনিসের মায়েরে..। সাবধান, দৌড় দেবার চেষ্টা করলে সবগুলোকে জানে মারব।

একটা বাজখাঁই গলায় আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

নন্দিনী ও সীমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আর্ত কান্না ছড়িয়ে পড়ল আমাদের দলের মধ্যে। এখন পূর্বদিক একটু ফর্সা হয়ে এসেছে। সামনের ঝোপঝাড় থেকে সুর করে অনেকগুলো কোকিল ডেকে উঠল। বাদুড়ের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে মাঠ পার হয়ে। মাঠের ওপাশ থেকে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউও শুনতে পেলাম। মনে হয় সামনের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মতো জায়গাটা আসলে কোনো গ্রামই হবে। সম্ভবত সেখানকার লোকজনও গুলীর শব্দে এতক্ষণে জেগে গেছে। মনে মনে এখন আশা করছিলাম আশেপাশের গাঁয়ের মানুষ স্মাগলার কিংবা যত খারাপই হোক, এগিয়ে এসে আমাদের বাঁচাক। আমি বুঝতে পারছিলাম আমরা এখন প্রকৃত শত্রুদের হাতে পড়ে গেছি। এরা নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের সবচেয়ে খারাপ গুণ্ডা বদমাইশের দল যারা পাক-হানাদার বাহিনীর প্ররোচনায় শান্তিবাহিনী বা রাজাকারদের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

আমি আমার দুপাশে দুটি মহিলাকে নিয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের দাঁড়াবার আগেই দলের শিশু বৃদ্ধ সকলেই মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিলাপ শুরু করেছে। বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ- বৃদ্ধা এর মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে রাজাকারদের সর্দার লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে লাথি খেয়ে ফিরে এল। লোকগুলো প্রথমেই আমাদের সকলের বোঁচকাবুচকি কেড়ে নিয়ে এসবের ভেতর টাকা-পয়সা গয়নাগাটি যা কিছু ছিল হাতিয়ে নিল। দলের কারোরই পরণে কোনো গয়নাপত্র ছিল না বলে এখন পর্যন্ত কারো গায়ে হাত দিতে হয় নি। দলে সীমা ও নন্দিনী ছাড়া আর যে কয়জন বয়সের দিক দিয়ে যুবতী বলে মনে হচ্ছিল, এদের প্রত্যেকের কোলে বা পাশে শিশু সন্তান থাকায় লোকগুলোর দৃষ্টি ছিল সীমা ও নন্দিনীর ওপর। তাছাড়া আমাদের দলের প্রায় সকলের পোশাক-আশাক ও ছবিসুরৎ দেখলে সহজেই বোঝা যায় এরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। নমশূদ্র পরিবারের ভয়ার্ত নরনারী। কৃষক, জেলে, কামারকুমার যারা পাকিস্তানী আমলে বাস্তুভিটা, সামান্য চাষবাসের জমি ও জন্মগত পেশা পরিত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে পারে নি এরাই এখন দলে দলে ভারতে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে গ্রাম খালি করে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন মাটি এবং মানচিত্র পরিত্যাগ করতে উদ্যত। সকলের চেহারার মধ্যেই এক অচেনা মৃত্যুর আতংক। এখন সকালের প্রথম আলো এসে পড়লো আমাদের ওপর। নন্দিনী ও সীমা যে নিম্নশ্রেণীর কোনো পেশাজীবী পরিবারের মেয়ে নয় তা এদের ফর্সা গাত্রবর্ণ, পোশাকের ঈষৎ আভিজাত্য ও চেহারা দেখলেই আঁচ করা যায়।

রাজাকারদের গ্রুপ লীডারটি এতক্ষণ দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে তার রাইফেল উচিয়ে ঘুরে ফিরে পরখ করছিল। লোকটা বেশ লম্বা। একমাত্র তার পরণেই একটা নীল রংয়ের প্যান্ট ও গায়ে খাকি রংয়ের শার্ট। কোমরের বেল্টে একটা পিস্তলও ঝুলছে। অন্যেরা লুঙ্গি ও জামা পরা। কারো গায়ে শুধু গেঞ্জি। গ্রুপ লীডারটির গায়ের রং রোদে। পোড়া তামাটে। লম্বা নাকের নিচে মোটা একজোড়া গোঁফ। বয়স পঁয়ত্রিশের মতো হবে। অন্যেরা সকলেই অল্প বয়স্ক গাঁয়ের দীনমজুর শ্রেণীর কিশোর। গ্রুপ লীডারটা সীমা, নন্দিনী ও আমাকে বাদ দিয়ে দলের প্রায় সকলের সামনে গিয়েই এদের প্রত্যেককে পরখ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে

পকেট থেকে একটা বগা সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়ে কাঠিটা সীমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি চমকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

এই মালাউনদের সর্দার কে, তুমি?

হ্যাঁ, আমার সাথেই এরা যাচ্ছে।

আমি যথাসম্ভব দৃঢ়তার সাথেই জবাব দিতে চেষ্টা করলাম। যদিও আমার হৃদপিণ্ডটা তখন আতংকে এমন তোলপাড় করে লাফাচ্ছিল যে এ অবস্থায় মানুষের গলা দিয়ে সাধারণত কথা সরে না।

লোকটা সামনের দিকে তাকিয়ে সিগ্রেটে ঘন ঘন টান দিতে লাগল। আমি তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখি মাঠটার পরে গাছপালার ভিতর মানুষের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো মানুষজনকে দেখছি না। হয়তো কেউ এখনো ঘুম থেকে জাগে নি। সূর্য তখন গাছপালার ওপর এসেছে। আকাশে গতরাতের মেঘলা ভাব থাকলেও, পূর্বদিকের প্রান্তসীমা পরিচ্ছন্ন থাকায় আকাশের নীলে উঠে আসা সূর্যের বিচ্ছুরণ থেকে রোদ ছিটকে পড়ছে। এ সময় এ অঞ্চলের কোনো গ্রামবাসীরই ঘুমিয়ে থাকার কথা নয়। সম্ভবত এই গোলযোগের সময় সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলো এখন জনশূন্য।

লোকটা সিগ্রেট ফেলে দিয়ে আমার সাথে কথা বলা শুরু করল, তোমার লোকদের বল টাকা-পয়সা গয়নাপাত্র কাপড়চোপড় বাসনকোশন যার কাছে যা কিছু আছে আমার সামনে রেখে দিতে। যদি কেউ কিছু লুকানোর ফিকির করে তবে বেটাছেলের মুখের ভেতর নল ঢুকিয়ে গুলী করব। আর মাগীদের ঐ জায়গায় রাইফেল ঢুকিয়ে দেব।

লোকটা নন্দিনীর দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করল।

আমার কণ্ঠ থেকে কথা বেরুবার আগেই দলের নারী- পুরুষ সকলে, রাজাকাররা একটু আগে সকলের গাট্টি- বোঁচকা হাতিয়ে সবকিছু নিয়ে নেয়ার পরও, যা অবশিষ্ট ছিল তা খুলে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। লোকটা তার দলের একটি ছোকরার দিকে কী ইঙ্গিত করতেই ছেলেটা কাঁধের লাল গামছাটি দলপতির কাল বুট জুতা পরা পায়ের দিকে বিছিয়ে দিল। তার ইঙ্গিতে সকলেই যার কাছে যা টাকা- পয়সা ও লুকানো দুএকগাছি সোনারূপোর বালাচুড়ি বা হার ছিল তা নিঃশব্দে রেখে দিল। আমি চোখের ইশারায় সীমাকে তার শেষ সম্বল কিছু থাকলে গামছায় রেখে দিতে বললাম। বিনা বাক্যব্যয়ে সীমা ও নন্দিনী তাদের লুকানো কিছু একশো টাকার নোট ও গয়নার পুটলি গামছায় রেখে দিল।

লোকটা আমার দিকে ফিরে হাসল, তোমার কাছে কিছু নেই? তোমার মাগীগুলোতো বেশ মালদার। নিজের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখো নি? থাকলে ভালোয় ভালোয় গামছায় ফেল। পরে কিছু পাওয়া গেলে যা বলেছি তাই করব।

আমার প্যান্টের একটা গুপ্ত পকেটে হাজার দুএক টাকা ছিল। আমি একটু সাহস ও স্বার্থপরতার সাথে জবাব দিলাম, আমার স্ত্রী ও বোনের কাছে যা ছিল তা গামছায় রাখা হয়েছে। হঠাৎ একটা ঘরবাড়ি ফেলে আসা পরিবারের এর বেশি কি থাকে?

লোকটা কোনো কথা না বলে পকেট থেকে আবার সিগ্রেট বের করে ধরাল। ইতরের মত নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে হাসল, আসল মালতো এখনও গামছায় পড়ে নি। ও দুটো বিছানায় পড়লেই চলবে।

আমি তার ইতর ইঙ্গিতের প্রতিবাদ করে বললাম, সাবধান, মুখ সামলে কথা বল। ভদ্র মহিলাদের সব কিছু তোমাদের দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে আর কিছু নেই।

আছে, আছে। এখনও সবচেয়ে দামি জিনিসটাতেই তো হাত পড়ে নি।

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে কথাগুলো বলেই লোকটা আচমকা আমার মুখের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মারল। আমি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলাম। মনে হল আমার ওপরের ঠোঁটটায় কেউ বিদ্যুতের শক দিয়ে সারা চোয়ালটাই অবশ করে ফেলেছে। নন্দিনী ও সীমা ছুটে এসে আমাকে ধরতে চাইল। কিন্তু লোকটা সীমার শাড়ির আঁচল ও নন্দিনীর ব্লাউজের পেছন দিকটা এমনভাবে টেনে ধরল যে দুজনই বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল। উভয়েরই অসংবৃত অবস্থা দেখে লোকটা জোরে হেসে উঠে বাঁ হাতে কায়দা করে টেনে নন্দিনীর গায়ের ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলল। আর সীমার শাড়ি এমনভাবে টেনে আনতে লাগল যে সীমা ভয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে কোমরের বাঁধন থেকে পরনের শাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। শুধু কালো একটা সায়াসহ সীমা আব্রু ঢাকতে মাটিতে বসে পড়ল। নন্দিনীর ব্রেসিয়ার পরা থাকলেও সে তার পরনের শাড়িতে গা ঢেকে এগিয়ে গিয়ে সীমাকে জড়িয়ে ধরল। লোকটার হাতে সীমার শাড়ি।

আমার থুতনী বেয়ে রক্ত বেরিয়ে এলেও আমি একবার উঠে দাঁড়াতেই চেষ্টা করলাম। কিন্তু লোকটার সাথে ছেলেগুলো আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে আমার মাথাটা মাটিতে ঠেসে ধরল। লোকটা সীমার শাড়ি আমার পিঠের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বাঁধ।

লোকগুলো শাড়িটা মুহূর্তের মধ্যে পাকিয়ে দড়ি বানিয়ে আমাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। আমাদের সাথের লোকগুলো ভয়ে কবুতরের মত কাঁপছিল। ভয়ের চোটে কারো মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ পর্যন্ত বেরুচ্ছে না। দলের নারী- পুরুষ ঘটনার আকস্মিকতায় অসাড় নিস্পন্দ। লোকটা

নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল, তোমার শাড়িটাও লাগবে। তুমি খুলে দেবে না আমার লোকেরা খুলবে? পুরো নেংটো হতে হবে না পেটিকোট তো আছে।

নন্দিনী এতক্ষণ সীমাকে জড়িয়ে ধরে বিহ্বল হয়ে বসেছিল। লোকটার কথায় উঠে দাঁড়িয়ে শাড়িটা খুলতে লাগল।

লোকটা জোরে হেসে উঠল, দারুণ।

কাঁধ থেকে রাইফেলটা খুলে তার পাশের স্যাঙাতকে দিল। আর নিজে কোমরের বেল্ট থেকে টেনে বের করল পিস্তল। পিস্তলটা আমাদের দলের অন্যান্য নরনারীর শিশুর দিকে তাক করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, মালাউনের বাচ্চারা, তোদের মাসীর বাড়ির পথ এই দিকে। যেতে চাস তো এই মুহূর্তে দৌড়ে পালা। চোখের পলকে মাঠ পার হবি। পেছনে ফিরে দেখবি অমনি গুলী। পণ্ডিত নেহরুর বেটির ঐটা চাট গিয়ে যা। দৌড়, দৌড়।

আমরা ছাড়া পুরো দলটা দৌড়ুতে শুরু করল। কেউ আমাদের দিকে একবার পেছন ফিরেও তাকাল না। মাঠের মাঝামাঝি গিয়ে শিশুসহ একটা মা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তেই বুকের শিশুটিও ছিটকে পড়ল ঘাসে।

দৃশ্যটা দেখে লোকটা পিস্তলের নলটা আকাশের দিকে রেখে পর পর দুটি ফাঁকা গুলী ছুঁড়ল। মাটিতে পড়ে যাওয়া মা তার শিশুটিকে বুকে নিয়ে দিশেহারার মতো উল্টো দিকে অর্থাৎ আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে দেখে রাজাকার ও তার দলবল হো হো করে হেসে উঠল। মাটা শিশুসহ আমাদের খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েই আমাদের অর্থাৎ মাটিতে আষ্টেপৃষ্টে শাড়ি দিয়ে বাঁধা আমি, উদাসীনভাবে চুলের খোঁপাখুলে পিঠ ঢেকে বসে থাকা সীমা ও শাড়ি খুলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। নন্দিনীকে দেখেই সে আবার পেছন ফিরে দৌড়ুতে লাগল। তার সাথের সকলেই এর মধ্যে মাঠ পার হয়ে গাছপালার আড়ালে চলে গেছে। ফাঁকা মাঠের ওপর শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দেখে লোকগুলো পেছন থেকে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। মেয়েটা মাঠের শেষ সীমায় পৌঁছে আরও একবার আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে আবার উঠে দৌড়ুতে লাগল। মেয়েটা চোখের আড়ালে চলে গেলে লোকটা নন্দিনীর হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে সঙ্গীদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

এই মুরগী দুটোকেও বাঁধ। টাকাকড়িগুলো গুটিয়ে বেঁধে আমার হাতে দে। আর সব কয়টাকে নিয়ে আয়, এই দিলা।

লোকটা তার এক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল। দিলা বলল, হুকুম করেন সুবেদার সাব।

তোর বাড়িতে নিয়ে আয়। কাল সকালে ঠিক জায়গায় চালান করব। আজ রাত একটু হাতিয়ে দেখতে হবে সোনা-রুপো কিছু এখনও শরীরটরিরে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কিনা! তোর বাড়িতে আজ আমরা সবাই মেহমান।

কথাগুলো বলে সুবেদার দিলার দিকে ইশারা করে হাসল।

দিলা আমতা আমতা করে বলল, স্যার আমার বাড়িতে এতগুলো মানুষের জায়গা কোথায়? তাছাড়া এই গাঁয়ে একটাও মানুষ নাই। সব ইণ্ডিয়ায় চলে গেছে। সব এখন মুক্তিযোদ্ধা। আমি আর আমার মেয়ে থাকি। মেয়েটার জামাই মেয়েটাকে ফেলে ইণ্ডিয়ায় ভেগেছে। আমরা আপনার কথায় বর্ডার পাহারা দিই। আমার বাড়িতে ঐসব কারবার দেখলে আমার মেয়েটা ভয় পাবে। তাছাড়া....

থাক, থাক। তুই আর অজুহাত দেখাবি না। ঠিক আছে তোর বাড়িতে যখন একটা মেয়ে আছে তখন গাঁয়ের অন্য একটা খালি বাড়িতেই এদের নিয়ে চল। তোর মেয়েকে দিয়ে শুধু আমাদের জন্য রান্নাটা বেঁধে আনবি। নাকি এটাও পারবি না? এদিকে তো প্রতি ক্ষেপে টাকাকড়ি সোনাদানার ভাগ ঠিকই নিচ্ছো। হারামজাদা!

গালমন্দ করবেন না সাব। ঠিক আছে, আমার বাড়ি থেকে আমি ডালভাত যা পারি বেঁধে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, আপনি কোথায় কার বাড়িতে আস্তানা গাড়বেন বলুন?

বেশ ঠান্ডা আর দৃঢ় গলায় দিলা তার মতামত ব্যক্ত করল। সুবেদার আর তেরিমেরি না করে বলল, এদের নিয়ে নিতাই মেম্বারের খালি বাড়িতে চলে আয়। সেখানেই আজকের মালামাল ভাগবাটোয়ারা হবে। আমি চললাম। তোরা পেছন পেছন এদের নিয়ে আয়। গামছাটা গুটিয়ে বেঁধে দিস্?

.

যে লোকটা গামছায় রাখা টাকাকড়ি ও গহনাপত্র এতক্ষণ গুটিয়ে নিয়েছিল সে নিঃশব্দে সুবেদারের হাতে তা তুলে দিল।

একিন কর, আমি তোদের বখরা মেরে দেব না। আর যে হারামিপনা করবে তাকেই গুলী খেয়ে মরতে হবে। সোজা ক্যাম্পে চালান দেব। সাবধান। আমার সাথে যতক্ষণ আছিস পাঞ্জাবিরা তাদের ঘাটাবে না। বেগারও খাটতে হবে না। প্রতিরাতেই তো তোদের মালদার বানিয়ে দিচ্ছি। একবেলা ভাত জোটাতে পারতিস না, এখন তিনবেলা মুরগি আর ছাগলের রান চিবুচ্ছিস। আর সব শালাদের তো ঐসবেরও ভাগ দিচ্ছি।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা সোজা কারে একটা অশ্লীল ভঙ্গীতে হাসল লোকটা। একবার নন্দিনী ও সীমার অসংবৃত দেহের ওপর চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

সঙ্গের অন্যান্য লোকগুলো এবং দিলা কিন্তু হাসল না। এরা রাইফেল আমার ওপর বাগিয়ে রেখে মাথা নুইয়ে রাখল। পিস্তলটা কোমরের বেল্টে খুঁজে রেখে সুবেদার মাঠের দিকে হাঁটা দিল।

লোকগুলো আমাদের পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে মাঠ পার করে ঠেলে নিয়ে চলল। হাঁটার সুবিধার জন্য আগেই আমার পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছিল। বাড়তি শাড়ির দড়িটা দিয়ে আমার বাঁধা হাতগুলো আরও শক্ত করে পেঁচিয়ে গিট দেয়া হয়েছে। সীমা ও নন্দিনীর হাত খুলে দিয়ে নন্দিনীর শাড়িটাকেও পাকিয়ে দড়ির মতো করে দুপ্রান্ত দিয়ে দুজনের কোমর পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বাঁধার সময় এরা যেমন কেউ বাধা দেয় নি তেমনি মানুষগুলোও মেয়েদের সাথে কোনোরূপ অশালীন আচরণ করে নি। সুবেদার চলে গেলে দিলার নির্দেশেই রাইফেলধারী ছেলেগুলো আমাদের বাঁধাছাদা করেছিল। এখন তার হুকুমেই তিনজনেরই পিঠে নল ঠেকিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা কেউ কোনো কথা বলছিলাম না। এমন কি পরস্পরের মধ্যেও না। নন্দিনী শুধু আমার শাড়ির দড়িতে বাঁধা বাহু ধরে হাঁটছে। তার চোখেমুখে কিছুক্ষণ আগের সেই ভয়বিহ্বল পাঁশুটে ভাবটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সীমাকেই শুধু আমার কাছে প্রাণহীন লাশের মতো মনে হল। তার চুলগুলো খোঁপা ভেঙে উদ্দাম হয়ে পিঠ ছাপিয়ে কোমর ঢেকে ফেলেছে। তার পরনের পেটিকোট ও খালি ব্লাউজে তাকে উপজাতীয় মেয়ের মতো লাগছে। নন্দিনী আরও একটু বেশি নিরাভরণ হয়ে হাঁটছে। পরনে পেটিকোট থাকলেও তার গায়ের ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলায় সে শুধু একটা সিকের কাঁচুলী পরা। তবে নিরুপায় অবস্থায় নারীর লজ্জা উন্মুক্ত করে ফেললে তাদের মধ্যে এক ধরনের উপেক্ষা ও উদাসীনতাই অদৃশ্য পোশাক হয়ে যায় বলে আমার ধারণা হল। কারণ আমার সঙ্গিনী দুজনই এখন আমাদের শত্রু এবং ইজ্জতের জিম্মাদারদের সামনে নিজের অর্ধাচ্ছাদিত দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমরা এতক্ষণে মাঠ পার হয়ে গাঁয়ের পায়ে চলা পথ ধরেছি। লাল মাটির পিচ্ছিল পথ। এখানে সেখানে খানাখন্দে পানি জমে আছে। সতর্ক হয়ে না হাঁটলে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পথের দুপাশে কাটায় ভর্তি কেয়াঝোপ আর আনারস গাছের মেশামেশি জঙ্গল। মাঝে মাঝে বুনোকুল পেকে গাছের ডালসহ রাস্তায় ঝুঁকে পড়েছে। আমরা রাতে এদিকে যে সব বড় গাছের জন্য মাঠ থেকে এলাকাটাকে অন্ধকার অরণ্য। ভেবেছিলাম, এখন দেখছি এগুলো সবি কাঁঠাল গাছ। রাস্তা থেকে আশে পাশে তাকিয়ে গ্রামটিকে একটা মস্ত কাঁঠালবাগান বলে মনে হচ্ছে। একটু এগিয়ে মাটির দেয়াল তোলা দুএকটা ছনের ঘর ও শূন্য উঠোন দেখে বুঝলাম যে পুরো গাঁটাই জনশূন্য মৃত্যুপুরীর মতো পড়ে আছে। একটা বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ একটা দেশী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, লাফিয়ে এসে আমাদের সামনে লেজ নেড়ে কুঁই কুঁই শব্দ করে কাঁদতে লাগল। সম্ভবত কুকুরটা ক্ষুধার্ত। গাঁয়ে মানুষজন না থাকায় খাবার খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ এখন

কয়েকজন মানুষ দেখে রাস্তায় বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যাকুল। নন্দিনীর সায়ায় ঢাকা হাঁটুর কাছে মুখ তুলে শুঁকতে লাগল। নন্দিনী কুকুরটার কাণ্ড দেখে মুহূর্তমাত্র একটু দাঁড়াতেই দিলা রাইফেলের বাট দিয়ে কুকুরটাকে মারতে গেলে সে লাফিয়ে সরে চিৎকার করে কঁকিয়ে উঠল। নন্দিনীর পিঠে অন্য একটি অস্ত্রধারী তরুণ রাইফেলের নল ঠেকিয়ে, হাঁট মাগী। কুত্তার সাথে আর রঙ্গ করতে হবে না। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানকার পাগলা কুত্তাটাই তোর রস চেটে খাবে।

ছেলেটার কথায় তার সঙ্গীরা হঠাৎ হেসে উঠল। গ্রুপটার এখনকার নেতা দিলা অবশ্য হাসল না। সে বরং ঘাড় বাঁকা করে ছেলেটার দিকে একবার তাকাল মাত্র। আর এতেই সবার হাসি উবে গেল। কেউ আর টুঁ- শব্দটি করছে না। আমরা বন্দি তিনজন কোনো কথা না বলে হেঁটে চললাম।

রাস্তাটা একটু এগিয়েই বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। ডান দিকে ঘুরে আমরা আরও কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ির মতো ঘরবাড়ি ও উঠোন দেখতে পেলাম। জায়গাটা আমার ঠিক চেনা বলে মনে না হলেও খুব অপরিচিত এলাকা বলেও মনে হল না। আমি নন্দিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আমরা বর্ডার এলাকার কাছেই আছি। মনে হচ্ছে এটা বামুটিয়া বাজারের কাছেরই কোনো গ্রাম।

নন্দিনী বা সীমা কোনো জবাব দিল না। শুধু সীমা একবার শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে পৌঁছলে দিলা আমাদের থামতে বলল। আমরা মেহেদীর বেড়া দেওয়া একটা আঙিনার কাঠের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গেটটা ঠেলে দিলা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, এখানে এদের নিয়ে তোরা দাঁড়া আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আসি সুবেদার বেটা কি ব্যবস্থা করেছে।

দিলা ভেতরে ঢুকে গেট ঠেলে দেওয়াতে আমি বাড়ির সামনের ঘর বা বারান্দা কিছুই দেখতে না পেয়ে মেহেদীর বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করতে লাগলাম। এটা বোধ হয় এ গাঁয়ের কোনো মান্যলোকের পরিত্যক্ত বাড়ি।

পরিবারটি হয়তো পাকবাহিনীর ভয়ে ভারতে পালিয়েছে কিংবা মুক্তিবাহিনীর অপারেশনের ভয়ে দেশের ভেতরেরই কোনো আত্মীয়- স্বজনের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। কাঠের গেটের ওপর আঙুল দিয়ে লেখা 'ওঁ হরি' এবং সিঁদুরের কয়েকটি রক্তবর্ণ ফোঁটা। নন্দিনীও একবার চোখ তুলে গেটের লেখা ও সিঁদুরের ফোঁটাগুলো দেখে মুখ নামিয়ে নিল।

একটু পরেই দিলা ফিরে এসে আমাদের নিয়ে গেটের ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করলে আমাদের পিঠে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে এতক্ষণ যে তিনজন দাঁড়িয়েছিল তারা ব্যারেলের গুঁতোয় সামনে

এগোবার নির্দেশ দিল। দিলা গেটের কাঠের পাল্লা দুটো মেলে ধরেছে। তার মুখ এখনও গভীর। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফে বোঝা যায় না লোকটার বয়স কত। আন্দাজ চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশ হবে। আজ ভোরের আবছা অন্ধকারে এরা যখন আমাদের ঘেরাও করে তখন সুবেদার ছাড়া কারো মুখের দিকেই আমার তাকিয়ে দেখার ফুসরৎ ছিল না। এখন লোকটাকে ভালো করে দেখলাম। মধ্যবয়স্ক গ্রামচাষীর মুখের মতোই সাদামাটা। এ গাঁয়ে লোকটার একটা মেয়েও আছে, সুবেদারের সাথে এর কথা কাটাকাটির সময় তা বুঝেছিলাম। লোকটার মধ্যে সামান্য ব্যক্তিত্বের গন্ধ পেয়েই কিনা জানি না, সীমা ও নন্দিনীর ব্যাপারে মারাত্মক কিছু ভাবতে মন চাইছিল না। তবুও ভয়ে ভয়ে গেট পার হলাম। ভেতরে সযত্নে লাগানো গেন্ধাফুলের ঝুপড়ি মতন গাছে হলুদ ফুল ফুটে আছে। পুদিনা পাতার ঝোপে আঙিনাটা প্রায় ঢাকা। ঘরের বারান্দায় ওঠার সরু পথটা ইট বিছানো। আমরা আঙিনায় প্রবেশ করে দেখলাম একটা বড় ঢেউটিনের চারচালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। দেড় হাত উঁচু পাকা বারান্দা। বারান্দায় উপুড় করা একটা শূন্য মাটির কলসের ওপর বসে সুবেদার সিগ্রেট টানছে। তার গোঁফের ফাঁকে প্রথম দেখার সেই ক্রুর হাসি। আমাদের উঠোনে প্রবেশ করতে দেখে সে হাতের ইঙ্গিতে ঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে বলল। আমরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠামাত্র সুবেদার উঠে সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তোমার সাথে কথা আছে। তুমি এখানেই দাঁড়াও।

আমি দাঁড়ালাম। আমার পিঠ থেকে রাইফেলের নলটা সরে গেল। নন্দিনী ও সীমা তখনও আমার দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে। পাকানো তাঁতের শাড়ির শক্ত বাঁধনে আমার হাতের শিরাগুলো দড়ির মত ফুলে উঠেছে। যে ছেলেটা আমার পিঠে এতক্ষণ রাইফেল ঠেকিয়ে ঠেলে এখানে নিয়ে এসেছে এখন সে রাইফেলের বাট মাটিতে ঠেকিয়ে আমার সামনে অর্থাৎ সুবেদারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সুবেদার পেছন দিকে না তাকিয়েই ছেলেটাকে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলল, খুলে শাড়ি দুইটা দুই মাগীকে পরতে দিয়ে পাশের কামরায় তালা বন্ধ করে রাখ।

সুবেদারের কথা শুনে আমার পাহারাদার ছেলেটা এবার পেছন থেকে সামনে এগিয়ে এল, তালা পাব কই স্যার।

ছেলেটা আমার হাতের শক্ত বাঁধন খুলতে গিয়ে রাইফেলটা ঘরের টিনের বেড়ায় ঠেক দিয়ে রেখে এল।

সুবেদার বলল, তালা যোগাড় করতে হবে। এখন ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দে। পালাবার চেষ্টা করলে অমনি গুলী। কুছ পরোয়া নেই। আগামীকাল ক্যাম্পে চালান। আর এটার সাথে কথা হয়ে গেলে এটাকে রান্না ঘরের বাঁশের সাথে বাঁধবি। কি দড়িদড়াও যোগাড় করতে পারবি না দামড়া কোথাকার?

পারব।

হাসল ছেলেটা। একুশ বাইশ বছর বয়েস হবে। পরনে লুঙ্গি ও কালো গেঞ্জি। দেখতে রেলের কুলির মতো চেহারা। মনে হয় এসব কাজে এখনও তেমন দক্ষ হয়ে ওঠে নি। খাওয়া পরা ও নগদ টাকার লোভেই এদের সাথে জুটেছে। ছেলেটা আমার বাঁধন খুলে দিল। হাতের কবজি ও কনুই হঠাৎ দারুণভাবে ব্যথা করে উঠল। এতক্ষণ রক্ত চলাচল অসার থাকায় কোনো অনুভূতি ছিল না। তবুও আমি বাহুটা ঝাঁকুনি দিতে পারছিলাম না। আস্তে করে শুধু কনুইয়ের নিচের অংশটা নাড়ালাম। ততক্ষণে অন্য দুজন রাইফেলধারী তরুণ ও দিলা সীমা আর নন্দিনীর কোমরের বাঁধন খুলে দুজনের হাতে তাদের শাড়ি তুলে দিল। নন্দিনী সাথে সাথেই শাড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে আঁচল কাঁধের ওপর রাখল। কিন্তু সীমা শাড়িটা হাতে নিয়ে শূন্যদৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরল না। বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়া সিঁথিতে এখনও আবছামতো লালের তোবড়ানো রংটা রয়ে গেছে। হাতে শাদা শাখা দুগাছি মাত্র।

আমি বললাম, দিদি শাড়িটা পরুন।

আমার কথায় সীমা কোমরে আঁচলের প্রান্ত ভাগটা গুঁজল।

সুবেদার হেসে বলল, তুমিও মালোয়ানের বাচ্চা নাকি?

আমি কোনো জবাব দিলাম না। সীমার শাড়ি পরা হয়ে গেলে দিলা এদের ঠেলতে ঠেলতে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। তার সাথে গেল সীমা ও নন্দিনীর পাহারাদার দুজন। খালি বারান্দায় আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে সুবেদার উল্টানো শূন্য মাটির ঠিলার গোল পেটের ওপর বসল। আবার একটি সিগ্রেট ধরিয়ে আমার মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, সিগ্রেট খাও?

না।

বড় মাগিটা তোমার বৌ?

না।

এরা তোমার কে?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি একটু চিন্তা করে নিলাম। আমি চুপ করে আছি দেখে সুবেদার আবার প্রশ্ন করল, এদের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এদের কোত্থেকে এনে বর্ডার পার করে দিচ্ছিলে? তোমাকে তো দেখে মালোয়ান বলে মনে হচ্ছে না? তুমি মুক্তিবাহিনীর খবর জানো? তোমাকে যা জিজ্ঞেস করি ঠিক ঠিক জবাব দেবে। মিথ্যে বলে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে এক্ষুণি তোমাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে এই পিস্তলের গুলীতে শেষ করে দিয়ে আসব।

আমি বললাম, নন্দিনী আমার স্ত্রী। আর সীমা তার বড় বোন।

তুমি হিন্দু?

না। আমি মুসলমান।

তোমার বিবি তবে মালোয়ান হয় কি করে! তুমি হিন্দু বিয়ে করেছ?

একটু বিস্ময় মেশানো গলায় সুবেদার জানতে চাইল।

আমিও অসংকোচে মিথ্যে বললাম, হ্যাঁ।

কতদিন বিয়ে হয়েছে?

ছাব্বিশ মার্চ রাতে।

আমার সাথে ফাজলেমি করছ?

ফাজলেমি করব কেন?

আমিও সহজভাবে জবাব দিতে গিয়ে একটু বাড়িয়ে বললাম, ছাব্বিশে মার্চ গোলযোগ বাধার সম্ভাবনা আছে ভেবেই আমরা সন্ধে রাতে বিয়ের আয়োজন করি।

কাজী ডেকে বিয়ে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তোমার বৌ কলেমা পড়েছিল?

হ্যাঁ। মুসলমান না হলে কী করে কাজী ডেকে বিয়ে হয়।

আমার কথায় লোকটা কী যেন একটু চিন্তায় পড়ে গেল। শেষে আচমকার মতো আমার নাম জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

সৈয়দ আবদুল হাদি মীর।

ঢাকায় কী করতে?

সরকারি চাকুরি। পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের লাইব্রেরিয়ান।

আমি বেশ দৃঢ়তার সাথেই আমার আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করলাম। মনে হল আমার অকম্পিত কণ্ঠস্বরে লোকটা রেগে গেল, তুমি সরকারি কর্মচারী হও আর যাই হও তুমি মুক্তিবাহিনীর লোক। আমি তোমাদের তিনজনকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব। আগামীকাল সকালে আমাদের টহল বোট আসবে। আজকে রাতটা শুধু তোমার বৌ আর শালীকে নিয়ে একটু মজা করব। পরে তো পাঞ্জাবিরাই এদের শেষ করবে। তার আগে আমরা একটু করলে কী আর ক্ষতি হবে? কী বল!

লোকটা অদ্ভুত ভাবে হাসল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, মেয়েদের ইজ্জতের ওপর হামলা হলে, তুমি যেই হও তোমাকে এবং তোমার সমস্ত পরিবার পরিজনকে এর মারাত্মক খেশারত দিতে হবে, এটাও ভেবে দেখো।

আমার কথা শেষ হওয়া মাত্রই হারামজাদা হঠাৎ পায়ের বুট তুলে আমার মুখের ওপর সজোরে লাথি মেরে আমাকে বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দিল। রাজাকার ছেলেটাকে চেঁচিয়ে বলল, শুয়োরের বাচ্চাটাকে মাগীগুলোর পাশের কামরায় হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখ। ওর তেজ আমি কমিয়ে দেব।

বারান্দার নিচে পুদিনার ঝোপের ওপর চিৎ হয়ে পড়া আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, আজ রাতেই তোর বৌ আর শালীর ইজ্জত পিছলা করে দেব। ও ঘরে কাট্টা হয়ে শুয়ে শুনতে পাবি কুত্তার বাচ্চা।

রাজাকার ছেলেটা লাফিয়ে নিচে এসে আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

সুবেদার তার হোলস্টার থেকে পিস্তল টেনে বের করে আমার মাথার দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে উঠে দাঁড়ালাম। আমার কষ বেয়ে থুতনির ওপর রক্তের আঠালো ফোঁটা ঝুলছে। বাম চোখটা ফুলে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ প্রায়। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মাথা ঘুরছে। এর মধ্যেই ছায়ার মতো দেখলাম দিলা তার সঙ্গী দুজনসহ ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে বারান্দায় টেনে তুলতে গিয়ে বলল, বেকুফ।

বারান্দায় উঠলে আর আমাকে এখানে দাঁড়াতে দেওয়া হল না। টেনে হিঁচড়ে একটা কামরায় এনে গরুবাঁধার শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে মেঝেয় ঠেলে শুইয়ে দিল। আমার পিঠের নিচে সিমেন্টের ছোঁয়া লাগামাত্র আমার সারা শরীর ও মাথা হিস্টিরিয়া রোগীর মতো থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। অসম্ভব শীতে আমি কুঁকড়ে যেতে লাগলাম।

.

এ অবস্থায় ঘোরের মধ্যে কতক্ষণ পড়েছিলাম কিছুই আমার মনে নেই। সম্ভবত আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন চেতন পেলাম তখনও শরীরটা স্বাভাবিক বলে মনে হল না। এখনও মাথাটা ঝিম ধরে আছে। একটা পা উরতসহ ঝটকা দিয়ে কেঁপে উঠছে। এই প্রথম আমার মনে হল আমি বোধ হয় দুদিন ধরে কিছু খাই নি। পেট, নাড়িভুড়ি খিদেয় এখন ব্যথা করছে। বাইরে একটানা ঝিঁঝির ডাক শুনে আন্দাজ করলাম এখন গভীর রাত।

রাত? আমি চমকে উঠলাম আর তক্ষুণি মনে পড়ল আমার শারীরিক খিঁচুনির কোনো এক সময় আমি নন্দিনীর আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম। সে ভগবানের দোহাই দিয়ে এদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। সীমার ফুঁপিয়ে কান্নার সাথেও যেন আমি কয়েকবার ভগবানের নাম শুনতে পেয়েছিলাম।

এখন সারাটা বাড়ি নিস্তব্ধ হলেও ঝিঁঝির তীক্ষ্ণ সূঁচালো আওয়াজে আমার সচেতনতা ধীরে ধীরে সজাগ হচ্ছিল। দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হাতপায়ের অসাড়তা খানিকটা অনুভব করলেও কোমরের বেদনা বোধই টের পাচ্ছি না। হঠাৎ কেন জানি মনে হল, অতীতে আমি কোনো দিশেহারা বিপদে হতভম্ভ হয়েও আমার নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর ভরসা হারায় নি। মুখে প্রকাশ না করলেও আমার বন্ধুরা আমাকে একজন নাস্তিক বলেই জানে বা ধারণা করে এসেছে। আমার সামান্য রচনায় স্বাভাবিক উপমা উত্থাপনে বাস্তবতার বোধ বা কল্পনার দৌরাত্ম্য দৈব নির্ভর ছিল না। এখন হঠাৎ মনে হল আমি এখন যে অবস্থায় আছি এ অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমার এ ভাবনায় আমি অত্যন্ত মুষড়ে পড়লাম এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলাম। আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে, আল্লাহ আল্লাহ শব্দটি ক্রমাগত বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি আবার গত সকাল বেলার ঘোরের মতো অবস্থায় তলিয়ে যেতে লাগলাম।

.

প্রচণ্ড গোলাগুলীর আওয়াজে সকাল বেলা আমার ঘোর আর ঘুম উভয় অবস্থাই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি মেঝের ওপর থেকে দারুণ বিস্ফোরণের শব্দে হকচকিয়ে গেলেও মাথা তুলতে পারছিলাম না। আমার মস্তিষ্ক কাজ করছে অথচ মাথাটা একটা গোল ভারী পাথরের মতো

মেঝেতে লুটানো। বাড়িটার বারান্দায়, প্রাঙ্গণে এবং পাশ্ববর্তী কামরায় মানুষের ছোটাছুটি, কান্না ও গোঙানির শব্দে আমি আরও একবার আপ্রাণ চেষ্টায় মাথাটা উঁচু করা মাত্র দড়াম করে আমার ঘরের দরজাটা খুলে আনিস ঘরের ভিতর লাফিয়ে পড়ল। তার হাতে স্টেনগান বাগানো। তার পিছে পিছে আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা তড়িৎ চাতুর্যে কামরায় প্রবেশ করে, জয় বাংলা বলে ধ্বনি দিল। আনিস তাদেরকে তাড়াতাড়ি আমার বাঁধন খুলে দিতে বলে দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। নন্দিনীদের কথা জিজ্ঞেস করার আগেই আনিস চলে যাওয়াতে আমি যে মুক্তিযোদ্ধাটি আমার দড়ির বাঁধন দাঁত দিয়ে টেনে খুলে দিচ্ছিল তাকে বললাম, আমার সাথে আরও দুজন মহিলা ছিলেন। পাশের কামরায় এদের ওপর রাতে নির্যাতন হয়েছে। এরা কই?

এদের বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দাঁড়াতে পারছেন না। এরা মারাত্মকভাবে রেপড। একজনের সেন্স এখনও ফেরে নি। চলুন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে।

দড়িদড়া খুলে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাটি আমাকে উঠে বসতে ঘাড়ের নিচে হাত রেখে টান দিল। আমিও আপ্রাণ চেষ্টায় শরীরটা তুলে কোনো মতে বসলাম। পা দুটো ও মাথা অসম্ভব রকম টন টন করে উঠল। আমি ছেলেটাকে আবার তাড়াতাড়ি মেঝেয় শুইয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে কঁকিয়ে উঠলাম, বসতে পারছি না। শুইয়ে দাও।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি আমাকে আগের মতো শুইয়ে দিয়ে বুকটা মালিশ করতে লাগল। সে এখন আমার অবস্থা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পেরেছে। আমি বললাম, রাজাকাররা কী পালিয়েছে?

সবগুলো খতম। একটাও পালাতে পারে নি।

উৎফুল্ল মুখে বলল মুক্তিযোদ্ধা তরুণটি। বয়স বাইশ তেইশের বেশি হবে না। মুখে একটা দুঃসাহসী প্রাণমাতানো সরল বিজয়ী হাসি।

আমি বললাম, পালের গোদাটা, খাকি জামাপরা গোঁফঅলাটাকে মারতে পেরেছ?

বাইরে এসে দেখুন না, ঘরে সিঁড়ির পাশে গেঁদাফুলের ঝোপের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর নাড়িভুড়ি সারা উঠোনটায় ছড়িয়ে গেছে। আর বাকিগুলোর লাশ রাস্তায় পড়ে আছে। পালাতে চেয়েছিল। দুই ব্রাস ফায়ারে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ছেলেটা মুখে আবার হাসি ছিটকে ছড়িয়ে গেল। আমি বললাম, আনিস তাহলে দৌড়ে আবার কোথায় গেল?

গাঁটা সার্চ করতে গেছে। লোকজন নেই যদিও। তবুও একবার সার্চ করে যাওয়া ভালো।

ছেলেটার উদ্দীপনা দেখে এবার আমি বুকের ওপর থেকে ওর হাত আস্তে সরিয়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায় দাঁতে দাঁত চেপে উঠে বসলাম। সারা শরীরে টনটনে ব্যথা অনুভব করলেও আমি শক্ত হয়ে বসে থাকলাম। ছেলেটা বলল, আরও একটু বসে থাকুন এখুনি উঠবার চেষ্ট করবেন না। আমি তার কথা না শুনে মনের জোরে তার কাঁধের ওপর ভর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, আমাকে মেয়েদের কাছে বারান্দায় নিয়ে চলো। ছেলেটি আমার কোমর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরার জন্যে তার স্টেনগান ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বদল করল এবং দ্রুত ডান হাতে আমার কোমরটা পেঁচিয়ে ধরল। আমি তার সাথে হিঁচড়ে এগোতে লাগলাম। আমার শরীরের নিম্নাংশ প্রবল কাঁপুনি ঝটকা দিয়ে উঠলেও আমি হাঁটা না থামিয়ে ছেলেটির সাথে বারান্দার দিকে প্রাণপণে চলতে লাগলাম। ছেলেটা আমাকে টেনে হিঁচড়ে বারান্দায় এনে বসিয়ে দিল। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা সীমার পাশে এসেই বসেছি। নন্দিনী চুপচাপ উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তার পরনে শুধু সায়া। শরীরে ব্লাউজ বা ব্রেসিয়ার কিছু নেই। পিঠ ও বুক নগ্ন এবং পাশবিক অত্যাচারের চিহ্নে ক্ষত বিক্ষত। আমাকে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। আমি কোনো মতে টেনে হিঁচড়ে নন্দিনীর কাছে গিয়ে তার হাত ধরতেই সে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে জোরে বিলাপ করে কেঁদে উঠল। আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না। আমি বারান্দায় পড়ে থাকা রক্তে ভেজা নোংরা শাড়িটাই টেনে এনে তার শরীরের ওপর মেলে দিলাম। আমার এতটুকু সহানুভূতিতেই নন্দিনীর সম্ভ্রমবোধ যেন ফিরে এল। সে বসে থেকেই শাড়িটা পেঁচিয়ে পরে নিল। এ সময় অকস্মাৎ সীমাও পাশ ফিরে আমার দিকে চোখ পড়ায় ফুঁপিয়ে কতক্ষণ কাঁদল। আমি সীমার মাথায় হাত রাখতেই সীমা উঠে বসল। তার পরণেও একটা সায়া ছাড়া আর কিছু নেই। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটা অবস্থা দেখে ঘরের ভেতর থেকে সীমার পরিত্যক্ত শাড়িটা কুড়িয়ে এনে আমার হাতে দিল। সীমা আমার হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে পরতে গিয়ে চীৎকার করে পিছিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পুদিনা ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইল। পুদিনা ঝোপে স্টেনগানের ব্রাস ফায়ারে বিদীর্ণ সুবেদারের লাশ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সারা উঠোনের ঝোপঝাড় আর লতাগুল্ম রক্তে মাখামাখি। মানুষের পীতাভ হলদে নাড়িভুড়ি লাশটার পাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক ধরনের দুর্গন্ধে মুহূর্তের মধ্যে আমার বমির উদ্রেক করলেও আমি ঢোক গিলে আমার অস্বস্তি চাপবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সীমা ও নন্দিনী উভয়েই এখন বিস্ফারিত চোখে সুবেদারের লাশটা দেখছে। আমি বললাম, আনিসের দল আমাদের বাঁচিয়েছে। রাজাকাররা সবি মারা পড়েছে। এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

আমার কথার সমর্থনে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেটিও সায় দিল, আর একশো গজের মধ্যে বর্ডার। আপনারা একটু হাঁটতে পারলেই পার্বত্য ত্রিপুরায় ঢুকে যাবেন। আমাদের লোকজন আনিস ভাইয়ের সাথে গাঁটা সার্চ করতে গেছে। এখনই ফিরে আসবে। আপনারা মনে একটু সাহস আনুন। আমরা রাতেই অপারেশন বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের হদিস বের করতে পারি নি। আনিস ভাই পথ চিনে এগিয়ে আসতে না পারায় আপনাদের এই দুর্গতি পোহাতে হল। তবুও

ভাগ্য ভালোই বলতে হবে যে আমাদের কেউ প্রাণে মারা পড়ে নি। আপনারা যাওয়ার জন্যে রেডি হোন, আমি দেখছি। আনিস ভাই ও আমাদের এ্যাকশন পার্টির ছেলেরা কোন দিকে গেছে।

আমি ছেলেটাকে হাতের ইঙ্গিতে দাঁড়াতে বলে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। যদিও আমার পা দুটি তখনও থর থর করে কাঁপছে। বললাম, দাঁড়াও। তোমার নাম কি?

বাহাউদ্দিন।

ছাত্র?

হ্যাঁ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়তাম।

বাহাউদ্দিন কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে মুখ তুলে হাসল।

আমি বাহাউদ্দিনকে বললাম, তোমরা যাই করো একটু তাড়াতাড়ি করো। কাল এই হতভাগা সুবেদারটার মুখে শুনেছি আজ এদিকে পাঞ্জাবিরা টহল বোট নিয়ে আসবে। এরা আসার আগেই আমি যাতে মেয়ে দুজনকে নিয়ে বর্ডার পার হয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করা দরকার। তোমাদের হাতে অস্ত্র আছে। তোমরা হয়তো ওদের কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে পালাতে পারবে কিন্তু আমাদের একটু আগেই যাওয়া দরকার।

আমার কথা শুনে বাহাউদ্দিন দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি এখনই আনিস ভাইকে খবর দিচ্ছি। আপনি আপনার পাশের মহিলার জ্ঞান ফিরিয়ে আনুন।

আমাদের কথাবার্তার চেতন পেয়েই কিনা জানি না সীমা ধড়মড় করে উঠে বসেই বলল, চলুন। আমি হাঁটতে পারব।

জানি না এতক্ষণ সীমা অজ্ঞান অবস্থায়ই ছিল কিনা। কিংবা হয়তো সম্ভ্রম হারানোর লজ্জায় অচেতনের ভান করে পড়ে ছিল। আমি বললাম, দিদি, একটু অপেক্ষা করুন। আনিস আসুক।

আমার কথায় সীমা নন্দিনীর দিকে তাকাল। নন্দিনী আগের মতোই উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। আমার ইঙ্গিতে সীমার দিকে ফিরে বলল, শাড়িটা পরে নাও। এখন আর কারো সাহায্যের দরকার হবে না। চলো আমরা নিজেরাই হাঁটা শুরু করি। সামনে যদি বর্ডার হয়ে থাকে তবে আর ভয় কি?

নন্দিনীর কথায় যে শ্লেষ আছে তা যে আমাকেই বিদ্ধ করার জন্যে উচ্চারিত তা আমি বুঝতে পেরে লজ্জায় ও অক্ষমতার গ্লানিতে মাথা নুইয়ে রাখলাম।

নন্দিনী এগিয়ে এসে সীমাকে বারান্দায় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে গেলে আমিও সাহস করে সীমার ডান কনুই ধরে দাঁড়ালাম। এখন আমার ও নন্দিনীর মুখ একেবারে সামনা সামনি। নন্দিনী আমাকে ধরতে দেখে বোনের হাত ছেড়ে দিয়ে সীমার পায়ের কাছে চটচটে শুকনো রক্তের দাগে ভরা লুটিয়ে পড়া শাড়িটা তুলে তাকে পরিয়ে দিতে লাগল। শাড়িটা গিট দিয়ে নাভির ওপর বাঁধতে গিয়ে একবার আড়চোখে আমার দিকে চাওয়া মাত্রই আমি কথা বলার সুযোগ পেয়ে বললাম, নন্দিনী আমার অক্ষমতাকে মাফ করে দাও। তুমিই বলো, কালকের পরিস্থিতিতে ওদের হাতে বাধা থেকে বেদম মার খেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় আমি কী করতে পারতাম?

নন্দিনী কতক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, আমাকে আর দিদিকে ওরা চিরকালের মতো শেষ করে দিয়েছে হাদী ভাই। এখন আমাদের কী গতি হবে আপনিই বলুন?

আমি জবাবে বললাম, ওরা সুযোগ পেয়ে তোমাদের যে ক্ষতি করেছে, নন্দিনী, তা আমার মা বোনের ওপরই করেছে। এ জন্য কী তোমাদের কোনো সামাজিক জবাবদিহির প্রয়োজন আছে? অত্যাচারিত ও অসহায়ভাবে ধর্ষিতা বাংলাদেশের প্রতিটি নারীই এখন স্বাধীনতার বলি। এখন এ নিয়ে কথা বলে বা অনুযোগ করে কী কোনো লাভ আছে নন্দিনী? যদি তোমাদের হাঁটার শক্তি থাকে তবে চলো আমরা এক্ষুণি বর্ডারের দিকে চলা শুরু করি। আমাকেও এরা বেঁধে রেখে পিটিয়ে সারা রাত অজ্ঞান আর অচল করে দিয়েছে। তবুও আমি মাইল খানেক প্রাণপণ চেষ্টায় হেঁটে যেতে পারব।

নন্দিনী আমার কথায় হঠাৎ যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল, চল দিদি।

কিন্তু আনিসরা ফিরে এসে আমাদের না পেয়ে আবার খোঁজা শুরু করে বিপদে পড়বে। বরং একটু অপেক্ষা করে এদের সাথেই যাওয়া ভাল।

সীমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা বাড়ির বাইরে একটা হই চই শুনতে পেলাম। একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের সাথে মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল। আনিসের গলাই আমাদের কানে এল, হারামজাদি রাজাকারের মাগী। আজ তোর বারোটা বাজাবো।

বলতে বলতে একটা মেয়েকে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে আনিস বাড়িটার ভেতর এসে ঢুকল। মেয়েটা বাজান গো কে তোমারে এমন কইরা মাইরা ফালাইয়া

রাখছে গো–বলে সামনে বিলাপ করছে এবং আনিসের হাত থেকে তার মাথার চুলের গোছা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

আনিস ভেতরে ঢুকেই আমাদের দেখতে পেয়ে বলে উঠল, এই হারামজাদিকে দিলা রাজাকারের বাড়ি থেকে ধরে এনেছি। এদের ভয়েই এই গাঁয়ের সব মানুষ ইণ্ডিয়া পালিয়ে গেছে। দিলা রাজাকার আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হেফজু সুবেদার পাঞ্জাবিদের পথ ঘাট চিনিয়ে দিয়ে বহু পরিবারের সর্বনাশ করেছে।

আমি বুঝলাম এ মেয়েটির কথাই কাল দিলা বলেছিল। বলেছিল মেয়েটির স্বামী তাকে ফেলে ইণ্ডিয়া চলে গেছে। আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। আনিসের টানা হ্যাঁচড়াতে মেয়েটির পরনের শাড়ি খুলে গেলেও সে প্রাণপণে শাড়ির একটা প্রান্ত হাতের মধ্যে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে। তার চুলের গোছা আনিসের হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা। আনিসের পাশে তার অন্য চারজন সঙ্গি, এদের মধ্যে বাহাউদ্দিনও আছে, মেয়েটাকে তাদের হাতিয়ার দিয়ে কখনো গুঁতো আবার কখনো নির্মমভাবে বাড়ি মারছে।

আমি সোজাসুজি আনিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, একে ছেড়ে দাও আনিস।

আপনি কী বলছেন? একটা কোলাবরেটরের মেয়েকে ছেড়ে দেব? যার বাপ গত রাতে আপনার সাথের ভদ্র মহিলাদের র‍্যাপ করেছে?

ঐ কাজের জন্য এই মেয়েটি দায়ী নয়।

তার বাপ দায়ী।

তার বাপ এবং বাপের সঙ্গিরা তাদের কৃতকর্মের সাজা পেয়েছে। যদিও আমার জানা নেই গতরাতে দিলা সীমা ও নন্দিনীর ওপর কোনো জুলুম করেছে কিনা। করুক বা না করুক কোলাবরেটরের যোগ্য শাস্তি তারা পেয়েছে। মৃত্যুর ওপর কোনো সাজা নেই। তোমরা তাদের সকলকেই গুলী করে মেরেছে। এই মেয়েটি এর জন্য দায়ী নয়। একে ছেড়ে দাও।

আমি এগিয়ে গিয়ে আনিস যে হাতে দিলার মেয়েটার চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে রেখেছে সে হাতেরই কব্জিটা ধরলাম। আমার ব্যবহারে আনিস মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রতবোধ করলেও হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল, সরে দাঁড়ান কবি সাহেব। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। আমি আনিসের হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, তুমি একে নিয়ে কী করতে চাও?

গত রাতে আপনার সঙ্গিনীদের সাথে রাজাকাররা যা করেছে আমরাও এর ওপর এখন তাই করব। ভয় নেই, এর বেশি কিছু করবো না।

বলে আনিস তার সঙ্গিদের দিকে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসল। আমি অসহায়ের মতো একবার নন্দিনী ও একবার সীমার দিকে তাকালাম। দেখলাম, তারা কী করবে ভেবে না পেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ভেবেছিলাম সীমা ও নন্দিনী মেয়েটাকে বাঁচাতে এখনি আনিসের ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পরিস্থিতি তাদেরও এমন নিরুপায় করে রেখেছে দেখে আমি নিজেই আবার আনিসের হাত চেপে ধরলাম।

আনিস, আমি তোমাদের একাজ করতে দিতে পারি না।

আপনি সরে যান।

আনিস আমার হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে, আমি আরও শক্ত করে তার কব্জি চেপে ধরতে চেষ্টা করলাম। আনিস আমার ব্যবহারে অত্যন্ত চটে গেল। এবার সে তার হাতের হাতিয়ার দিয়ে আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, সরে যা শুয়োরের বাচ্চা। এটা এ্যাকশনের সময়। এখন আমার সামনে যেই দাঁড়াবে তাকেই ব্রাশ মেরে দেব। এটা লড়াইয়ের স্পট। কবিতা- ফবিতার জায়গা নয়।

স্টেনগানের একটা গুঁতো এসে আমার কণ্ঠার হাড়ের ওপর পড়ল। আমি বাহাউদ্দিনের হাতের ধাক্কায় দুহাত পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। আর সাথে সাথেই আনিসের অন্য সঙ্গিরা আমাকে জাপটে ধরে এমন প্যাঁচ কষল যে আমি মুহূর্তের মধ্যে নন্দিনীর পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। নন্দিনী ও সীমা এসে আমাকে ধরল। আর এই সুযোগে দিলার মেয়েটাকে পাজা কোলে তুলে নিয়ে আনিস ও তার সঙ্গিরা ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে খিল এঁটে দিল। ভেতর থেকে মেয়েটা আর্ত চিৎকার করে আল্লার সাহায্য চাইতে লাগল, আল্লাগো বাঁচাও। আপনারা আমার ধর্মের ভাই। আমারে ছাইড়া দ্যান।

ঐ সেই ঘর, গত রাতে রাজাকাররা সীমা ও নন্দিনীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল আর তারা ভগবানের নাম ধরে ডাকাডাকি করে রেহাই পায় নি।

আমি তাড়াতাড়ি নন্দিনীর কাঁধে ভর রেখে উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই বললাম, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। চলো বর্ডারের দিকে হাঁটা দিই।

নন্দিনী বলল, চলুন আমরা যেতে পারব। আমাদের আপনি শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

আমরা দ্রুত উঠোন পেরিয়ে বাইরে এসে দেখি, একেবারে গেটের সামনেই দিলার গুলী খাওয়া মৃত দেহটা পড়ে আছে। মৃতের চোখ দুটি একটু অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত। আর পথের ওপর বিক্ষিপ্ত ভাবে হাত- পা ছড়িয়ে পড়ে আছে অন্যান্য রাজাকাররা। যে কুত্তাটা গতকাল আমাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে কিছু খাবারের লোভে পিছু নিয়েছিল এখন সে রাস্তায় ছিটকে পড়া জমাটবাধা মানুষের রক্ত মজা করে চাটছে।

অবস্থাটা দেখে সম্ভবত নন্দিনীর গা ঘুলিয়ে উঠল। সে পথের ওপরই বসে পড়ে ওয়াক করে বমি করতে লাগল। আমি ও সীমা তাকে টেনে তুলে রাস্তা ধরে সামনের দিকে ছুটে চলতে লাগলাম।

.

কিছুদূর এগিয়েই পথ সোজা পূর্বদিক বাঁক নিয়েছে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথটা সরু হয়ে সামনের দিকে গেছে। আমরা এতক্ষণ নন্দিনীকে মাঝখানে রেখে দৌড়ে যাচ্ছিলাম। অল্পক্ষণ ছুটেই সকলে হাঁপিয়ে গেলাম। নন্দিনী হঠাৎ তার গতি কমিয়ে সাধ্যমতো হেঁটে চলতে লাগল। আমি বুঝলাম সে আর দৌড়ুতে পারছে না। আমি ও সীমা গতি কমিয়ে তার সাথে হেঁটেই চলতে লাগলাম। এর মধ্যে পথের মাঝেই নন্দিনী একটা গাছের গুঁড়িতে তলপেট চেপে ধরে বসে পড়ল। আমি লক্ষ করলাম তার পায়ের পাতায় উরু বেয়ে তাজা রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে আমার ও সীমার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না। আমরাও তার সাথে গাছের গোড়ায় বসে পড়লাম। আমি বললাম, কোনো ভয় নেই। তার চলতে অসুবিধে হলে এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা ধীরে সুস্থেই হেঁটে যাবো।

নন্দিনী সামনের দিকে মাথা নুইয়ে তার পেট চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার দেখাদেখি সীমাও কাঁদছে। আমার তখন একটা দিশেহারা অবস্থা। আমি নন্দিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। আমার মুখে সান্ত্বনার কোনো ভাষা না যোগালেও বললাম, নন্দিনী একটু সহ্য করে আরেকটু হাঁটতে হবে। আমরা বোধহয় বর্ডারের খুব কাছেই চলে এসেছি। এখন তো ভেঙে পড়লে চলবে না। আর একটু সাহসের পরিচয় দিতে হবে। যদি কিছু মনে না করো তবে আমার কাঁধে ভর রেখে, আমাকে জড়িয়ে ধরে চলো।

আমার কথায় নন্দিনী হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, আমাকে এরা একদম শেষ করে দিয়েছে। রক্ত তো থামছে না। এখন আমি কী করি বলুন না। আমি তো আর দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছি না। আমি কী করে যাব, মাগো।

যদিও নন্দিনীর ভয়াবহ শারীরিক অসুবিধার দিকটা আমার ও সীমার বুঝতে বাকি রইল না তবুও তাকে আমরা উভয়েই পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। সে তার দু বাহু আমাকে ও

সীমাকে জড়িয়ে ধরেই হাঁটার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা তাকে প্রায় হিঁচড়ে নিয়েই চলা শুরু করলাম।

সকাল বেলার আমেজ কেটে গিয়ে তখন গাছের ওপর ও পাতার ফাঁক দিয়ে পথের পরিচ্ছন্ন সূর্যের আলো এসে পড়ল। রোদের তাপ বাড়ছে। নন্দিনীর পা বেয়ে যে রক্তের ধারা নামছিল তা সম্ভবত এখন একটু থেমেছে। সে তার কাঁধ থেকে আমার ও সীমার হাত সরিয়ে নিতে ইঙ্গিৎ করলে আমরা তাকে ছেড়ে দিলাম। সে হাঁটছে। যদিও খুব ধীরে তাকে পা ফেলতে হচ্ছে তবুও নিজের শক্তিতে হাঁটতে পারছে দেখে আমি মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করলাম। উৎসাহ দেয়ার জন্য একবার বললাম, আগরতলা গিয়েও আমি তোমাকে ফেলে পালাব না। আমি দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তোমার সাথেই থাকব।

নন্দিনী কিছু না বলে মাথা নুইয়ে খুব ধীরে হিসেব করে পা ফেলে সামনের দিকে চলতে লাগল। শুধু একবার ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে আমাকে দেখল। আমি তার চোখে চোখ রেখে আপনজনের মতো একটু হাসির আভাস ব্যক্ত করতে চাইলাম। নন্দিনী আমার আশ্বাসের ইঙ্গিৎ সম্ভবত খানিকটা বুঝতে পারল। কারণ তার চোখের কোণ মুহূর্তের জন্য ভিজে গিয়ে একটু চিক চিক করে উঠতেই আমি বললাম, এই যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটবে তার নিরপেক্ষ সাক্ষী হব তুমি আর আমি। আমরা যুদ্ধ চলাকালে কোনো অবস্থাতেই পরস্পরকে ছেড়ে যাব না, তুমি আমাকে কথা দাও।

আমাকে নিয়ে আপনার শুধু ঝামেলাই বাড়বে।

বেশ স্পষ্ট করে কথাগুলো বলল নন্দিনী। সীমা যে আমাদের সাথেই আছে একবারও সেদিকে তাকাল না। আমি বললাম, ঝামেলাটাতো আর আমাদের ইচ্ছেয় তৈরি হয় নি। দৈবই আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।

নন্দিনী আর কোনো কথা না বলে হাঁটতে লাগল।

০৩. একটু হেঁটে এগিয়ে গেলে

আমরা একটু হেঁটে এগিয়ে গেলেই দেখতে পেলাম আমাদের পায়ে চলার পথটি একটা ঘন জঙ্গলের ভেতরে সরু হয়ে ঢুকেছে। জঙ্গলের ওপাশে সার বাঁধা একটানা ঝিঁঝির ডাক কানে এল। সম্ভবত বেশ কিছুকাল যাবত এপথে মানুষের চলাচল নেই। বুনো সবুজের এক ধরনের ঝাঁঝালো গন্ধ এসে নাকে লাগল। নন্দিনী এখানে অরণ্যের একটি আড়াল পেয়ে হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ধপ করে পথের ওপরই বসে পড়ল।

আমি আর চলতে পারছি না।

আমি আর সীমা কোনো কথা না বলে, নন্দিনীর গা ছুঁয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। সীমা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, ভগবান আমাদের বাঁচাও।

সীমার কান্নায় নন্দিনীও ফুঁপিয়ে উঠল। আমি দুজনের মুখের দিকে আর তাকাতে না পেরে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকলাম। এসময় হঠাৎ বেশ দূরে স্টেনগানের গুলীর আওয়াজ থেমে থেমে বেজে উঠল। আমি মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেললাম টহল বোট থেকেই গুলী বিনিময় হচ্ছে। আমি আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নন্দিনীকে ঠেলে তুললাম, জোরে হাঁটো। দেরি করলে বিপদ হবে।

নন্দিনী আর সীমা উঠেই প্রাণপণ দৌড়াতে লাগল। আমিও এদের পেছন পেছন দৌড় দিলাম। নন্দিনী ও সীমা হাত ধরাধরি করে দৌড়ে যাচ্ছে। আমি আর একটু এগিয়ে গিয়ে নন্দিনীর বাঁ হাতটা ধরলাম। নন্দিনী আমার স্পর্শ পেয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমার গলায় দুহাত জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ফেলল, আমাকে বাঁচান। আমাকে এরা মেরে ফেলবে।

আমি তাড়াতাড়ি আমার গলা থেকে তার হাত দুটি সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, নন্দিনী শেষ মুহূর্তে মনে সাহস রাখো। নইলে আমরা সবাই ধরা পড়বো। সবাইকে মরতে হবে।

আমার কথা শেষ হবার আগেই সীমা আর্ত চিৎকার করে উপুড় হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। মেশিনগানের শব্দটা খুব দূর থেকে ভেসে আসছে বুঝতে পারলেও আমি নন্দিনীকে এক ধাক্কায় রাস্তার উপর শুইয়ে দিয়ে আর পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। সীমার হাঁটুটা জবাই করা গাভীর মতো নড়তে লাগল। আমি এক পলক তার দেহের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সারা শরীর তাজা রক্তে ভেসে গিয়ে এক ধরনের খিচুনীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গুলী তার কানের একটু ওপরে লেগে বিরাট গর্তের সৃষ্টি করেছে। আমি মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম সীমার আর আশা নেই। নন্দিনীও একবার মুখ তুলে সীমার অবস্থাটা দেখে চকিতে বোনের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আমি আরো কতক্ষণ চুপচাপ রাস্তার ওপর শুয়ে থেকে কর্তব্য স্থির করলাম। এতক্ষণে সীমার প্রাণপন্দনও স্তব্ধ হয়ে এল। এখন তার শরীরের কোনো অংশই কাঁপছে না। সম্ভবত সীমাদি আর বেঁচে নেই। মেশিনগানের গুলীটা যে আকস্মিকভাবে এবং অতিশয় দুর্ভাগ্যক্রমে তার গায়ে লেগেছে এটা বুঝতে পেরে আমি অত্যন্ত মুষড়ে পড়লাম। আর নিজের বেঁচে থাকতে পারাটাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে রাস্তার ওপর উঠে দাঁড়ালাম। এখন গুলীর শব্দ আর আসছে না। আমি এগিয়ে গিয়ে নন্দিনীকে সীমার দেহের ওপর থেকে সরিয়ে আনার জন্য হাত বাড়ালাম। নন্দিনী দিদিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মূছৰা গেছে। তাকে টেনে তুলতে গিয়ে রক্তে ভেজা সীমার কপালে হাত দিলাম। কপালটা এখনও উষ্ণ। নন্দিনীকে টেনে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সীমার মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতটি হাতে নিয়েই বুঝলাম সীমাদি মারা গেছেন। আমি আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না

করে নন্দিনীকে রাস্তার পাশে ঝোপের ভেতর টেনে আনলাম। আমার টানাটানিতে নন্দিনী হঠাৎ ভয়ার্ত চোখদুটি মেলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল। আমি ডাকলাম, নন্দিনী?

নন্দিনী কোনো জবাব দিল না।

নন্দিনী, একটু কষ্ট করে উঠে দাঁড়াও। সামান্য কয়েক গজ পথ পেরিয়ে গেলেই আমরা নিরাপদ হব। নিজের প্রতি একটু ভরসা রেখে উঠে দাঁড়াও নন্দিনী। মনে হচ্ছে শত্রুরা আনিসের দলটাকে শেষ করে দিয়ে এদিকে এগিয়ে আছে। একটু উঠে বস নন্দিনী।

আমার কথায় এক ঝটকায় নন্দিনী উঠে বলল, দিদি?

দিদি আর পৃথিবীতে নেই নন্দিনী।

আমার কথায় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নন্দিনী সীমাদির মৃতদেহের দিকে তাকাল।

আমিও আর কোথাও যাব না হাদীদা। ওরা আমাকেও মেরে ফেলুক। আপনি চলে যান। আমার জন্য আর বিপদে পড়বেন না। বলেই নন্দিনী রাস্তার ওপর পড়ে থাকা সীমার দেহটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি জানতাম এখন আর এভাবে বসে থাকার উপায় নেই। আমি নন্দিনীর পাশে এসে বসলাম। আমার পেছনে ঝোপের ভেতর থেকে আগের মতোই ঝিঁঝির একটানা শব্দ উঠছে। একটু আগে গুলীর শব্দে ঝোপের ভেতর থেকে এক ধরনের পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে গিয়েছিল। এখন পাখিগুলোর মাঝ থেকে একটা দুটা দলছাড়া হয়ে আবার ফিরে এসে দারুণ চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। গাছের ফাঁক- ফোকর থেকে দুপুরের রোদের টুকরো সীমার স্তব্ধ দেহে ও আমাদের মুখে এসে পড়ল। আমি আবার নন্দিনীকে বোঝাতে চাইলাম, নন্দিনী আমার কথাটা শোনো।

নন্দিনী কান্না থামিয়ে আমার দিকে না ফিরেই চুপ করে থাকল। আমি বললাম, নন্দিনী, আমি কী এখানে তোমাকে এভাবে ফেলে কোথাও যেতে পারি? তোমাকে নিয়েই আমাকে এখান থেকে এগোতে হবে।

আমি যাব না।

বুঝতে চেষ্টা করো নন্দিনী। অবুঝ হয়ো না। আমরা এখন একটা সাংঘাতিক যুদ্ধের মধ্যে আছি। এ যুদ্ধে এখন আমরা মার খেলেও একদিন আমরা জিতবোই। বলল, তখন আজকের এই ঘটনার আমি কী কৈফিয়ৎ দেব? আমরা নিজের বিবেকের কাছেই বা আমার জবাবটা কী হবে?

আমি নন্দিনীর পিঠের ওপর গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দিলাম। নন্দিনী উঠে বসেই প্রশ্ন করল, আমরা কী দিদিকে এভাবে এখানে ফেলেই চলে যাব?

এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই নন্দিনী। আর আমরা যাকে এতক্ষণ দিদি বলেছি, এখন তিনি আর আমাদের সাথে নেই নন্দিনী। তিনি এখন এই জগতের সকল হিংস্রতার ধরা- ছোঁয়ার বাইরে।

আমি নন্দিনীর রক্তে ভেজা চটচটে হাতদুটো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে আনলাম।

আমার দিদি কোনো সৎকারই পাবে না? আমি একথার কোনো জবাব না দিয়ে নন্দিনীকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে লাগলাম। এখন সে একটু কাৎ হয়ে নিজের ভর আমার হাতের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, আমরা আমাদের দেশের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত বোনের কোনো সৎকার না করেই চলে যাচ্ছি। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমাদিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবেন।

হঠাৎ সে আমার গলা থেকে হাত নামিয়ে বলল, চলুন।

আমি কথা না বলে নন্দিনীর পেছনে হাঁটা শুরু করলাম। নন্দিনী মুহূর্তের জন্য একবার মাত্র বোনের উপুড় হয়ে থাকা দেহটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখ চেপে ধরে আবার মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। কিন্তু এবার আমি তাকে দাঁড়াতে না দিয়ে এক রকম ঠেলা মেরেই বললাম, আর কোনো কথা না নন্দিনী ঐ সামনের উঁচু টিলাটিই আগরতলার সীমানা। ওখানে না পৌঁছে আমরা আর বিশ্রাম বা ফিরে তাকাব না। মনে রেখ এটুকু পথ সাবধানে পার হতে না পারার জন্যই সীমাদিকে আমরা হারালাম।

নন্দিনী কোনো কথা না বলে তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার সাথে পা চালিয়ে চলতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পাহাড়টার নিচে চলে এলাম। দিন দুপুরেও জায়গাটা আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। তবে পাহাড়টার গা বেয়ে একটা পায়ে চলার পথ সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে। মুস্কিল হল পথটা লালমাটির ভেজা কাদায় পিচ্ছিল। আমি কোনো মতে পা টিপে উঠতে পারলেও নন্দিনীর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব মনে হল। রাস্তাটির মুখে এসে আমি নন্দিনীর দিকে তাকালাম। কিন্তু নন্দিনী আমার সন্দেহকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা পাহাড়ের পথটা বেয়ে খানিকদূর উঠে গেল। খানিক উঠেই পিচ্ছিল লাল কাদায় পা স্থির রাখতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে হাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। আমি বুঝলাম নন্দিনীর মনের জোর বেড়ে গেছে। দেরি না করে আমিও তার পাশে উঠে এলাম।

একটু পরেই আমরা টিলাটার চূড়ায় উঠে এলাম। নন্দিনী কোনোমতে পাহাড়ের চূড়ার সমতলে পৌঁছেই ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকল। আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। নন্দিনী তার পাশে বসামাত্রই চোখ মেলে একবার আমাকে দেখল, এটা কী ভারতের মাটি?

আমি বললাম, সম্ভবত এ পাহাড়টা ভারতীয় এলাকায়, পাহাড়টার ওপাশে একটা বস্তির মতো দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওটাই বামুটিয়া বাজার। আমরা আগরতলায় এসে গেছি নন্দিনী। আর কোনো ভয় নেই।

আমার আশ্বাসে নন্দিনী মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে শিশুর মতো উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগল। মেয়েরা যেমন মৃত প্রিয়জনের দেহের পাশে লুটিয়ে কাঁদে নন্দিনীর কান্নাটাও সে রকম। সীমাদির দুর্ভাগ্যের বর্ণনা দিয়ে, তার নাম ধরে নন্দিনী বিলাপ করছে। এ ধরনের কান্নার সাথে আমার পরিচয় আছে। আমি নন্দিনীকে থামতে না বলে চুপচাপ বসে রইলাম। আর বিপরীত দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে বস্তি মতন ঘরবাড়িগুলোকে আমি বামুটিয়া বলে ভাবছি সেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষজন আছে কিনা। একবার মনে হল বস্তির ঘরবাড়িগুলো থেকে যেন আবছা মতন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে। আবার মনে হল, না, ধোঁয়া দেখাটা আমার চোখের ভুল। মানুষজন থাকলে কাউকে না কাউকে চলাফেলা করতে দেখতাম।

বেশ কিছুক্ষণ আমরা টিলাটার ওপর বসে থাকলাম। এখন অবশ্য নন্দিনীর কান্না থেমেছে। তবে উদাস দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন দিগন্তের দিকে সে কী যেন দেখছে। হঠাৎ আমার মনে হল আমরা উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। গত দুদিন ধরে আমরা কিছু খাই নি। ঘটনার উত্তেজনায় আমরা যে আমাদের ক্ষুধাপিপাসাও ভুলে গেছি এটা টের পাওয়া মাত্র আমার পেট মোচড় দিতে লাগল। আমি নন্দিনীকে এক রকম জোর করেই ঠেলে দিয়ে বললাম, ওঠো নন্দিনী, চলো নিচের দিকে যাই। আমার খুব ভুখ লেগেছে।

নন্দিনী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো। আমরা নিচের দিকে নামতে লাগলাম।

.

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বস্তিটার কাছে চলে এলাম। দূর থেকে জায়গাটাকে আমি বামুটিয়া বাজার বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু কাছে এসে মনে হল এটা একটা ফাঁড়ি। দূর থেকে মানুষজন আছে কিনা বোঝা না গেলেও এখানে এগিয়ে বুঝলাম আমাদের লক্ষ্য করে পাহাড়ের ফাঁকে গাছের আড়ালে রাইফেল উঁচানো পাহারাদার রয়েছে। আমরা বস্তিটার সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র কোত্থেকে যেন কয়েকজন সেন্ট্রি এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। সবার হাতেই স্টেনগান। সেন্ট্রিদের চেহারা দেখে বুঝলাম এরা স্থানীয় ত্রিপুরা উপজাতির যুবক। এরা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই আমি বললাম, আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। আমরা সামান্য খাবার ও বিশ্রাম চাই।

একজন সেপাই নন্দিনীর কাদামাখা ক্লান্ত দেহের দিতে তাকিয়ে বলল, মনে হয় এই মহিলার ওপর জুলুম হয়েছে?

আমরা একথার কোনো জবাব দিলাম না। নন্দিনী মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেও একটা হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ চেপে ধরল।

অন্য একজন টিপরা সেপাই বলল, আপনারা এখন কোথায় যেতে চান?

আমি বললাম, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের যে কোনো কর্মকর্তার কাছে আমাদের পৌঁছে দিন।

তারা এখান থেকে মাইল পাঁচে দূরে আগরতলায় আছে।

আমি বললাম, সেখানেই যাব। তার আগে আমাদের চারটে খেতে দিন।

আমার কথায় এমন একটা অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল যে সেপাই চারজনই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। এদের মধ্যে একজন বলল, চলুন আমার সাথে ক্যাম্পে। সেখানে আপনাদের নাম ঠিকানা লিখে দিতে হবে। সেখানেই চারটে খেয়ে নেবেন। আগরতলায় আপনাদের কোন পরিচিত লোক আছে?

আমি বললাম, আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিসি যিনি এখানকার জয় বাংলার সেক্রেটারি তিনি আমার ভগ্নিপতি। নাম হোসেন তৌফিক ইমাম। আমরা সেখানেই যাব।

আমার কথায় সেপাই চারজনই সম্ভবত বুঝতে পারল আমরা দুজন গুরুত্বহীন রিফিউজি নই। এদের নেতা যার সাথে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল সে বলল, নাম এন্ট্রি করে আমরা জিপে আপনাদের সেখানে পাঠিয়ে দেব। একটু পরেই আমাদের ক্যাম্পের জিপ আগরতলা যাবে। চলুন।

আমরা সেন্ট্রিদের পেছনে চলতে লাগলাম।

একটু পরেই আমরা ক্যাম্পের প্রবেশ পথে এসে পৌঁছলাম। গেটের পাশে একটা সাদা রং- করা বাঁশের মাথায় ভারতীয় পতাকা উড়ছে। নিশানটা দেখেই কেন জানি না আমার দেহ মন এক সাথে চমকে উঠল। আমি ছবিতেই ইতিপূর্বে অশোকচক্র আঁকা এই তিনরঙা পতাকা দেখেছি। কিংবা হয়তো ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের সামনে দিয়ে যেতে এক আধবার এই হিন্দুস্তানী নিশান দেখে থাকবো। এখন ভারতের মাটিতে হঠাৎ এই পতাকা উড়তে দেখে অজানা আশংকা বা অনভ্যাসের কারণে বুকটা দুলে উঠল। আমি নন্দিনীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে বললাম, নন্দিনী, এরা নাম এন্ট্রির সময় আমাদের পরস্পরের সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলবো?

যা বলতে হয় আমি বলবো।

বুঝলাম সীমান্ত অতিক্রমের ফলে নন্দিনীর মধ্যে নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। নন্দিনীর দৃঢ়তায় আমার খুব ভালো লাগল। আমি হেঁটে যেতে যেতেই তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলাম। সে একবার মাত্র পলকের জন্য আমার মুখের দিকে চোখ তুলে আবার দৃষ্টি নামিয়ে ক্যাম্পের বারান্দায় এসে উঠল। এটা ভারতীয় সীমান্ত প্রহরীদের একটা ছোটো ফাঁড়ি। সর্বমোট চারটে দরজার ঘর। সবগুলো ঘরের বারান্দাই সিমেন্টে বাঁধানো। সেপাইরা যে যার ডিউটিতে ব্যস্ত। কেউ আমাদের আগমনকে তেমন পাত্তাই দিল না। মনে হয় আমাদের মতো আগন্তুক এ ক্যাম্পে প্রায় প্রত্যহই আসা- যাওয়া করে। পাহারাদার সেন্ট্রিদের নেতা, যার হুকুমে আমরা এসে ঢুকেছি সেই লোকটি একটা লম্বা টুল দেখিয়ে আমাকে ও নন্দিনীকে বসতে ইঙ্গিত করল। আমরা বসলাম। লোকটি সম্ভবত সঙ্গের সেপাইদের আমাদের জন্য কিছু খাবারের আয়োজন করতে বলল। সেপাই তিনজনই আমাদের বারান্দায় রেখে সামনের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর এদের নেতা আমার দিকে ফিরে বললেন, সামনে একটা কুয়ো আছে। ইচ্ছে করলে হাত পা ধুয়ে নিতে পারেন। আপনারা তো কাদায় মাখামাখি হয়ে আছেন!

আমি ও নন্দিনী কুয়োর পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। এখানে দুটো বালতিতে পানি তোলাই আছে দেখে আমি একটা মগ এনে নিজেই নন্দিনীর হাত ও পায়ের আঠালো লাল মাটির শুকনো কাদা ভিজিয়ে দিতে লাগলাম। উভয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি সেপাইরা লম্বা টুলের ওপর আমাদের জন্য গরম মোটা রুটি ও কিছু তরকারি রেখে গেছে। টুলের পাশে একজন সেপাই দাঁড়ানো। আমাদের দেখেই বলল, খা'লো।

আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে তার আদেশ পালনে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার কাছে রুটি ও তরকারি অমৃতের মতো মজাদার মনে হল। নন্দিনীও খাচ্ছে, তবে আমার মতো গোগ্রাসে নয়। আমি দ্রুত আমার থালায় রাখা তিনটি পুরো গমের রুটি তরকারিসহ একরকম গিলে খেয়ে ফেললাম। সেপাইরা গ্লাসের বদলে দুটি আলাদা ঘটিতে পানি দিয়েছে। আমি ঢকঢক কর একঘাটি পানিও খেলাম। মনে হল বহুকাল বুঝি এমন সুস্বাদ খাদ্য ও পানীয় আমার ভাগ্যে জোটে নি।

খাওয়া হয়ে গেলে সেপাইরা আমাদের দুজনকেই তাদের সুবেদারের ঘরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক বাঙালি। ঢোকা মাত্রই বললেন, বসুন। আপনারা ঢাকা থেকে এসেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

এখানে আপনাদের আশ্রয় দিতে পারে এমন কোনো পরিচিত কেউ কিংবা আত্মীয়- স্বজন আছে?

আছে। বললাম আমি।

তাদের নাম ঠিকানা জানা থাকলে বলুন।

নাম হোসেন তৌফিক ইমাম। ঠিকানা খুঁজে নিতে হবে। আমার ঠিক জানা নেই।

তিনি কী আপনার বন্ধু?

আমার বোন জামাই।

তিনিও ঢাকা থেকে এসেছেন?

না, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক। সম্ভবত সেখান থেকেই পালিয়ে এসেছেন।

আমার জবাব শুনে সুবেদার ভদ্রলোক তার নাম লেখার রেজিস্ট্রি থেকে মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকালেন।

এবার বলুন আপনার নাম ও পেশা?

সৈয়দ হাদী মীর। লাইব্রেরিয়ান।

সরকারি কর্মচারী?

হ্যাঁ।

বয়েস কত?

বত্রিশ।

আপনারা উভয়ে কী স্বামী স্ত্রী?

আমি জবাব দেবার আগেই নন্দিনী বলল, হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আবার মুখ তুলে আমার ও নন্দিনীর দিকে তাকালেন। সরাসরি নন্দিনীকেই প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম বলুন?

নন্দিনী একটুও দ্বিধা না করে জবাব দিল, নন্দিনী ভট্টাচার্য।

আপনাদের কী কোর্ট মেরেজ?

না, কোর্ট মেরেজ হবে কেন আমাদের আনুষ্ঠানিক সামাজিক বিয়ে হয়েছে।

আপনি ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিয়ে করেছেন?

আমার কোনো ধর্ম ছিল না বলে ধর্মান্তরের প্রয়োজন ছিল না।

নন্দিনী নির্দ্বিধায় মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে। ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমার কৌতূহল দেখে রাগ করবেন না। আজকাল ভারতে অহরহই অসবর্ণ বিয়ে হচ্ছে। পাকিস্তানেও যে জাতপাতের বালাই ছিল না এটা জানতাম না। আমিও ব্রাহ্মণ। বলতে দ্বিধা নেই একজন ব্রাহ্মণ কন্যা মুসলমানকে বিয়ে করেছে শুনলে মুখে থু থু দিতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ শ্লেষটা আমার গায়ে তীরের মতো বিদ্ধ হল। আমি রেগে গিয়ে কী যেন একটা জবাব দিতে চাইলাম। কিন্তু নন্দিনী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চুপ করো।

এ আকস্মিক অযাচিত কথোপকথনের মুহূর্তেও নন্দিনী তার দেমাগ হারায় নি। সে আমাকে তুমি সম্বোধন করে সুবেদারকে নিশ্চিত করল আমরা স্বামী- স্ত্রী। তারপর সুবেদারের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার থুথু দেয়ার ইচ্ছেটা একটু বেশি প্রবল মনে হচ্ছে। অব্রাহ্মণ পুরুষ গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ কন্যার সংখ্যা এই মহাভারতে এত অধিক যে সবার মুখে থুথু দিতে গেলে আপনার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। কতজনকে থুথু দেবেন? আমার দেশে আপনার মতো একজন ধর্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সন্তান পেলে আমি তার গলায়ই মালা দিতাম। পাইনি বলেই এই ম্লেচ্ছের গলায় মালা দিয়েছি। এখন আমার মুখে থুথু না দিয়ে দয়া করে আমরা যেখানে যাবো সেখানে পাঠিয়ে দিন।

নন্দিনী তার কথাগুলো এমন গুছিয়ে বলল যে আমিও চমকে তার দিকে তাকালাম। উদাসীন তীক্ষ্ণ গ্রীবাভঙ্গি উন্নত করে সে সুবেদারের দিকে তাকিয়ে আছে। সুবেদার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শহরে পৌঁছার ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না। আগরতলা এখান থেকে পাঁচ মাইলের পথ। হেঁটে এসেছেন, হেঁটে চলে যান।

আমি ও নন্দিনী কথা না বাড়িয়ে সুবেদারের ঘর থেকে সোজা রাস্তায় এসে উঠলাম। আমি জানি নন্দিনীর হাঁটার ক্ষমতা নেই। রাস্তাটাও জনশূন্য। কিন্তু নন্দিনী কী একটা সাহসের বলে যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, হেঁটেই যাব। তোমার হাঁটতে অসুবিধা না হলে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

আমি নন্দিনীর পেছনে হাঁটা শুরু করেই বললাম, নন্দিনী তুমি আমাকে এখনও তুমি বলছ।

ভালো না লাগলে আপনি বলব।

না না আমি সে কথা বলছি না নন্দিনী। বরং এ ডাকটা আমার খুব আন্তরিক বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হয়ে ডাকা না। এ ডাকা আমার প্রাপ্য বলেই তুমি ডাকছ। লোক চক্ষুকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেও নয়। পরিণাম কী হবে তা আমি জানি না। তবে আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

তুমি তোমার স্ত্রীর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছো।

আমি বুঝলাম নন্দিনী আমার মানসিক অবস্থাটা ঠিকমতো উপলব্ধি করেই কথা বলছে। আমার পক্ষ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে নন্দিনী আবার বলল, তোমার স্ত্রীর সাথে দেখা হলে আমি আবার তোমাকে আপনি বলে ডাকব। যতক্ষণ তার সাথে তোমার সাক্ষাৎ না হবে ততক্ষণ আমি তোমার স্ত্রী। আমার সাথে স্ত্রীর মতোই আচরণ করবে। আমিও স্ত্রীর কাছে প্রাপ্য সবকিছুই তোমাকে দেব। কেন দেব না? আমার আর কী আছে? সতীত্ব কুমারীত্ব কিছুই তো আমার রইল না। এই যুদ্ধে সব লুট হয়ে গেছে। তোমার সামনেই সব ঘটেছে। আমরা কেউ আমাদের ক্ষতির জন্যে দায়ী নই। এই কথা তো তুমিই সীমাদিকে বলেছিলে। আমি আর আমার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করব না। ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হয়ে থাকেন তবে তিনি আমার জন্য মঙ্গলই রাখবেন।

আমি বললাম, নন্দিনী, আমি অত কথা ভাবতে পারছি না। আমার ভয় লাগছে, একথাটাই শুধু বলছিলাম।

আসলে তুমি তোমার বৌয়ের সাথে সাক্ষাতের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছ। ভাবছো দৈবাৎ যদি তোমার বোনের বাসায় গিয়ে দেখতে পাও তোমার স্ত্রীও সেখানে আছে? তবে আমার কী গতি হবে? আমার সম্বন্ধে কী বলবেন। ভয় নেই যা বলতে হয় আমিই বলব। তোমার বৌ সেখানে থাকলে আমিই তাকে বুঝিয়ে বলব তুমি কিভাবে আমাকে বাঁচিয়ে এতদূর নিয়ে এসেছ। তারপর আমি আমার পথ দেখব। কত মেয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেশ ছেড়ে এদিকে আসে নি? তারা তো আর জলে পড়ে যায় নি। তাদের মতো আমিও ঠিকই নিজের অবস্থা করে ফেলব। আমি ভাবছি তোমার বোন ভগ্নিপতি আত্মীয়দের মধ্যে গিয়ে এই মুহূর্তে কী বলব? তুমি বা কী বলবে? যদি তোমার স্ত্রীর অবর্তমানে আমরা একই সাথে থাকতে চাই। বলো তুমি চাও না?

চাই নন্দিনী। সমস্ত অন্তর থেকে চাই। তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে চাই না।

তাহলে তোমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের স্বাভাবিকতাও আমাদের মনে রেখেই এগোতে হবে। অর্থাৎ তোমাকে তোমার প্রিয়জনের কাছে ছেড়ে যাওয়ার বিচ্ছেদ। আমার সম্বন্ধে তখন আর একটুও না ভাবা। রাজি?

পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে নন্দিনী আমার জবাব চাইল। পথে কোনো লোকজন বা যানবাহন নেই। প্রশস্ত পাহাড়ি পথ। চাকার ক্ষতে ভর্তি। দুদিকে ছোটো লাল মাটির পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে তরুণ কাঁঠালের অসংখ্য চারা। বৃষ্টির পানিতে পথ ও চাকার গর্তে পানি জমে আছে। পথও তেমন পিছল নয়। কোনোকালে সম্ভবত পথের ওপর কাঁকর বিছানো ছিল। এখন তা মাটির সাথে মেশামেশি হয়ে যাওয়ায় কাদামাটিতে পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করেছে। পথের একপাশে একটা মাইল পোস্টে লেখা, আগরতলা- ৭ কিঃ মিঃ।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে নন্দিনীর ডান হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলাম। নন্দিনী আমার মুখের দিকে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। একজন কবির জন্য এর চেয়ে বিব্রতকর অবস্থা আর কী হতে পারে? তবে আমিও মিথ্যে বলার বা কোনো কিছু গোপন রাখার পক্ষপাতি নই। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার স্ত্রী অনুপস্থিত জেনেই আমার মন লুব্ধ হয়ে উঠেছে। এ অন্যায়, এ পাপ জেনেও আমার মন বশ মানছে না। কেন মানছে না আমি জানি না। তাছাড়া গত কয়দিন আমার ওপর যা ঘটেছে তাতে তো আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমার পক্ষে আগের নন্দিনী হয়ে যাওয়াও অসম্ভব। আমার অসহায়তার সাক্ষী তুমি। তুমি আমার অবলম্বন, তুমি কবি। তখন ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে পথে ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসতে পারতে। তা তুমি পার নি। আমি নারী বলেই পালিয়ে আসতে পার নি এটা আমি বিশ্বাস করতে পারব না। বরং একজন বিপদগ্রস্ত, অসহায় যুবতীকে পশুর হাতে ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি বলেই নিজের জীবনরক্ষার স্বার্থপরতা তোমাতে ছিল না। আমার জীবনে অতীতে কোনো প্রেমের অভিজ্ঞতা না থাকলেও, আমি বলতে পারি এমন পুরুষকেই মেয়েরা বিশেষ করে কুমারী মেয়েরা প্রেমের জন্য বিনাশর্তে নির্বাচন করে। এমন কী পুরুষটি অন্যের স্বামী হলেও।

আমাকে কী তুমি বিনাশর্তে নির্বাচন করেছ নন্দিনী?

আমার মুঠোয় ধরে থাকা নন্দিনীর হাতটায় চাপ দিয়ে বেশ আবেগকম্পিত গলায় আমি নন্দিনীর স্বীকৃতি পেতে চাইলাম।

বিনাশর্তে অবশ্যি নয়। তোমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত।

আমার স্ত্রীর সাথে দেখা হলে তুমি কী করবে নন্দিনী?

তার আগে বল তুমি কী করবে?

এই প্রথম আমি নন্দিনীর হাসি দেখলাম।

যেন কিছুই ঘটে নি নন্দিনীর হাসির মধ্যে তেমনি একটা ঠোঁটচাপা প্রশ্নবোধক কৌতূহলী হাসির ছটা।

গত তিনদিন তিনরাতের সমস্ত ঘটনা, মৃত্যু, উদ্বেগ ও পলায়নের দৃশ্যগুলো আমার চোখে মুহূর্তের মধ্যে ভাসতে লাগল। এর মধ্যে গভীর দুর্ভাবনার রেখা ছাড়া আমি নন্দিনীর চেহারায় অন্য কোনো আশার চিহ্ন দেখি নি। বর্ডারটা পার হওয়ার পরই নন্দিনী যেন একটা কিশোরীর মতো পাল্টে গেছে। তার দেহমনে একটা নির্ভাবনা খেলা করছে। অথচ বর্ডার পার হয়ে আমি মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হয়েও কেন জানি ভয়শূন্য কিংবা সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না। আমি বললাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমি কী করব।

আমি জানি তুমি কী করবে। নিরপরাধ নির্দোষ মহিলাটির সামনে গেলেই আমার যুক্তিহীন প্রেমের অসারতা তুমি টের পাবে। বেশি ভালো মানুষী করে আমার অসহায়তার কথা বলে তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমাকেও তোমাদের আশ্রয়ে রাখতে চাইবে। তোমার স্ত্রী ও বোন এগিয়ে এসে বলবে, এই বিপদে আপনি কোথায় যাবেন? আমাদের সাথেই থাকুন। একজন বাড়তি মানুষে আমাদের কী অসুবিধা হবে। বরং আপনি থাকলে এদেশে আমাদের উপকারই হবে। এখানকার সামাজিক রীতিনীতিতে আমরা কিছুই জানি না। আপনি আমাদের শিখিয়ে দেবেন যাতে আমরা এদেশের সমাজে মিশতে পারি। আমি শেষ পর্যন্ত থেকে গেলে তুমি হয় তোমার স্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত ভালবাসায় তৃপ্ত হয়ে আমাকে একটা আপদ ভাবতে শুরু করবে কিংবা আমার প্রতি অবৈধ প্রেমের আকর্ষণে স্ত্রীকে অবজ্ঞা করতে গিয়ে সংসারটাই ভেঙে ফেলবে। আমিও তোমার প্রতি অন্যায় ভালবাসা ত্যাগ করতে পারব না। এই ঘটবে।

নন্দিনীর কথাগুলো ভারী পাথরের টুকরোর মত, যেন আমার বুকের ওপর ঝরে পড়ল। আমি নন্দিনীর হাত ছেড়ে দিয়ে পথের দুই দিকে নিরুপায়ের মতো একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। না, আমাদের আশেপাশে দৃশ্য- অদৃশ্য সাহায্যকারী কেউ নেই। শুধু ছোটো পাহাড়গুলোর ওপর থেকে একটা হালকা বৃষ্টির ঝাপটা এসে আমাদের এক পশলা পানিতে ভিজিয়ে দিতে লাগল।

আমি ভাবলাম, নন্দিনী তুমি এতকথাও জানো? আমি কিন্তু তোমাকে একজন কিশোরী বলেই অনুমান করেছিলাম। এখন দেখছি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি আছে তোমার। তুমি একজন বয়স্কা মহিলার মতো কথাবার্তা বলছ। এত ভবিষ্যৎ জ্ঞান কোথায় পেলে? আমার স্ত্রীকে আগরতলা গেলেই পাবো এমন তো নাও হতে পারে। আমি একটি মাত্র অপরিচিত ছেলের

মুখে শুনেছি সে বর্ডার পার হয়ে এসেছে। এটাতো সত্য নাও হতে পারে। সে হয়তো আমাদের দেশের ভিতরেই কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। আগের থেকেই দুর্ভাবনায় থাকা কী উচিত হচ্ছে।

এর মানে হল আমার জন্য তুমি তোমার স্ত্রীর সামনাসামনি হওয়ার চিন্তাটাকেও ভয় পাচ্ছো।

আমি তোমাকে ভালবাসি নন্দিনী।

তাহলে মানো যে আমাদের ভালবাসার আসলে কোনো যুক্তি নেই। আমরা নিজেদের এই মুহূর্তের প্রয়োজনে একটা অসঙ্গত বিষয়কে মেনে নিচ্ছি মাত্র। এই মেনে নেয়া তোমার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের শর্তে শর্তাধীন। তিনি এলে আমাকে আমার অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিতে ইতস্তত করবে না এবং মহিলাকে আমার বিষয়ে কোনোদিন কিছু বলবে না।

আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কোনো কথা দিতে পারবো না নন্দিনী। আমি অদৃষ্টবাদী, ভাগ্যের ওপর ভরসা রেখে বসে থাকব।

আমার কথার কোনো জবাব দেবার আগেই লাল পাহাড়গুলোর ওপর থেকে বৃষ্টির আরেক পশলা ঝাপটা এসে আমাকে ও নন্দিনীকে সম্পূর্ণ জবজবে করে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। পানির স্রোত বইছে দুজনের গায়ে। নন্দিনীর সিক্ত শরীর আব্রু হারিয়ে কাঁপছে। এর মধ্যে একটা গাড়ির শব্দে আমি উৎকর্ণ হয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। আমাদের পেছন দিক থেকে একটা জিপ আসছে। আমি হাত তুলে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। মুহূর্তের মধ্যে জিপটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা লোক জিপের উইন্ডশীল্ডটা হাত দিয়ে মুছে আমাদের দেখেই ইশারায় গাড়িতে উঠতে বলল। গাড়ির কাছে গেলে চালক দ্রুত হাতে দরজা খুলে দিল। খাকি পোশাকপরা একটি টিপরা ড্রাইভার।

আমি বললাম, দয়া করে আমাদের শহরে পৌঁছে দিন। মানবতার খাতিরে।

ভেতরে এসে বসুন।

লোকটা বাংলা জানে।

আমরা জিপে উঠে দেখি সৈনিকদের ময়লা কাপড়ের একটা বড় গাটরি ছাড়া জিপে অন্য কোনো আরোহী নেই। আমি ও নন্দিনী ভেজা শরীরে চাপাচাপি করে ড্রাইভারের পাশের সীটটায় বসলাম। লোকটা একবার আমাদের দেখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, আমাদের সুবেদার শয়তানটার সাথে কেন তর্ক করতে গেলেন? ওটাতো একটা আস্ত হারামির বাচ্চা।

আমরা তো কোনো তর্ক করি নি তিনিই আমাদের যা তা বলে তাড়িয়ে দিলেন। আমার স্বামী মুসলমান এবং আমি হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে মুসলমান স্বামী গ্রহণ করেছি এই অপরাধে আমাকে অপমানের চূড়ান্ত করলেন।

নন্দিনী জবাব দিল। বৃষ্টি আর গাড়ির ঝাঁকুনিতেও লোকটা কথাগুলো বুঝতে পারল বলেই মনে হল। অকস্মাৎ লোকটা গাড়ি কাঁপিয়ে হেসে উঠে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, মুসলমানদের ওপর ঐ বামুনবেটার খুব ঝাল। ওর বোনতো এখানকার এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। ছেলেটি সি. পি. এম করে। এখানকার ইব্রাহিমপুরের দেওয়ানদের ছেলে। খুব উঁচু ঘর। মেয়েটিও ডাক্তার, আমাদের সুবেদার সাহেবের মেজ বোন।

কথাগুলো বলে লোকটা হেসে আমার দিকে ফিরল, আগরতলা জয়বাংলা অফিসে যাবেন?

হ্যাঁ। আমার বোনজামাই এখানকার শরণার্থীর একজন কর্মকর্তা। আমরা জানি না তার বাসা কোথায়? এখন আমাদের অফিসে নামিয়ে দিলেও চলবে। আমরা বাসার ঠিকানা নিয়ে পরে সেখানে যাব।

আমার কথায় ড্রাইভারটি দয়ালু গলায় বলল, এখানকার জয়বাংলার লোকদের সেক্রেটারি মশায়ের বাসা আমি চিনি। প্রায়ই সেখানে আমাদের কর্তাব্যক্তিদের নামাতে যাই। ভদ্রলোকের নাম জানি না, আন্দাজ করি তিনিই আপনার আত্মীয় হবেন। চান তো সেখানেও পৌঁছে দিতে পারি। পরে আমি লন্ড্রিতে কাপড় ধোলাইয়ের জন্য যাব।

আমি বললাম, দয়া করে সেখানেই পৌঁছে দিন।

সেক্রেটারির বাংলার গেটের সামনে যখন জীপটা এসে থামল তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। গেটের দুপাশ থেকে দুজন সশস্ত্র সেন্ট্রি এসে ড্রাইভারকে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভার আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এরা সেক্রেটারি মশায়ের আত্মীয়। আজই বর্ডার পার হয়ে এসেছে। সঙ্গে জেনানা আছে।

একজন সেন্ট্রি গাড়ির ভেতর মুখ বাড়িয়ে নন্দিনীকে দেখল। আমার দিকে ফিরে বলল, আপলোক কাঁহাসে আয়া?

আমি বললাম, ঢাকা সে।

আপ দোনোকা পাস কুছ হাতিয়ার হ্যায়?

জি নেহি।

গাড়ি সে নিকাল আইয়ে।

আমি ও নন্দিনী গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে পাশাপাশি দাঁড়ালে সেন্ট্রি দুজন আপদমস্তক আমাদের পরখ করে বলল, অব অন্দর যা সেকতে। যাইয়ে।

আমরা গেট পার হয়ে ভেতরে রওনা হলাম। বিরাট ফাঁকা জায়গা ও বাগান নিয়ে একতলা সাদাবাড়ি। বেলা তখন কটা বাজে আকাশের মেঘলা মেজাজের জন্য আন্দাজ করা না গেলেও দুপুর যে গড়িয়ে যায় নি তা অনুভব করা যায়। রাস্তার দুপাশে গেঁদাফুলের ঝাড় হলুদ পাপড়ির ভারে নুয়ে আছে। পরিবেশটাকে কোলাহল মুখর এলাকা বলে মনে হল না। বাড়িটাতেও মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবে একটু আগের বৃষ্টির ভেজা ভাবটা ঘাসে, বাগানের ফুলের কেয়ারিতে লেগে আছে। একটা অচেনা, জলসিক্ত আবহাওয়ার গন্ধে পরিবেশটা নিমজ্জিত। আমরা যে বহু কষ্টে, রক্ত, উদ্বেগ, ইজ্জত ও প্রাণহানির বদৌলতে গন্তব্যে এসে পৌঁছেছি সে অনুভূতি একটুও ছিল না। আমরা উভয়েই ধীরে পা ফেলে এগোচ্ছিলাম। তবে নন্দিনীর আগে থেকেই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। এখন তার পা ফেলাকে এমন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছিল, আমি তার হাত ধরলাম, হাঁটতে কী কষ্ট হচ্ছে নন্দিনী?

না তো।

তবে কী এমন ভাবছ?

কিছু ভাবছি না। আমার এই দশার কথা এদের কাছে বলতে হবে বলে লজ্জা পাচ্ছি।

বলেই নন্দিনী ফুঁপিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখান থেকে বাড়িটার বৈঠকখানার দরজার চল্লিশ গজের মধ্যে। নীল পর্দা, দরজা জানালায়, বাতাসে দুলছে।

নন্দিনীর ফোঁপানিতে আমার বোনের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হলেও, আমি নন্দিনীকেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, তোমার অসম্মানের কাহিনী আমরা কেন বলতে যাব নন্দিনী? আমি ছাড়া এ ব্যাপারের আর যারা সাক্ষী ছিল তারা কেউ তোমাকে চেনে না, পরিচয় জানে না। তাছাড়া তারা যে বেঁচে আছে তারই বা প্রমাণ কি? যেখানে হানাদারদের সাথে একটা মুখোমুখি লড়াই হয়েছে তা তো আমরা গুলীর শব্দেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয় আনিসের গ্রুপ ফিরতে পারে নি। তবে কাকে লজ্জা? কে এসব ঘটনার সাক্ষী?

তোমার বৌ বা বোন আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। মেয়েরা বুঝতে পারে। সাক্ষী প্রমাণ লাগবে না।

বুঝুক। আমাদের মুখ থেকে আমরা কিছুই বলব না।

তোমার বোন তো তোমাকে আমার ব্যাপার জিজ্ঞেস করবে। আমি কে, আমাকে কোথায় পেলে ইত্যাদি?

আমার বুকের ভেতর মুখ রেখে প্রকাশ্য দিনের মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে নন্দিনী বলল।

আমরা একবারও কেউ দেখে ফেলার ভয়ে ভীত হলাম না। একবার ভাবলাম না বাড়ির জানালা দিয়ে কেউ আমার বোন বা স্ত্রী আমাকে এ অবস্থায় অর্থাৎ এক মহিলাকে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছি দেখে ফেলতে পারে।

আমি বলব আমি তোমাকে নারায়ণপুর থেকে নিয়ে এসেছি। তোমার বোনও তোমার সঙ্গে ছিল। পথে শত্রুর গুলীতে প্রাণ হারিয়েছে। তুমি আমার, মানে আমাদের সাথেই থাকবে। এতে যদি আমার স্ত্রী বা আত্মীয়রা বিরুপ কিছু ভাবে তবে তুমি আর আমি পথে বেরিয়ে এসে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করব।

আমার কথার আর কোনো জবাব দিল না নন্দিনী। সম্ভবত সে গন্তব্যে পৌঁছে ভেঙে পড়েছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটার জন্য পা বাড়াল। আমি তার হাত মুঠোয় ধরে রেখে বাড়িটার বৈঠকখানার দরজায় এসে দাঁড়ালাম। পর্দাটা দুলছে। আমি নন্দিনীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একহাতে পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাতেই সোফার ওপর বসা আমার ভগ্নিপতির চোখে চোখ পড়ল। তিনি তার পাশে বসা মাথায় সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন লম্বাচওড়া সুপুরুষ ব্যক্তির সাথে ক্লোজ হয়ে কথা বলছিলেন। আমাদের দেখে চীৎকার করে উঠল, আরে ভাইজান কী করে এলেন? আপনাকে আনতে যাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তারা তো কেউ ফেরে নি। বর্ডারের কাছে এক লড়াইয়ে সবাই শহীদ হয়ে গেছে। আমরা তো আপনার কথাই আলোচনা করছি। ঐ দলের সাথেই তো আপনার আসার কথা ছিল। আমরা তো ভাবছি আপনিও হয় মারা পড়েছেন কিংবা ধরা পড়ছেন। ইনি ক্যাপ্টেন খালেদ মোশাররফ, পরিচয় ছিল কি?

খালেদ মোশাররফ উঠে এসে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন, আপনার জন্য আপনার বোন আর বোনজামাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বামুটিয়া স্পটে আমাদের পুরো গ্রুপটাই খতম হয়ে গেছে বলে এক্ষুণি খবর পেয়েছি। তবে পাকিস্তানীদেরও দশ এগারো জন পড়ে গেছে। আমাদের ছেলেগুলো দারুণ সাহসের সাথে লড়েছে।

এদিকে আমার ভগ্নিপতি চেঁচামেচি করে আমার বোনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে অন্দরে চলে গেল। আমি নন্দিনীকে টেনে এনে সোফায় বসিয়ে দিলাম। খালেদ মোশাররফ আমার পাশে এসে বসলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী আনিসের সাথে ছিলেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

ঘটনাটা আপনার কাছে পরে জানব। এখন আপনাদের বিশ্রাম দরকার। কয়েকদিন আগের একটা অপারেশনে আমিও মাথায় জখম পেয়েছি। হাঁটলে মাথা ঘোরায়। আপনার আত্মীয়রা আপনার জন্য খুবই চিন্তিত ছিলেন বলে আমি খোঁজ নিতে এসেছি। আপনাদের খুবই সৌভাগ্য যে ক্রস ফায়ারে পড়ে যান নি।

উগ্বেগমুক্ত আনন্দে ক্যাপ্টেন খালেদ মোশাররফ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমিও তার দৃঢ়চেতা হাতের দিকে হাত এগিয়ে বললাম, আমার এই সঙ্গিনীর বোনের গায়ে গুলী লেগেছিল। মুহূর্তে মুত্যু। পথে লাশ রেখে চলে এসেছি।

বলেন কি?

ক্যাপ্টেন চমকে উঠে নন্দিনীর দিকে তাকালেন।

আপনারা কোথাকার?

এরা ভৈরবের।

নন্দিনী কিছু বলার আগেই আমি জবাব দিলাম।

স্যাড। আপনাদের রিপোর্ট পরে শুনবো। এখন আপনাদের খাওয়া আর বিশ্রাম দরকার।

তার কথা ফুরাবার আগেই আমার বোন পাগলের মতো ছুটে এসে আমার হাত ধরে কান্না শুরু করে দিল, আমি তো ভাবছি আমাদের খবরের কারণেই আপনি আসতে গিয়ে পথে মারা পড়েছেন। ভাবির খবর কি?

জানি না। গত এপ্রিলেই ঢাকা ছেড়ে এসেছে। শুনেছি বর্ডার ক্রস করেছে। এখন কোথায় আছে কী করে বলব।

আমার কথা কেড়ে নিয়ে বোন বলল, এখানে এলে তো আমি জানতাম। সম্ভবত তিনি এদিকে আসেন নি। কতজনের জন্য দুশ্চিন্তা করব। আত্মীয়স্বজন কেউ ঢাকায় নেই। অথচ এখানকার সবগুলো ক্যাম্পই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। আমাদের কাউকে পাই। নি। ভাবি যদি এপ্রিলে ঢাকা ছেড়ে থাকেন তবে ভয়ের কিছু নেই। নিরাপদেই কোনো দিক দিয়ে বর্ডার ক্রস করেছেন। আমরা খোঁজ নেব। আপনি ভেতরে আসুন একে নিয়ে। ইনি কী আমাদের আত্মীয়?

আমি বললাম হ্যাঁ।

নন্দিনী মাথা নুইয়ে সোফায় বসেছিল। আমার জবাবে মুখ তুলে একবার আমার বোনকে এক নজর দেখে দৃষ্টি মাটির দিকে নামিয়ে রাখল। আমার বোন পারুল এগিয়ে গিয়ে নন্দিনীর হাত টানল, ভেতরে চলুন।

নন্দিনী উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, যাও নন্দিনী। আমি ক্যাপ্টেন খালেদের সাথে একটু কথা বলেই ভেতরে আসছি।

পারুল নন্দিনীকে সখীর মতো গলায় জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। আমি খালেদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, আনিসের দলটা যে মারা পড়েছে তা কী ভাবে জানলেন?

আমরা লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা একটু আগে খবর নিয়ে এসেছে। আনিস গুলী খেয়েও অনেকক্ষণ সজ্ঞানে বেঁচেছিল। তার কাছেই আমাদের ইনফরমার পুরো লড়াইটার খবর জেনেছে। ওরা সমানে ভারী মেশিনগানের গুলীতে আনিসের দলকে কাবু করে ফেলে। যেটুকু অবস্টাকল রেখে আনিসরা পাল্টা গুলী চালাচ্ছিল তা হানাদারদের মেশিনগানের সামনে মুহূর্তের মধ্যে উড়ে গিয়ে আনিসদের উদোম করে ফেলে। এ অবস্থায় বাঁচা অসম্ভব। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আনিসরা হামাগুড়ি ছেড়ে অকস্মাৎ গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে উঠে দাঁড়ায়। এবং সামনে ব্রাস মেরে দৌড়ে শত্রুদের দিকে মরিয়া হয়ে এগোতে থাকে। এর ফলে আকস্মিক সুইসাইডাল এ্যাটাকের সামনে পড়ে পাঞ্জাবিরা হঠাৎ নিশানা হারিয়ে হতভম্বের মতো দশ বারোজন জায়গা ছেড়ে একটু পিছাতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে আনিসের গ্রুপ জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। ততক্ষণে অবশিষ্ট পাঞ্জাবিরা পজিশন পেয়েই ব্রাস ফায়ারে আমাদের ছেলেদের গুলীবিদ্ধ করে। খুবই মর্মান্তিক। আনিসের উচিত ছিল, শত্রুর হতভম্ভ হওয়ার সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করে তার গ্রুপকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া। ক্রলিং পজিশনে থাকলে যুদ্ধটা এভাবে হয়তো শেষ হত না। জিততে না পারলেও নিজেদের এতগুলো প্রাণহানি সম্ভবত এড়ানো যেত।

যুদ্ধের অবস্থাটা ক্যাপ্টেন খালেদ মোশাররফের কথায় আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। গত রাত, সকাল এবং দুপুরের সমস্ত ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সবকিছু ভেদ

করে এসে দাঁড়াল সীমাদির গুলীবিদ্ধ কাতর মুখখানি। রক্তের ছিটায় বুক, চিবুক ও কপালটা সিঁদুরের মতো লাল।

দুশ্চিন্তা ও অসহ্য ঘটনাগুলোর পুনরাবর্তনের হাত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে আমি খালেদ মোশাররফকে বললাম, আনিসরা তো আর পেশাদার সৈনিক ছিল না। আপনাদের দক্ষতা এরা কোথায় পাবে? হয়ত সামান্য কয়েকদিনের ট্রেনিংই এদের সম্বল ছিল। পুরোপুরি দক্ষতা না থাকায় হেরে গেল।

খালেদ মোশাররফ হাসলেন, কবি সাহেব, সামনা সামনি যুদ্ধটাও কিন্তু কবিতার আকস্মিক শব্দ পেয়ে যাওয়ার মতোই ব্যাপার। আপনারা যখন লেখেন তখন যেমন জানেন না মিলটা কোন শব্দ দিয়ে ঘটবে। তেমনি প্রকৃত সোলজারও জানে না সাডেন কোন কৌশলে শত্রুরা ধরাশায়ী হবে। শুধু গুলী চালানটা ভালো করে শিখতে পারলেই আত্মরক্ষার কৌশলটাও তার খানিকটা জানা যায়। শত্রুর মুখোমুখি হলে কোনো দক্ষতা বা পূর্ব অভিজ্ঞতার চিত্র সৈনিকদের মনে থাকে না। ফায়ারিংয়ের সামনে দাঁড়ালে অদৃষ্টপূর্ব আত্মরক্ষার অভিজ্ঞতা এসে সৈনিককে সাহায্য করে। যেমন আপনারা না হাতড়েই মিলের উপযুক্ত শব্দটা হঠাৎ পেয়ে যান। যাক, আনিসরা বীরের মতো লড়ে প্রাণ দিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি তো দেখি সাহিত্যের খোঁজ খবরও রাখেন?

না, আমি সাহিত্যিক বা কবি নই। তবে আপনাদের কারো কারো লেখা মাঝে মধ্যে পড়ি। তাছাড়া আমার আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। সেই সুবাদে বাংলাদেশের কবিদের কারো কারো সাথে খানিকটা পরিচিতও। যা হোক, আর কথা নয় আপনি ভেতরে গিয়ে গোসল- খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিন। বেঁচে থাকলে আবার সাক্ষাৎ হবে।

বেঁচে থাকলে মানে?

মানে, আজ রাতেই আবার ভেতরে যাচ্ছি। ফেরার গ্যারান্টি তো নেই। ফিরলে কথা হবে।

খালেদ উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তার হাতটা ধরলাম। মুখের হাসির মতই তার হাতটা উষ্ণ। আমি তার বীরত্বব্যঞ্জক চিবুকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার ভগ্নিপতি পেছন থেকে বলল, চলুন আপনাকে নিয়ে ভেতরে যাই।

আমি উঠে দাঁড়িয়েও খালেদের হাতটা ধরে থাকলাম। খালেদ হেসে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমার ভগ্নিপতিকে সালাম বলে সৈনিককের মতো দীপ্ত পদক্ষেপে ঘরের বাইরে নেমে গেলেন।

আমি ভেতরে গিয়ে দেখি পারুল নন্দিনীকে তার নিজের পাটভাঙা শাড়ি, ব্লাউজ সায়া ইত্যাদি হাতে তুলে দিয়ে গোসলখানায় ঢুকিয়ে দিল। পারুল আমার দিকে ফিরে বলল, ভাই আপনাকে এক কাপ চা এনে দিই?

আমি বললাম, তোমাদের বোধ হয় আর কোনো টয়লেট নেই?

আছে। নোংরা।

তাহলে ততক্ষণে বসে বসে এক কাপ চা- ই খাই।

এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। বলে পারুল ভেতরে চলে গেলে নন্দিনী যে গোসলখানায় ঢুকেছিল আমি সেদিকে তাকালাম। ভেতরে অফুরন্ত পানির শব্দ হচ্ছে। বুঝলাম বেশ কিছুকাল পর নন্দিনী পরিতৃপ্তির সাথে সাবান মেখে গোসল করছে। ভয়ানক ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছিল। এই অসহনীয় ভুখা পেটে পারুলের গরম চায়ের জন্য বসে আছি। পারুল হয়ত আমাদের খাবার ইত্যাদি তাড়াতাড়ি রেঁধে উপস্থিত করার বিলম্বের কথা ভেবেই আমাকে এক কাপ চা দিতে চেয়েছে।

হঠাৎ গোসলখানায় পানির শব্দের সাথে নন্দিনীর ফোঁপানির শব্দ আমার কানে এল। নন্দিনী কাঁদছে। কান্না আর টয়লেটের ঝরণার ঝরঝরানিতে আমি আমার সঙ্গিনীর অসহয়তা, লজ্জা, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর শীর্ণ শরীরের ক্লান্তি ও দ্বিধার দুলুনি এবং কিছুকাল আগে আপন সহোদরা বোনের নির্মম হত্যাকান্ডের পৈশাচিক স্মৃতির কথা চিন্তা করলাম। ভাবলাম বেশ কিছুকাল নন্দিনীর মানসিক ক্ষতগুলো থেকে দুঃস্বপ্ন ঝরতে থাকবে। মনে মনে চিন্তা করলাম, এ অবস্থায় আমি সর্বক্ষণ নন্দিনীর সাথে থাকতে পারবো তো?

এর মধ্যে খালেদ মোশাররফকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে পারুলের জামাই ঘরে এসে ঢুকল।

হাদী ভাই, আপনি শেষ পর্যন্ত, ঢাকা থেকে ঠিকমতো আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন?

আমি জামাইয়ের কথার জবাবে হেসে বললাম, ঠিকমতো এসে পৌঁছতে পারি নি ভাই, অনেক লোকসান দিয়ে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। আপাতত তোমাদের এখানে নিরাপদ। এখন তো আর চোখের সামনে বিভীষিকা দেখছি না।

এখনও আমরা নিরাপদ নই ভাই, এক পরিচিত দুঃশাসন থেকে অপরিচিত আধিপত্যে এসে আত্মসমর্পণ করেছি মাত্র। নিজেকে খুব নিরাপদ ভাববেন না ভাই। আপনি কবি মানুষ, আবেগ দিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত। আমরা কয়দিনে আবেগ বা স্নেহ মমতার সীমা অতিক্রম করে

এসেছি। এখানে চলছে সামরিক প্রশিক্ষণ। প্রতিশোধের মন্ত্র ছাড়া এ লড়াইয়ে জেতার সম্ভাবনা খুবই কম। জাতিগতভাবে ক্রোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখানে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সুযোগ নেই।

কথাগুলো বলতে বলতে আমার ভগ্নিপতি ইমাম আমার পাশে এসে বসল। আমি খাটের ওপর পা তুলে আরাম করে বসলাম। পারুল ধুমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির হল। মনে হল নন্দিনী যেন গত কয়েকদিনের সব রকম দুর্ভাগ্যের আঘাতকে মুছে ফেলে স্নান সেরে এসেছে। তার শরীর থেকে সাবানের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। নন্দিনীর শরীরের সপ্রতিভ শান্ত শ্রী আমার বোন পারুলেরও দৃষ্টিতে পড়ল।

বাহ, এ টাঙ্গাইলটায় আপনাকে তো দারুণ মানিয়েছে।

আমি বললাম, স্নানের পর তোমাকে খুব ভালো লাগছে নন্দিনী।

আমার কথায় নন্দিনীর চেহারা একটু সলজ্জ হল। আড়াচোখে আমার বোনকে একটু দেখে নিয়ে বলল, আপনার আয়নার কাছে নিয়ে চলুন। চুলে জট বেঁধে গেছে।

আসুন।

আমাকে গোসলখানায় ঢোকার ইঙ্গিত করে পারুল নন্দিনীকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

খাওয়ার টেবিলে নন্দিনী খুব উসখুস করতে লাগল। পারুল মাছ ও মাংসের বাটিগুলো বারবার নন্দিনীর দিকে এগিয়ে দিলেও নন্দিনী তেমন কিছুই পাতে তুলল না, আমার বোনকে বলল, আমার শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। আমাকে আর সাধবেন না।

আমার রান্না বোধহয় আপনার রুচছে না। মাছ- মাংস না নিন তো ডাল দিয়ে আরও কয়েক লোকমা মুখে তুলুন। আপনি তো কিছুই খেলেন না।

পারুলের কথায় বোধহয় নন্দিনী লজ্জা পেল।

না না। আপনার রান্নার কোনো তুলনা হয় না। আমরাও যতটা পারি মাছ- মাংস আপনাদের মতই রাঁধি। আমার আসলে শরীরটাই ভালো নেই। মনে হচ্ছে শরীরে একটু আগে বেশি পানি ঢালাটা ঠিক হয় নি। একটু জ্বর বোধ হচ্ছে।

নন্দিনীর কথায় পারুল তার মাথায় বাঁ হাত ছুঁইয়ে চমকে উঠে বলল, হায় আল্লাহ, আপনার তো গা পুড়ে যাচ্ছে। থাক আর খাওয়ার দরকার নেই। চলুন আপনাকে একটা আলাদা কামরায় শুইয়ে দিয়ে আসি।

পারুল উঠে দাঁড়াল। বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে মুখে পানি দিতে দিতে পারুলকে বলল, আমাকে একটু ধরুন।

আমি খাওয়া ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নন্দিনী যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না তা মুহূর্তের মধ্যে আঁচ করতে পেরে এগিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

কি হয়েছে নন্দিনী? তোমার কী খুব খারাপ লাগছে?

পারুল আমার দিকে মুখ তুলে বলল, ভাই এর শরীর খুবই দুর্বল। একে নিয়ে আমার সাথে আসুন।

আমি নন্দিনীকে নিয়ে পারুলের সাথে আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। নন্দিনীর হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে দেখে তার সমস্ত ভর আমার নিজের ওপর রেখে তাকে একটা আলাদা কামরায় খাটের ওপর শুইয়ে দিলাম। পারুল একটা হালকা কম্বল এনে নন্দিনীর শরীর ঢেকে দিল। নন্দিনী চোখ মুদে আছে দেখে আমি পারুলকে বললাম, চল আমরা তোর ঘরে গিয়ে বসি। ও একটু ঘুমিয়ে নিক। জাগলে পরে না হয় একজন ডাক্তারকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করা যাবে।

আমার কথায় পারুল নিঃশব্দে উঠে এল। ঘরের দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে আমরা বাইরে এলে পারুল বলল, ভাই আমার ভয় হচ্ছে। ভদ্রমহিলার অবস্থা খুবই খারাপ।

আমি বললাম, তুই তো বোন জানিস না গত দুদিন যাবত এর ওপর দিয়ে কী দুর্ভাগ্যের ঝড় গেছে। চোখের সামনে এর দিদি গুলীবিদ্ধ হয়ে ছটফট করে মরেছে। এ অবস্থায় মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

ইনি কী হিন্দু?

হ্যাঁ।

আপনি তো বলেছিলেন ইনি আমাদের আত্মীয়?

পারুলের দৃষ্টিতে কৌতূহল। আমি বললাম, হিন্দু বলেই কী আমাদের আত্মীয় হতে পারে না?

আমার কথার কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে পারুল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

এখন যখন আপনি নিরাপদ এলাকায় এসে পৌঁছেছেন, এখন আমাদের সকলেরই উচিত ভাবির একটা খোঁজ খবর নেয়া। বেচারী কী বর্ডার ক্রশ করতে পারল না আবার কোনো বিপদ আপদে পড়ল কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

আমি আর ভাবতে পারছি না পারুল।

আমার গলা থেকে হাল ছেড়ে দেয়ার মতো কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল। পারুল বলল, এই মহিলাকে আপনি কোথায় পেলেন?

রওনা হওয়ার সময় পথে। এরা ভৈরব বাজারের লোক।

একে নিয়ে আপনার বোধহয় একটু মুস্কিল হবে। কারণ আপনাদের জামাইয়ের এ সপ্তাহে আমাদের সকলকে নিয়ে কলকাতায় এ্যাকজাইল গভর্নমেন্টের দপ্তরে যোগ দিতে হবে। কলকাতার আট নম্বর থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ সরকারের দপ্তর। বসেছে। সেখান থেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত হবে। এ অবস্থায় আমরা আপনাকে সেখানেই নিয়ে যেতে চাই। এখন এ মহিলার শারীরিক যে অবস্থা তাতে বোধহয় আগরতলায় এর কোনো আত্মীয়স্বজন থাকলে এখানেই রেখে যেতে হবে। তাছাড়া এই যুদ্ধে সেখানে আপনার মতো লেখকের অনেক কাজ।

বুঝলাম। কিন্তু একে এ অবস্থায় পথে রেখে আমি তোদের সাথে যেতে পারব না পারুল। আমি নন্দিনীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একে পথে নিঃসঙ্গ ফেলে কোথাও যাবো না।

আমার কথায় পারুল গম্ভীর হয়ে বলল, আমি আপনাদের জামাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করব। তবে আমরা যে একটা যুদ্ধের ভেতর আছি, এটাও আপনাকে বিবেচনা করতে হবে।

পারুলের কথার মধ্যে যুক্তি থাকলেও আমার ভালো লাগল না। আমি বললাম, তোদের ওপর কোনো বোঝা চাপাতে আমি চাই না। তেমন পরিস্থিতি হলে তোরা না হয় আমাকে এখানে রেখেই যাবি। জীবনের নিরাপত্তা যখন পেয়েছি তখন আমার জন্য তোদের আর চিন্তা করতে হবে না।

আপনাকে ফেলে যেতে তো আমরা ডেকে আনি নি। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা আপনি সঠিক ভাবে বাংলাদেশের তরুণদের কাছে উপস্থিত করবেন। এই আশা নিয়েই আপনাদের জামাই আপনাকে লোক মারফত চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে। তাছাড়া দেশের ভেতর আপনার মতো প্রতিভাবান লোকদেরই হানাদাররা হত্যা করছে। আর একটি কথা, ভাই আপনার সম্বন্ধে আমার স্বামীর খুব উচ্চ ধারণা। আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন। বলল পারুল।

আমি বললাম, আমি কী একথা জানি না ভেবেছিস?

তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই।

পারুল সরে গেলে আমি নন্দিনীর কামরার দুয়ারে ঝোলোনো পর্দাটা সরালাম। আমার ধারণা ছিল নন্দিনী জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু আমার আন্দাজ ঠিক নয়। নন্দিনী গলা পর্যন্ত কম্বল টেনে রেখে কড়িকাঠের দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে। আমি আস্তে করে ডাকলাম, নন্দিনী।

চমকে গিয়ে নন্দিনী আমার দিকে মুখে ফেরাল।

আমি নন্দিনী, হাদী। একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো। এ বিপদের তোমার শরীরটা ভালো থাকা দরকার।

আমি এগিয়ে গিয়ে খাটের শিথানে নিঃশব্দে বসলাম। হাত বাড়িয়ে তার কপাল ছোঁয়া মাত্রই নন্দিনীর দুচোখের কোণ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। এখন নন্দিনীর গায়ের তাপমাত্রাটা একটু নমনীয় হয়েছে বলে মনে হল। বললাম, তোমার জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে পানি ছেড়ে গোসলটা তোমার সহ্য হয় নি। তুমি ঘুমাও আমি বৈঠকখানার সোফায় গিয়ে একটু গা এলিয়ে দিই।

আমার কথার কোনো জবাব দিল না নন্দিনী। কিন্তু উঠতে গেলে আমার হাত টেনে ধরল। আমি আবার বিছানার ওপর চুপচাপ বসে পড়লাম। এ সময় হঠাৎ আমার ভগ্নিপতি ইমাম এসে ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, ভাই, আপনি নাকি আমাদের সাথে কলকাতা যেতে চাইছেন না? কেন বলুন তো?

আমি বললাম, নন্দিনীকে এ অবস্থায় ফেলে আমি এখন তোমাদের সাথে কীভাবে যাই। আর যাওয়াটাও এখন জরুরি। আমি না হয় কয়েকদিন পর গিয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হব।

না, এখানে একবার থেকে গেলে আপনি আর যাবার সুযোগ করতে পারবেন না। এখানে কোথায় থাকবেন, কী করবেন? কষ্টের সীমা থাকবে না আপনাদের। তাছাড়া আমি আপনাকে লোক পাঠিয়ে এনেছি দেশের ভেতরের অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বাঁচাতে। আমাদের হাতে আরও তো কয়েকদিন সময় আছে। এর মধ্যে আশা করছি ইনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

নন্দিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ইমাম তার কপালে হাত রাখল।

আমি আপনাদের বোঝা হয়ে গেলাম। শরীরটা দুর্বল। তবে জ্বরটা ছেড়ে গেলে আমি যেতে পারব।

বলল নন্দিনী।

ইমাম বলল, এর মধ্যে আপনি সেরে উঠবেন। এই তো আপনার জ্বর এখন তেমন নেই। গাটা একটু গরম। আমরা তো আর হেঁটে বা গাড়িতে যাচ্ছি না। যাবো প্লেনে, আগরতলা থেকে গোহাটি হয়ে কলকাতায়। ইমামের কথায় আশ্বস্ত হয়ে নন্দিনী সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার ইমাম ও পরে আমার দিকে তাকাল।

০৪. যাবার দিন সকালে

যাবার দিন সকালে ভারতীয় এয়ারফোর্সের সামরিক পরিবহণ বিমানে আমরা আগরতলা থেকে গোহাটি এসে নামলাম। এখান থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বিমানে আমাদের কলকাতা যাওয়ার কথা। আসার সময় গাদাগাদি করে এক রকম দাঁড়িয়েই আমরা এখানে এসে পৌঁছাই। সর্বক্ষণ নন্দিনী আমার কাঁধ ধরে ছিল। তার শারীরিক দুর্বলতা এখনও কাটে নি। তবু মানসিক সাহসেই সে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

গোহাটি এয়ারপোর্টে আমরা পারুলদের বাক্স প্যাটরার ওপর বসলাম। বিমান বন্দরে খুব ভিড়। মনে হল সকলেই কলকাতার যাত্রী। আমাদের টিকেট অবশ্য আগরতলা থেকেই ওকে করে দেওয়া ছিল। তবুও ইমাম টিকেট ইত্যাদি নিয়ে কাউন্টারের বিশাল লাইনের মধ্যে দাঁড়াল লাইনের মধ্যে দাঁড়াল। কিন্তু বেশি সময় তাকে কষ্ট করতে হল না। সামরিক পোশাক পরা একজন অফিসার কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে ইমামকে কী যেন বলল। ইমাম তার হাতে আমাদের পাঁচজনের টিকেট ও দরকারি কাগজপত্র তুলে দিলে ভদ্রলোক দ্রুত সেসব নিয়ে কাউন্টারের পেছনের কামরায় গিয়ে ঢুকল।

ইমাম ফিরে এলে আমি তাকে ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করলাম। ইমাম জানাল, আমি যে যাচ্ছি এ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অবহিত আছেন।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিছুক্ষণ পরেই সামরিক পোশাক- পরা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, প্লেন রেডি। আপনারা পেছনে আসুন। মালপত্র টানতে হবে না। ওগুলো আমাদের লোকজন প্লেনে তুলে দেবে। এই নিন আপনাদের টিকেট ও বোর্ডিং কার্ড।

ইমাম টিকেটগুলো নিয়ে পকেটে রাখল। আর বোর্ডিং কার্ডগুলো এক এক করে আমাদের ধরিয়ে দিল।

আমি দেখলাম বোর্ডিং কার্ডের মাঝামাঝি জায়গায় হলুদ রংয়ের এক একটি ক্লিপ স্টেপলার দিয়ে আঁটা। স্লিপের ওপর রবার স্ট্যাম্পের ছাপ এবং ছাপের ওপর কার যেন একটা ইংরেজি স্বাক্ষর। সম্ভবত এটাই আমাদের পরিচিতজ্ঞাপক ছাড়পত্র।

ভদ্রলোকের পেছন পেছন আমরা সিকিউরিটি বেষ্টনী পার হয়ে সর্বশেষ ওয়েটিং রুমে চলে এলাম। এখানকার সবগুলো সোফাই শূন্য। কারণ এখনও যাত্রীদের কেউ প্রবেশাধিকার পায় নি। আমরা এসে কামরার ভেতর দাঁড়াতেই অফিসারটি ইমামের সাথে সেকহ্যান্ড করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, যাত্রা শুভ হোক। আমার নাম অমরনাথ। আমিও একদা ঢাকারই লোক ছিলাম। এনাউন্স হলেই প্লেনে গিয়ে উঠবেন। আপনাদের আর কোনো চেকিং হবে না। আমি এখানকার সিকিউরিটি অফিসার। আপনাদের আসার ব্যাপারে আগেই আমাদের এলার্ট করা আছে। দমদমেও আপনাদের জন্য লোক থাকবে। তারাই যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। আর কোনো অসুবিধে নেই। নমস্কার।

.

আমরাও তাকে হাত তুলে সালাম বললাম। স্মিত হেসে ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলে আমরা সোফার ওপর আরাম করে বসলাম। নন্দিনী আমার পাশে। এখন তার মুখখানা উজ্জ্বল। আমার বোন ও ভাগ্নিটাও খুশি। কলকাতার বিমান আমাদের জন্য রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই উড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কামরাটা যাত্রী নারীপুরুষে ভর্তি হয়ে গেল। কালো মতো মোটা এক ভদ্রলোকে সুটাটাইপরা, হাতে দুটি বিশাল ব্যাগ নিয়ে নন্দিনীর গা ঘেঁষে বসে পড়ল। হ্যান্ড ব্যাগ দুটি একটু অস্বাভাবিকভাবে আমার পায়ের কাছে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আপনারা কী জয়বাংলার লোক?

আমরা ঢাকা থেকে এসেছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিলাম আমি।

আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি।

কোথায় যাবেন?

আপাতত কলকাতায়।

আপনার হ্যান্ডব্যাগগুলো খুব ভারী মনে হচ্ছে। আপনি তো হাঁপাচ্ছেন।

আর বলবেন না ভাই। ব্যবসার কাগজপত্রের বোঝা। পাটের ব্যবসা করি কিনা।

আমি আর কিছু না বলে ইমাম ও পারুলের দিকে তাকালাম। এরা আমাদের সোফা থেকে একটু দূরে এদের বারো বছরের মেয়ে মিতুর নানা কৌতূহলী প্রশ্নে জবাব দিতে ব্যস্ত। মিতু একবার হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, এই যে কবি মামা, একটু পরেই কলকাতা।

মিতুর মুখে আনন্দ উছলে পড়ছে দেখে আমি ও নন্দিনী হাসলাম। নন্দিনীর হাসিটা খুব ভালো লাগল।

একটু পরেই প্লেনে ওঠার ঘোষণা শুনে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ইমাম পারুল ও মিতুকে নিয়ে যাত্রীদের লাইনের ভেতর দাঁড়িয়ে আমার ও নন্দিনীর দিকে হাতের ইশারা করল। আমরা লাইনের দিকে যেতে উদ্যত হলে পাশের সেই ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরে হঠাৎ মিনতি করল, আমাকে একটু সাহায্য করুন, এই ব্যাগটা একটু প্লেন পর্যন্ত পৌঁছে দিন না।

এ অবস্থায় আমি যখন দ্বিধান্বিত নন্দিনী হাত বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে দিন। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আমি কিছু বলার আগেই নন্দিনী ব্যাগটা হাতে তুলে বলল, খুব ভারী তো।

আমি বললাম, দাও আমাকে।

লাগবে না, এসো।

নন্দিনী আমার আগে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। তার পেছনে আরও দুজনের পর আমি ও নারায়নগঞ্জের ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ঠাঁই পেলাম।

যাত্রীরা লাইন বেঁধে হেঁটেই বিমানের সিঁড়ির কাছে বিশাল লাইনে থেকে চেকিং করিয়ে বিমানে উঠছে। এদিকে একজন চেকিং অফিসার নন্দিনী পর্যন্ত ওপরে উঠতে অনুমতি দিয়ে বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে লাইনটাকে থামাল। নন্দিনী তর তর ওপরে উঠে গেলে ভদ্রলোক আমার বোর্ডি কার্ডের হলুদ শ্লিপটা নেড়ে চেড়ে দেখল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাতের ওয়াকিটকিতে কী যেন কথা বেজে উঠতেই সে আমার পেছনের ব্যবসায়ীটির দিকে ফিরে বলল, আপ লাইনসে নিকাল আইয়েজি।

বলেই ভদ্রলোক আমার বোর্ডিং কার্ডটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আপ যাইয়ে, জলদি।

আমি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এলাম। যাত্রীরা এখনও সবাই সঠিক সীট খোঁজাখুজি করছে। আমি উন্মুখ হয়ে নন্দিনীকে খুঁজতে গেলে দেখলাম সে প্লেনের সম্মুখভাগে একটি জানালার পাশে বসে হাতের ইঙ্গিতে আমাকে ডাকছে।

আমি সামনের দিকে এগোতে গিয়ে দূরেই পারুলদের দেখলাম। কিন্তু একবার পেছন ফিরেও দেখলাম না ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি এখনও ভেতর আসতে পারল কিনা। নন্দিনীর পাশের সীটে বসেই বললাম হ্যান্ড ব্যাগওয়ালা লোকটাকে সিঁড়ির কাছে আটকে দিয়েছে।

বলো কী, এখন কী হবে?

এক্ষুণি হয়ত ছেড়ে দেবে।

আমার কথায় নন্দিনী জানালার দিকে মুখ ফেরাল।

সর্বনাশ লোকটাকে তো পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এখন কী হবে?

তার কথায় আমিও নিচের দিকে দেখার চেষ্টা করলাম। দুজন পুলিশ লোকটাকে তার অবশিষ্ট হ্যান্ডব্যাগসহ ঠেলতে ঠেলতে ওয়েটিং লাউঞ্জের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা নিরুপায়ের মতো পরস্পরের দিকে তাকালাম। নন্দিনী ধরা গলায় ফিসফিস করে আমাকে বলল, ভগবান জানেন এ ব্যাগটায় কী আছে?

নন্দিনী পায়ের কাছে সীটের ফাঁকে ব্যাগটা খাড়া করে রাখা। আমি বললাম, চুপ করে থাক। যাই থাক ব্যাগটা এখন তোমার আমার কাছে। এর ভেতরকার সবকিছুর জন্য দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তাবে। আর এ নিয়ে কথা বলো না।

নন্দিনী একদম চুপ হয়ে গেল। তার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। আমি বললাম, একটুতেই ভয় পাও কেন?

একটু পরেই বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি নন্দিনীর সীট বেলট বেঁধে দিয়ে নিজেরটা বাঁধলাম। একজন এয়ারহোস্টেস আমাদের পাশের গলিপথ দিয়ে আমাদের দিকে আড়চোখে দেখতে দেখতে হেঁটে চলে গেলে বিমানেরও রানওয়ের ওপর দিয়ে চলা শুরু হল।

একটু পরেই বিমানটি মেঘলা আকাশের ভেতর ঢুকে পড়লে আমি ও নন্দিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নন্দিনী অনুচ্চ স্বরে আমাকে বলে, হ্যান্ডব্যাগটা ওপরে তুলে রাখলে হয় না?

এত বড় ব্যাগ ওঠাতে গেলে এয়ার হোস্টেসরা আপত্তি করবে। আর তাছাড়া এখন এটা নাড়াচাড়া করতে গেলে সকলের চোখে পড়বে। পায়ের নিচে আছে, ওখানেই থাক।

নন্দিনীর কানে কানে বললাম।

আমার সতর্কতায় নন্দিনী মনে হয় একটু ঘাবড়ে গেল, হা ঈশ্বর, এর মধ্যে বোমা না থাকলেই হল।

নন্দিনীর কথায় আমিও একটু ভয় পেলাম। কিন্তু কথা না বলে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে আকাশের নীলের ওপর জমে থাকা পুঞ্জিভূত মেঘের বিশ্রাম দেখতে লাগলাম। আমাকে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে নন্দিনী বলল, নিচে হিমালয়?

না। হিমালয় সম্ভবত আরও উত্তরে। আমরা মনে হয় হিমালয়ের দক্ষিণের সমতলের ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

নন্দিনী বেশীক্ষণ বিমানের বাইরে প্রাকৃতিক শোভার দিকে দৃষ্টি রাখতে পারছে না। তার মন হ্যান্ডব্যাগটার ভিতরে কী আছে, এ নিয়ে উসখুস করছে। আমরা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

লাগারই কথা। অপরিচিত ঐ লোকটার আব্দার না রাখলেই হত।

আমি পারি না।

এখন তো মনে হয় এর চেয়েও কঠিন কাজ পারতে হবে।

কী কঠিন কাজ?

চকিত হয়ে নন্দিনী আমার হাত চেপে ধরল। ঠিক ঐ সময় একজন বিমানবালা একটি ট্রেতে করে জেলি মাখানো বিস্কুট আর কফি নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল, টি অর কফি?

আমরা দুজন এক সাথেই বলে উঠলাম, টি।

মহিলাটি সীটের সাথে সংযুক্ত টেবিল ঠেলে দিয়ে চা ঢেলে দিতে দিতে বলল, আর কোনো অসুবিধা?

সম্ভবত নন্দিনীর চেহারায় একটা ভয় চকিত উৎকণ্ঠার আভাস পেয়ে এই প্রশ্ন। মেয়েটি তবে বাঙালি। আমি বললাম, না কোনো অসুবিধা নেই।

আমার জবাব শুনে ভদ্রমহিলা কিন্তু নিরাশ হল না। বরং গলা বাড়িয়ে আমরা যে ব্যাগটা লুকোতে ব্যস্ত সেটার দিকে তাকাল এবং পর মুহূর্তেই নন্দিনীর পায়ের তলা থেকে ব্যাগটা মুহূর্তের মধ্যে নন্দিনীর দিকে টেনে এনে বলল, ব্যাগটা সামনের ফাঁকা জায়গায় রেখে দিচ্ছি। নামার সময় স্মরণ করে নিয়ে যাবেন।

মহিলা ব্যাগ নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের সারিগুলা পেরিয়ে একেবারে সামনের ফাঁকা জায়গায় ডান দিকে রেখে পেছন ফিরে নন্দিনীকে ইশারায় জানিয়ে দিয়ে সামনের পর্দার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নন্দিনী বলল, নামার সময় ঐটা এখানেই ফেলে গেলে কী হয়?

আমি বললাম, তোমার প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

কিন্তু লোকটা যদি পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের পেয়ে আমাদের খুঁজে বের করে তার গচ্ছিত ব্যাগটা ফেরত চায়?

এ কথার আমার কাছে কোনো জবাব নেই।

এমনও তো হতে পারে ব্যাগের মধ্যে ভদ্রলোকের দরকারি কাগজপত্রই আছে খারাপ কিছু নেই।

আমি হাসলাম, এ নিয়ে আর অস্বস্তির মধ্যে থেকে লাভ নেই নন্দিনী। আমরা ব্যাগটা নিয়েই বরং নেমে যাব। কপালে যা থাক।

দমদমে আমাদের কোনো অসুবিধেই হল না। এখানেও আমাদের জন্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সন্দেহজনক ব্যাগটা নিয়েই নামলাম। আমাদের মালপত্র, বাক্স প্যাটরার ওপর কোনো চেকিংই হল না। বরং সবকিছু অতিসাবধানে একটা মাইক্রোবাসে তুলে দেয়া হল। পূর্বের ব্যবস্থা মতো আমরা এসে উডস্ট্রীটের একটা হোটেলে উঠলাম। খুব বড় হোটেল না হলেও আধুনিক সমস্ত আরাম আয়েসের ব্যবস্থা আছে। মোট তিনটি কামরা আমরা পেলাম। মিতু ও নন্দিনীর জন্য একটি দুই সীটের কামরা,

পারুলরাও দুজন দুসীটের একটি কামরা নিল। আর আমার জন্য পেলাম সিঙ্গেল সীটের একটি ছোট কামরা। ইমাম দম্পত্তির সমস্ত লটবহর আমার কামরায় রাখা হল।

হোটেলে ওঠার সময় ইমাম আমাকে জানিয়েছিল, এখানে আমাদের এক সপ্তাহ থাকতে হতে পারে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের এ্যাকজাইল গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থায় আমরা অন্যত্র উঠে যাব।

সন্ধ্যায় আমি যখন আমার কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, দেখলাম অন্যান্য মালামালের সাথে হ্যান্ড ব্যাগটাও এঘরেই আছে। ব্যাগটার দুপ্রান্তে দুটো ছোট চাইনিজ তালা। কৌতূহল আমাকে আর খাটে শুয়ে থাকতে দিল না। আমি উঠে ভারী ব্যাগটাকে বিশাল বিশাল বাক্স প্যাটরার স্তূপ থেকে টেনে বের করে আমার বিছানার ওপর রাখলাম। তালাগুলোতে হাত বুলিয়ে বুঝলাম তেমন মজবুত না হলেও মুচড়ে খোলা যাবে না। তালা দুটো আদৌ খোলা উচিত হবে কিনা, আমি যখন এসব ভাবছিলাম তখন মিতু এসে দরজায় বেল টিপল।

মামা, আব্বা- আম্মা চা নিয়ে বসে আছে।

আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম।

মিতু হেসে বলল, চায়ের পর নিউমার্কেট।

নিউমার্কেট?

আপনার আর নন্দিনী খালাম্মার জন্য কাপড়জামা কিনতে আব্বা- আম্মা এখনই বাজারে যাবেন। আপনাদের তো আর বাড়তি কাপড়ই নেই। আপনাদের সাথে আমিও যাব।

খুশিতে মিতু হাসতে লাগল। হঠাৎ আমার খাটের ওপর চোখ পড়ায় বলল, ও মামা এই ব্যাগ পেলেন কোথায়?

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, এটা তোমার নন্দিনী খালার। কোনো রকমে নিয়ে এসেছে। এরও আবার চাবি হারিয়ে গেছে কিনা, খোলা যাচ্ছে না।

ভেঙে ফেলুন না।

না খুলতে পারলে তো ভাঙতেই হবে।

দাঁড়ান আমাদের ব্যাগের চাবিগুলো এনে দিই। মিতু তাদের চাবি আনতে যেতে উদ্যত হলে আমি বললাম, দাঁড়াও মিতু। আগে তো চা নাস্তা খেয়ে নিই পরে না হয় তোমাদের চাবিগুলো নিয়ে খোলার চেষ্টা করব। তোমার আব্বা- আম্মার ঘরে যাই।

মিতুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমি আমার কামরার দরজা ভেজিয়ে বাইরে এলাম। মিতু আমাকে হাত ধরে নিয়ে বলল, মামা আপনি কী এর আগেও কলকাতায় এসেছেন?

অনেকদিন আগে দুতিন বার এসেছি বৈকি।

হগ সাহেবের মার্কেট দেখেছেন?

তাও দেখেছি।

ঢাকার নিউ মার্কেটের চেয়েও সুন্দর?

সুন্দর কিনা জানি না তবে অনেক বড়, অনেক দোকানপাট।

আমার কথায় কিশোরীসুলভ আনন্দে মিতু এক রকম নেচে উঠল, একটু পরেই যাচ্ছি।

আমরা এসে পারুলদের কামরায় ঢুকলাম। মিতুর আনন্দের হাসিমুখ দেখে পারুল বলল, কী ব্যাপার, মামাভাগ্নির মনে হচ্ছে কলকাতায় এসে খুশির সীমা নেই।

আমি বললাম, মিতু মা সাথে থাকলে মনে হয় কলকাতায় আমাদের খুব একটা খারাপ যাবে না।

ওতো এখনও ঢাকাতেই আছে।

পারুল গম্ভীর হয়ে একবার মিতুর দিকে মুহূর্তমাত্র তাকাল। মিতু ততক্ষণে চুপসে গেছে। আমি বললাম, ওকে আর আমাদের দুঃখে, যুদ্ধের কথায় কিংবা পরিণাম চিন্তায় হাসিটা ভুলিয়ে দিয়ে লাভ কী? থাকুক ও খুশিবাসি।

না ভাই, মেয়ে আমার যত ছোটোই হোক, আমরা যে পরিস্থিতিতে নিজেদের দেশ ও ঘরবাড়ি ছেলে এলাম সে ব্যাপারে তার সচেতন থাকতে হবে।

আমি বললাম, এটা জরুরি হতে পারে পারুল, তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান এবং আমাদের মুক্তি যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি বোঝার মতো বয়েস মিতুর এখনও হয় নি। ওকে খুশি থাকতে দাও।

আমার কথা ফুরোবার আগেই নন্দিনী এসে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ইমাম ডাকল, আসুন চা খাবেন। চা খেয়ে চলুন একটু বাজার থেকে ঘুরে আসি। আপনারা তো দুজনই এক কাপড়ে ভারতে ঢুকেছেন। আপনাদের জন্যে এখন ঢাকার মতো নিউ মার্কেট থেকে সস্তা কয়েকটা কাপড় কিনব।

আমার জন্যে দুটোর বেশি শাড়ি লাগবে না। কম দামের ছাপার কাপড় হলেই চলবে।

জবাব দিল নন্দিনী।

পারুল বলল, আপনার জন্য এত চিন্তা করছি না। আপনার পরার মতো সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি ইত্যাদি আমার সুটকেসে যথেষ্ট আছে। অসুবিধা হচ্ছে কবি ভাইয়ের। মিতুর আব্বার জামা তার গায়ে লাগবে না। কবি ভাইয়ের জন্য কয়েকটা শার্ট প্যান্ট আর লুঙ্গি হলেই আপাতত চলে যাবে।

আমি কোনো আপত্তি না করে সাইড টেবিল থেকে জ্যাম লাগানো একজোড়া বিস্কুট তুলে নিলাম। পারুল চা ঢেলে দিলে নন্দিনী আমাকে ও ইমামকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ইমাম বলল, আপনিও চলুন। দেখে শুনে দরকারি আরও কিছু জিনিষপত্র কেনা যাবে।

নন্দিনী বলল, পারুল দিদি যখন যাচ্ছেন আমার আর যেতে হবে না। তাছাড়া বাজার করার মতো শারীরিক অবস্থা আমার নেই। শরীরটা খুবই দুর্বল। আমি একটু শুয়ে থাকব। আপনারা কিছু মনে করবেন না তো?

এ- কথার ওপর আর কথা চলে না। আমি বুঝলাম নন্দিনী কেন যেতে চাইছে না। একেতো তার শরীরটা এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি। তার ওপর বাড়তি বোঝার মতো হ্যান্ডব্যাগটা তার মনে চেপে বসেছে। আমি বললাম, ঠিক আছে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার কামরায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। এত মালামাল যখন রয়েছে তখন হোটেলেওতো কারো থাকা দরকার।

আমার কথায় পারুলও সায় দিল। দিদির যখন যেতে ইচ্ছে করছে না তখন উনি বরং এখানেই থাকুন।

পারুলের কথায় আমি চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। আমি তা হলে একটু তৈরি হয়ে আসি।

আমি আমার কামরায় এসে ঢাকামাত্র নন্দিনীও আমার পেছনে কামরায় এসে ঢুকল।

আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি জানি।

তোমরা চলে গেলে ব্যাগটা একটু দেখব?

কি করে দেখবে, তালা আছে না?

হোটেলের দারোয়ান ডেকে যাহোক একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। আমি ঠিক পারব।

কৌতূহল আর আত্মবিশ্বাসে ভরা গলা নন্দিনীর। আমি বললাম, যাই করো দারোয়ান টারোয়ানের সামনে ব্যাগটা খুলো না। কে জানে এর মধ্যে কী আছে?

কেন, মানুষের কাটা মাথা বেরিয়ে পড়বে নাকি?

হেসে একথা বললেও আমি বুঝলাম নন্দিনীর ভেতর দারুণ ভয়ের তোলপাড় চলছে। সন্দেহের দোলা থেকে নন্দিনীকে রেহাই দেয়ার জন্য আমি হেসে বললাম, শেষপর্যন্ত দেখো এর ভেতর থেকে পাট ব্যবসায়ের নথিপত্র ছাড়া আর কিছুই বেরুবে না। লোকটাকে আমরা অযথাই মিথ্যেবাদী ভাবছি কেন। লোকটাকে হয়ত অন্য কোনো কারণে সন্দেহবশত গোহাটির পুলিশ আটক করেছে। ছাড়া পেয়ে একদিন এসে তার মূল্যবান কাগজপত্রের ব্যাগটা হয়ত আমাদের কাছে দাবি করবে।

আমাদের পাবে কোথায়?

ঠিকই পেয়ে যাবে। যদি সত্যি এতে কোনো মূল্যবান কিছু থেকে থাকে।

নন্দিনীকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম আমি।

তুমি বলছ ব্যাগটা খোলা আমাদের অনুচিত হবে?

আরে না, তা কেন বলব। মালিকহীন বোঝায় প্রকৃত বিষয় কী আছে অবশ্যই আমাদের পরখ করে দেখতে হবে। বোঝাটা যখন আমরা বইছি তখন অবশ্যই বোঝার ভেতরটা একবার দেখা দরকার। এখন আসল প্রশ্ন হল তালা খুলবে কীভাবে?

আমি ঠিক খুলতে পারব। কেউ যখন থাকবে না তখন আর চিন্তা কি। তোমার বোনের গাট্টি বোচকায় নিশ্চয়ই তালা খোলার মতো জিনিসপত্র আছে। দেখো, ঠিক আমি খুঁজে বের করব।

অদম্য কৌতূহল আর সাহসী গলা নন্দিনীর।

আমি বললাম, আল্লাহ তোমার সহায়ক হোন। আমি তাহলে বাজার থেকে ঘুরে আসি।

০৫. মার্কেট থেকে ফিরে এসে

মার্কেট থেকে ফিরে এসে দেখি সিঁড়িতে ভিড়। ওপর তলার বাসিন্দারা ঠিক সাড়ে আটটায় ডাইনিং হলের দিকে যাচ্ছে। সকলেই বিদেশী এবং সাদা চামড়া। নেটিভ যে দুএকজন নামছেন তারাও অবাঙালি। কেউ কেউ আমাদের নতুন আগন্তুক ভেবে গুড নাইট বলে সৌজন্যও দেখাচ্ছেন। ইমামও সৌজন্য বিনিময় করে আমাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে এল। তেতলায় আমাদের ঘরগুলো। বারান্দায় পৌঁছে দেখি আমাদের ঘরগুলো যথারীতি বন্ধ। বাজার থেকে সদ্য আনা প্যাকেটগুলো সবই পারুল বগলদাবা করে গাড়ি থেকে নামিয়েছে। আমি সাহায্য করতে চাইলে ও না করল। বলল, পারব। আপনি ওপরে যান আমি আপনাদের পেছনেই থাকছি। ইমাম তালা খুলে দিলে পারুল ও মিতুসহ ইমাম তাদের ঘরে ঢুকল। আমি আমার কামরায় ঢুকে দেখি ঘরে বাতি জ্বলছে। আলোর মধ্যে স্যুটকেস ও মালামালগুলোর ওপর চোখ পড়ল। সবি আছে, নেই শুধু সেই হ্যান্ডব্যাগটা। আমি দ্রুত দরজা খোলা রেখেই এলাম। মিতু ও নন্দিনীর ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ। নন্দিনী হয়তো এঘরে ব্যাগটা এনে খোলার জন্য ধস্তাধস্তি করছে। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই দেখে আমি কলিং বেলটা টিপলাম। দেরি করেই নন্দিনী খুলে দিল, তোমরা এসেছ?

এইমাত্র এলাম। এরা সব এদের ঘরে গেছে। ভেতরে যাবো?

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে নন্দিনী দুয়ার থেকে পিছিয়ে গিয়ে আমাকে তাদের কামরায় ঢুকবার পথ ছেড়ে দিল। আমি ভেতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের ব্যাগটা?

আছে। এঘরের খাটের নিচে।

খুলতে পেরেছিলে?

কেন পারব না? তোমার বোনের একটা ঝোলা থেকে বিশাল কাঁচি পেয়ে তালাগুলো খুলেছি।

কি পেলে?

আমি অতি উৎসাহে উৎসুক হয়ে নন্দিনীর মুখের কাছে নুয়ে পড়লাম।

ভয়াবহ কিছু নয়। বই আর কিছু মূল্যবান কাগজপত্র।

হেসে বলল নন্দিনী।

আমি বললাম, আমি তো আগেই বলেছিলাম লোকটা মিথ্যে বলে নি। আসলে কেন যে ওকে গোহাটিতে প্লেনে উঠতে দিল না সিকিউরিটি গার্ডরা আল্লাহ মালুম। চলো পারুলদের নিয়ে ডাইনিং হলে যাই। মার্কেট ঘুরে খিদে পেয়েছে।

নন্দিনী বলল, তুমি যাও, আমি এক্ষুণি আসছি। হাতমুখ একটু পানি ছিটা দিয়ে আসি। তার কথা শেষ হবার আগেই মিতুর আব্বা- আম্মা ও মিতু এসে এ কামরায় ঢুকল। পারুল বলল, আপা একা একা ভয় পান নি তো?

ভয়ের তো কিছু দেখি নি, শুধু শুধু ভয় পাব কেন? আমি বিছানায় শুয়ে আজকের ইংরেজি খবরের কাগজ দেখছিলাম। আপনারা বোধহয় আমার জন্যই একটু তাড়াতাড়ি বাজার শেষ করলেন। আসুন।

নন্দিনীর কথায় পারুল বলল, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। আপনাকে একা ফেলে গিয়ে একটু চিন্তিতই ছিলাম। অচেনা হোটেল। আবার না কেউ এসে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করে। আপনিও তো একেবারেই এ শহরে নতুন। নাকি আগেও এসেছেন?

এক্কেবারেই নতুন না এলেও, কলকাতা শহরের সাহেবপাড়ায় একবারও আসি নি। যদিও ছোটোবেলায় এশহরেই দিদির সাথে দুবার এসেছি। ভবানীপুরে আমার পিসিদের বাসা ছিল। এখন এরা কোথায় থাকেন জানি না। ভবানীপুরের স্মৃতি এখনও খানিকটা মনে আছে। ফ্রক ছেড়ে তখনও শাড়ি ধরি নি।

বলল নন্দিনী।

শাড়ির কথায় পারুল হাতের প্যাকেট দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার শাড়িজোড়া। দুটোই কিন্তু অল্পদামে কেনা।

খুব ভালো হয়েছে।

প্যাকেট না খুলেই ভালো বলছেন? খুলেই দেখুন না।

দেখতে হবে না। আপনার শাড়ি পরাইতো আছে। আপনার রুচি কেমন বুঝতে পারি। দিন রেখে দিচ্ছি, পরে পরব।

পারুলের হাত থেকে শাড়ির প্যাকেট নিয়ে নন্দিনী তার বিছানায় রাখল।

পারুল আমার দিকে ফিরে বলল, কবি ভাই চলুন রাতের খাওয়া নিচে থেকে সেরে আসি। আপনার কাপড় জামার প্যাকেটগুলো আমাদের কামরা থেকে নিয়ে নেবেন।

আমি বললাম, চল খেয়ে আসি।

.

খাওয়ার পর আমি সোজা ওপরে এসে আমার কামরায় বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। উডস্ট্রীটে গাড়ি চলাচলের আওয়াজ তেমন না থাকলেও অদূরে পার্কস্ট্রীট এলাকা, চৌরঙ্গীর আশপাশ এলাকা এবং রাস্তা থেকে গাড়ির শব্দ পাচ্ছি। বহুদিন পর কলকাতায় এসেছি। আজ নিউ মার্কেটে গিয়ে এল. রহমানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কত কথা মনে পড়ল। মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি এ দোকান থেকেই দেশ বিভাগের আগে আমাদের বাড়ির সকলের ঈদের জামা- কাপড় কেনা হত। দোকানটা নাকি ছিল আমার এক দাদার। দেশ বিভাগের পর হাতবদল হয়ে যায়।

যখনই কলকাতায় আসি নিউ মার্কেটে কেনাকাটার দরকার হলে আমি এল. রহমানে আসি। একবার নিজের পরিচয় দেওয়াতে এক মাড়ওয়াড়ি ভদ্রলোক খুব খাতির যত্ন করেছিলেন। বলেছিলেন, হামার ক্যায়সা খুব নসীব, আপ আব্দুল ওহাব মীরকা ওয়ালিদ, চায়ে পিজিয়ে।

সেবার কাপড়ের দাম অর্ধেক কমিয়ে রেখেছিল। আজ অবশ্য ঐসব লোককে দেখি নি। তবে আজও কাপড়চোপড় কেনার ব্যাপারে আমরা খাতির পেলাম। খাতিরটা জয়বাংলার লোক বলে।

ঘুম পাচ্ছিল না। বিছানা থেকে উঠে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে পশ্চিম দিকের জানালার পর্দা সরিয়ে দিলাম। বাইরে দেখা যায় উডস্ট্রীটের সাথে অন্য একটা ছোটো রাস্তার সংযোগস্থল। কারো বাড়ির বাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাউগাছের ওপর ভাঙা চাঁদ। আমি জানালার কাঁচের পাল্লা দুটো না খুলেই রাতের কলকাতার একটা দৃশ্য দেখছি। আর মনে মনে ভাবছি হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে নন্দিনীর মানসিক উদ্বেগটা এখন নিশ্চয়ই হালকা হয়েছে। নন্দিনী কী এখন ঘুমিয়ে পড়েছে? কলকাতায়

আসার পর নন্দিনীর মানসিক বল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমি উপলব্ধি করছিলাম। আজি অবশ্য তার মুখে একটা নতুন কথাও শুনলাম! কথাটা, এর আগেও নন্দিনীরা তাদের কৈশোরে আমার মতই কলকাতায় এসেছে। এ শহর তার কাছেও একেবারেই অপরিচিত শহর নয়। তাছাড়া এ শহরে নন্দিনীর পিসি বা ফুপুর মতো নিকটাত্মীয়রাও বাস করেন। নন্দিনী কী তার আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ করবে না? কেন করবে না? নিশ্চয়ই করবে। শুধু আমি ও আমি যাদের সঙ্গে এসেছি অর্থাৎ আমার বোনের পরিবারই এখানে শিকড়হীন। আপন বলতে এখানে আমাদের কেউ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার কর্তব্য হল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়াই করা। আর লেখক হিসেবে আমার যুদ্ধের ধরনটা একটু আলাদা হবেই। এখন আমিও সর্বাত্মক হিংস্রতাকেই জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত নই। কিন্তু দেশত্যাগ করে এ আমি কোথায় এসেছি? আমার মনে কেন কবিতার একটি স্ফুলিঙ্গও জ্বলছে না? ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা কী শেষ পর্যন্ত অর্জিত হবে? নাকি আমরা তপ্ত কড়াই থেকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি?

আবার মনে হল আমরা একটা সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত। এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ চিন্তা প্রকৃত মুক্তিযোদ্বার কোনো কাজে লাগে না। প্রবলের সংহার- যজ্ঞে নিরুপায়ের সহায় হল অন্য শত্রুর সহানুভূতি জাগিযে তুলতে পারা। আগামীকাল সকালেই আমাকে যেতে হবে। সেইসব সংবাদপত্রের অফিসে যেখানে আমার পরিচিত লেখক ও কবিরা আছেন। যেখানে আমার পরিচয় দিলে একেবারে অবহেলায় উড়িয়ে দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। অন্তত লিখেটিখে সামান্য রোজগারের একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আনন্দ বাজারে শক্তি ও সুনীল আছেন। মধ্য পাশে আমি যখন এদের সম্পাদিত কৃত্তিবাস বা অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনে লেখা শুরু করি, এদের সাথে নিয়মিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান হত। এরা নিশ্চয়ই হাদী মীরকে ভুলে যায় নি। আর আমি তো একেবারে নিঃসহায় হয়ে এখানে আসিনি। আমার বোন ও ভগ্নিপতির আশ্রয়ে আমি মোটামুটি ভালই থাকব। কিন্তু এরা কেন নন্দিনীসহ আমাকে আশ্রয় দেবে? আর দিলেই আমি কোনমুখে একটি বাড়তি মানুষকে এদের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্তে কাল কাটাতে পারি?

চাঁদটা এখন তার আধখানা শরীর নিয়ে ঝাউবীথির ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘোলাটে জ্যোছনায় এখান থেকেই রাস্তাটা বেশ পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। লোক চলাচল না থাকলেও দুএকটা প্রাইভেট গাড়ি নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। আমি বাতি নিভিয়ে বিছানায় এসে বসলাম। বেশ কিছুনি পরে একটা কামরায় একা ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছি। আমি প্যান্টশার্ট খুলে ইমামের দেওয়া একটা লুঙ্গি পরে শুয়ে পড়লাম। যদিও আজই বাজার থেকে আমার জন্য কাপড়- জামা এবং লুঙ্গি ইত্যাদি কেনা হয়েছে, সেসব রয়েছে ইমামের ঘরে। অন্যান্য কাপড়ের সাথে প্যাকেট করা। কাল একটা নতুন জামা পরে রাস্তায় বেরুনো যাবে।

নন্দিনী নিশ্চয়ই এখন মিতুর সাথে ঘুমোচ্ছে। দুশ্চিন্তায় ও ক্লান্তিতে এমনিতেই বেচারীর যা অবস্থা তার ওপর অন্যের বোঝা হয়ে থাকার সংকোচও সে ছাড়াতে পারছে না। নন্দিনী নিশ্চয়ই তার পিসিকে খুঁজে বের করবে। আমিও তাকে সাহায্য করব। নন্দিনী কী তার স্বজনদের পেলে এই কদিনের দুঃখের কথা মনে রাখবে? মনে রাখবে আমি তার সাথে ছিলাম?

এসময় দরজার ওপর কলিং বেলের একটা ছোট্ট আওয়াজ হল। উঠে কপাট একটু ফাঁক করতেই দেখি নন্দিনী।

ঘুমাও নি?

এখনও শুই নি।

ভেতরে এসো। আমি দরজার একপাশে সরে গেলাম।

মিতু জেগে নেই?

মিতু আমার ঘরে আসেই নি। তার মা তাকে তাদের সাথেই থাকবে বলে খাওয়ার টেবিলেই আমাকে বলে ছিল।

তাহলে এরা আমাদের দুজনের জন্য দুটো ঘরই ছেড়ে দিয়েছে।

একটু বিব্রত গলায় বললাম আমি।

আমার কিন্তু লজ্জা করছে। এ অবস্থায় আমাদের অন্যত্র ব্যবস্থা করা উচিত। বলল নন্দিনী।

আমি বললাম, তুমি কী তোমার পিসির কথা ভাবছ?

না। পিসির বাড়ি খুঁজে বের করতে পারলেও পিসি আমার আসার সব কথা জানলে আমাকে আশ্রয় দেবে না। সমাজ, বিশেষ করে আমাদের সমাজে আমার কোনো ঠাঁই হবে না। এটা আমি ভালো করেই জানি। আমি অন্য আশ্রয়ের কথা বলছি।

অন্য আশ্রয়?

হ্যাঁ, আমাদের দুজনের জন্য একটা বাসা।

খুব স্পষ্ট গলায় কথা বলছে নন্দিনী।

আমি হেসে বললাম, তুমি পাগল হয়েছ।

পাগলের কী দেখলে?

পাগল না তো কি? কলকাতায় কে আমাদের জন্য বাসা দেবে? আবার আমরা টাকাই বা পাব কোথায়?

টাকা কোনো সমস্যা হবে না। আমরা এখন কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। আসল সমস্যা হল কলকাতায় একটা বাসাবাড়ি খুঁজে পাওয়া। তোমার সাথে কাল সকালে আমিও বেরুব।

নন্দিনীর কথায় হতভম্ভ হয়ে আমি অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম।

আমার অবস্থা বুঝে নন্দিনী পেছনের দুয়ারটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, চল বিছানায় বসে তোমাকে সবকথা খুলে বলি। তোমার আপত্তি না থাকলে আমরা বিছানায় শুয়েও আলাপ করতে পারি।

আমি বললাম, তুমি বরং শোও। আমি পাশের চেয়ারটায় বসে শুনছি। আমরা লাখ টাকার মালিক এ কথার মানে কি? তুমি কী ব্যাগটায় কোনো টাকাকড়ি পেয়েছো?

আমার কথার জবাব না দিয়ে নন্দিনী সহসা গিয়ে আমার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। জানালার ঘোলাটে চাঁদের আলোয়ই তার রহস্যময় মৃদু হাসি আমি খানিকটা দেখতে পেলাম।

ব্যাগটায় কত টাকা আছে নন্দিনী?

তিন লাখ।

নন্দিনীর কথার চমকে গিয়ে বললাম, বল কী নন্দিনী এত টাকা? সব কী পাকিস্তানী নোট?

সবই ভারতীয় পাঁচশত টাকার নোট। তোমাকে কারেন্সি চেঞ্জ করার কষ্টও পোহাতে হবে না। বাসা চাই। হাদী, আমরা সংসার পাতব। আমরা এদেশেই থাকব। তুমি আমাকে নিয়ে কবিতা লিখবে। আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে আমার হাত টেনে দরে নন্দিনী চকিতে বিছানায় উঠে বসল। অপ্রকৃতিস্থ গলায় অত্যন্ত মিনতি মিশিয়ে বলল, বল, আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না?

আমিতো বলেছি নন্দিনী এ লড়াইয়ের সময়, তোমাকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমি কোথাও যাবো না।

আমি গভীর আশ্বাস বাণী উচ্চারণের মতো কথাগুলো বললাম। পর মুহূর্তেই জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাগটায় কী শুধু তিন লাখ টাকার কারেন্সি নোটই পেলে? ব্যাগটাতো খুব ভারী আর টানটান ছিল?

রাজনৈতিক লিফলেট আর বইয়ে ভর্তি ছিল। নকশালদের লিটারেচার। বলল নন্দিনী। আমি বললাম, টাকাগুলো কী গুণে দেখেছ?

দেখার দরকার হয় নি। টাকার বান্ডিলগুলোর মধ্যে একটা চিঠি আছে। চিঠিতে এটাকা ও বইগুলো বাংলাদেশের দর্শনায় একটা কাস্টম কলোনীর ঠিকানায় এক ছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইঙ্গিত আছে। গোহাটিতে লোকটা সেই কাজ করতে গিয়েই ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু ব্যাগটা আমরা নিয়ে এসেছি। চিঠিতে কে এক আলীকে বলা হয়েছে। এ টাকায় অস্ত্র সংগ্রহ করে অপারেশন চালিয়ে যেতে। বান্ডিলে সর্বমোট তিন লক্ষ টাকা আছে- একথা চিঠিতেই আছে। চিঠিতে স্বাক্ষরকারী কে এক দাশগুপ্ত। স্বাক্ষরটা অবশ্য ইংরেজিতে।

আমার হাত ধরে নন্দিনী যেন রূপকথা বলে যাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যাগ ও ঘরে নিয়ে রেখেছ কেন এক্ষুণি এখানে নিয়ে এস।

নন্দিনী এবার মুচকি হেসে বলল, ভেবো না। টাকা কেউ নিতে পারবে না। দুয়ারে চাবি দিয়ে এসেছি। এত টাকা নিয়ে ঘুমোতে আমার ভয় করে বলেই আমি দুয়ার লক করে এখানে চলে এসেছি। এখন তুমি চেয়ারে বসে রাত কাটালেও আমি এ ঘর ছেড়ে যাব না।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তুমি দুটো বালিশের একটি আমাকে দাও। আর পায়ের নিচের বেডকভারটাও আমাকে দাও। আমি নিচে পেতে শুয়ে পড়ি। এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না। কাল সকালে যাহোক ভেবে চিন্তে একটা কিছু করা যাবে। সকালে পারুলরা জাগবার আগেই তোমাকে এ ঘর ছাড়তে হবে। এখন শুয়ে পড়, আর কথা নয়।

আমার কথা শুনে নন্দিনী বালিশে মাথা রেখেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, তুমি রাগ করলে?

নন্দিনী কোনো জবাব না দিয়ে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। কতক্ষণ মাথা নিচু করে নখ খুটতে লাগল। তারপর হঠাৎ বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে আমাকে একটু ঠেলে সরিয়ে খাটের নিচে রাখা স্যান্ডেল পরতে পরতে বলল, তুমি শোও। আমি বরং ও ঘরেই গিয়েই শোব।

নন্দিনী যেতে উদ্যত হলে আমি তার শাড়ির আঁচল ধরে ফেললাম, কথা শোনো নন্দিনী।

আমাকে যেতে দাও।

তুমি রাগ করে যাচ্ছ।

তুমি যদি এখন অসভ্যের মতো টানাটানি কর আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

নন্দিনীর হঠাৎ এমন ক্ষেপে যাওয়াতে আমি ভয় পেয়ে তার আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে মিনতি মেশানো গলায় বললাম, ঠিক আছে আমি ছেড়ে দিলাম। অন্তত আমার একটা কথা তো শুনে যাবে?

বল।

নন্দিনী আঁচল তুলে তার একটা বাহু ঢাকল।

আমি তোমাকে সম্মান করি নন্দিনী। তোমার সম্ভ্রম রক্ষা করা কী আমার কর্তব্য নয়?

এ কর্তব্য তো বেশ কিছুদিন পালন করে এসেছ। সম্মান সম্ভ্রম আমার কতটুকু অবশিষ্ট আছে তা তুমি ভাল করেই জান। আমি চাই নিশ্চয়তা। তোমার ভালবাসা, নির্ভরতা। এ নির্ভরতা না পেলে আমি তোমার আর তোমার বোনের বোঝা হয়ে থাকব না। কেন থাকব?

তার জবাবে একটা অবজ্ঞার সুর বেজে ওঠায় আমি কতক্ষণ চুপ করে নন্দিনীর দিকে চেয়ে রইলাম। এ এক সম্পূর্ণ অচেনা নারী। যেন এ কয়দিনের আমাদের রক্তাক্ত পথের অভিযাত্রী সেই অসহায় মেয়েটি নয়।

আমি বললাম, হঠাৎ তুমি অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছ নন্দিনী। আমার বোনের বোঝা হয়ে থাকার তোমার আর বোধহয় দরকারই হবে না। আর আমি নিজেই অন্যের বোঝা। তোমার বোঝা বইবার শক্তি কোথায়? তবুও তোমার বোঝা বইবার একটা প্রতিশ্রুতি তুমি কী আমার কাছ থেকে আদায় কর নি?

হ্যাঁ করেছি। তুমি আমাকে ভালবাসার কথা বলেছিলে বলেই আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছি। আর টাকার কথা তুলছ কেন? টাকাটা তো একটা দৈব ব্যাপার। যদি তুমি আমাকে কোনো ভালবাসার নির্ভরতা না দাও তবে টাকার স্যুটকেসটা তোমার কাছেই রেখে যাব। মালিককে পেলে তাকে ফেরত দিও। না পেলে আমাকে বিপদে রক্ষা করার প্রতিদান ভেবে খরচ করে ফেলো।

বলেই নন্দিনী এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনিটা শব্দ করে খুলে ফেলল। আমি লাফ দিয়ে নন্দিনীর হাত ধরে ফেললাম, আমার কথা শেষ হয় নি নন্দিনী।

ফাঁক হয়ে যাওয়া ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে নন্দিনী ফিরে দাঁড়াল, বল, কী বলবে?

আমি তোমাকে ভালবাসি নন্দিনী। তবুও আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী আছে। সে কোথায় কীভাবে আছে তা জানি না এবং খোঁজও নিচ্ছি না। প্রেম, ভালবাসা, কর্তব্যবোধ, অপরাধবোধ এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আমার বুকের পাঁজর ধরে টানাটানি করছে। এ অবস্থায় আমার মানসিক টেনশনের কথা কী তুমি একটুও বিবেচনা করতে পারো না?

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে নন্দিনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার আমার বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে একটা বালিশ ও বেড কভার তুলে নিয়ে। মেঝের ওপর ছড়িয়ে বিছানা পাততে লাগল। আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে হাত ধরে ফেললাম, আমরা দুজন এস একসাথেই থাকব নন্দিনী। আমার দ্বিধাকে মাফ করে দাও।

আমার কথায় একটু নির্ভরতার আশ্বাস পেয়ে নন্দিনী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি তাকে বুকের কাছে টেনে এনে কপালে চুম্বন করলাম। এবার নন্দিনী বেশ শব্দ করে কাঁদতে শুরু করায় আমি তাকে থামাবার জন্য বললাম, বাইরে দারোয়ানেরা শুনতে পাবে। চলো উপরে গিয়ে শুই।

আমি নন্দিনীকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলে সে সহসা গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে ফোঁপাতে লাগল। আমি দ্রুত হাতে মেঝে থেকে বালিশ ও চাদরটা তুলে নিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলাম।

.

সকালে দরজায় করা নাড়ার শব্দে জেগে দেখি বেলা অনেক। নন্দিনী নেই। কব্জি উল্টে ঘড়িতে দেখি বেলা সাড়ে আটটা। দরজার ছিটকিনি খোলা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে?

দরজা ঠেলে ইমাম এসে ঘরে ঢুকল।

কী ব্যাপার দরজা খোলা রেখেই ঘুমোচ্ছেন?

আমি বললাম, কী জানি ভুলে হয়ত দুয়ারটায় ছিটকিনি না লাগিয়েই শুয়ে পড়েছিলাম।

আমার কথায় ইমাম হেসে বলল, একেই বলে কবি।

আমি হেসে দ্রুত বিছানা ছেড়ে নামলাম।

হাত মুখ ধুয়ে নাস্তার জন্যে তৈরি হয়ে আসুন।

আপনার সঙ্গিনী তো অনেক আগেই জেগেছেন। আমাদেরও জাগিয়েছেন।

আমি বললাম, নন্দিনী?

হ্যাঁ। আমাদের ঘরে খবরের কাগজ দেখছেন। আপনাকে এই মুহূর্তে একটা আগাম দুঃসংবাদ দিয়ে রাখি।

আমি বললাম, সে আবার কি?

লেখক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় মারা গেছেন।

ইমাম গম্ভীর গলায় দুঃসংবাদটি শোনাল।

আমি কতক্ষণ হতবাক হয়ে থেকে বললাম, বাংলা ভাষার সত্যই মস্তবড় অনিষ্ট হল।

ইমাম বলল, আপনি টয়লেট থেকে এসে কাগজ দেখুন। আজকের কাগজেই বিস্তারিত বর্ণনা ছাপা হয়েছে। ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা একটা পাওয়ার হাউজ উড়িয়ে দিয়েছে। আর আখাউড়ায় চলছে মুখোমুখি লড়াই। মনে হচ্ছে, একটা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, আল্লার শোকর আদায় করুন।

আলহামদুলিল্লাহ।

তারাশঙ্করের মৃত্যু সংবাদ সত্ত্বেও ইমামের আনন্দ প্রকাশের কারণ যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য তা বুঝতে পারলাম।

আপনি ঘরে যান। আমি এক্ষুণি তৈরি হয়ে আসছি।

আসুন। একবারে নিচে চলে আসবেন। আমরা ডাইনিং হলে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

বলে ইমাম দরজার ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

.

আমি নাস্তার টেবিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলাম। নন্দিনী পট থেকে ছুরির আগায় মাখন তুলে রুটিতে মাখাতে মাখাতে একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। তার মুখ লাজরক্তে রক্তিম। যদিও নন্দিনী স্নান সেরে স্নিগ্ধ হয়ে নতুন শাড়ি পরে এসেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন পরে একটু পরিপাটি হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি টেবিলে যোগ দেওয়া মাত্র সে মাখন মাখানো রটির। স্লাইসগুলো আমার প্লেটে তুলে দিতে লাগল। নন্দিনীর এই পরিবেশনটা পারুল আড়চোখে লক্ষ্য করছে আমি বুঝতে পারলাম। আমি আমার বোনের দিকে মুখ তুলতেই সে একট কায়দা করে হাসল, ভাইয়ের বোধহয় ভাবির চিন্তায় রাতে ভালো ঘুম হয় নি।

আমি পারুলের কথায় হাসলাম, শুধু ভাবি না, নানা দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম আসতে চায় না।

দিদি গতরাতে ভালোই ঘুমিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

পারুলের কথায় যে একটা শ্লেষের আভাস থাকতে পারে তা ছিল আমার ধারণার বাইরে।

নন্দিনীর হাত সহসা থেমে গেল। ছুরির ডগা থেকে অবশিষ্ট মাখনটুকু আমার প্লেটে রাখা একটা স্লাইসে মুছে নন্দিনী আস্তে করে ছুরিটা তার সামনের প্লেটে রাখল।

পারুল অদ্ভুত এক ধরনের মেয়েলী হাসি হেসে নন্দিনীকে উদ্দেশ্য করে বলল, যাই ভাবেন, দিদিকে কিন্তু কমদামের শাড়িতেও দারুণ লাগে। ঠিক বলি নি দিদি?

নন্দিনী সম্ভবত আর ধৈর্য রাখতে পারল না, ঠিকই বলেছেন। যেটুকু সামনা সামনি দেখছেন তাতে এর চেয়ে ঠিক আর কী বলবেন? তবে যেটুকু আন্দাজ করে কষ্ট পাচ্ছেন সে সন্দেহ আমি এক্ষুণি দূর করে দিচ্ছি। কাল রাত একাকী ঘরে ভয়ে ঘুম হবেনা ভেবে আপনার ভাইকে কাকুতি-মিনতি করে রাজি করিয়ে তার ঘরে তার খাটে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি। বেশ ভালো ঘুম হয়েছে। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখি নি। ঘুমে কী আর দুঃস্বপ্ন দেখব? আপনাকে বলা হয় নি, আমি হানাদারদের দ্বারা লাঞ্ছিতাদেরই একজন। আপনার ভাই কবি, একজন যুক্তিসংগ্রামীও। এমন মানুষের বিছানার বা পাশটায় ক্ষণকালের জন্যে আশ্রয় পেলেও জীবন সার্থক হয়। আমি এ লোভ ছাড়তে পারছি না। ছেড়ে কোথায় যাব? প্রকৃতপক্ষে আমার যাবার কোনো জায়গা নেই দিদি। একটা যুদ্ধের সময় যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়ে মাটি কামড়ে ধরছে। কোনটা ভারত কোনটা পাকিস্তান এখন আর সেটা ভেবে দেখার সময় পাচ্ছে না। আমি এই মুহূর্তে বেঁচে থাকতে পারছি এটাই আমার যুক্তি। আমি যদি উটকো দখলদার হয়ে থাকি তবে প্রকৃত মালিক এলে আমাকে

উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে দেবেন। আমি আপত্তি করব না। এখন থেকে আশা করি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবেন না। সবই খুলে বললাম। ভেবে দেখুন, আমি ওপরে যাই।

মুহূর্তের মধ্যে কথাগুলো বলে নন্দিনী চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। পারুলও নন্দিনীর এ ধরনের কথাবার্তায় অপ্রস্তুত হয়ে একেবারে কাঠ হয়ে ইমামের দিকে তাকিয়ে রইল। ইমাম সহসা দাঁড়িয়ে নন্দিনীকে বলল, আমার স্ত্রীর আচরণে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আপনি দয়া করে একটু বসে আমার কথাগুলো শুনবেন।

নন্দিনী বসল।

আমি আমার চাবিটা মিতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, যাও তো মা তুমি ওপরে চলে যাও।

মিতু চাবিটা হাতে নিয়ে এক রকম দৌড়েই ওপরে চলে গেল। মিতু ওপরের সিঁড়ির শেষ ধাপে না পৌঁছা পর্যন্ত ইমাম সেদিকে চেয়ে রইল। পরে সহসা নন্দিনীর দিকে ফিরে বলল, আপনার সাহস ও সরলতার আমি তারিফ করি মিস নন্দিনী। আমার স্ত্রী এতক্ষণ আপনাকে যেভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলেছে এর যোগ্য জবাব তার পাওনা ছিল, সে তা পেয়েছে। আর সে এ পর্যন্ত আপনার সাথে যে ব্যবহার আগাগোড়া করে এসেছে তা ভালো হোক মন্দ হোক কবি সাহেবের বোন হিসেবেই করেছে। আমার স্ত্রী হিসেবে নয়। আমি আগরতলাতেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসছি। আজ আপনি খোলামেলা কথা বলে আমার ও আমার স্ত্রীর উপকারই করলেন। আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমিও প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদেরই সরকারের কর্মচারী এবং সে অর্থে মুক্তিযোদ্ধা। আপনাকে সমর্থন ও আশ্রয় দেয়াই আমার মূল কর্তব্য। আমার স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত।

ইমামের কথা শেষ হওয়া মাত্রই পারুল উঠে গিয়ে নন্দিনীর হাত ধরে বলল, আমিও খুব লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করে দিন বোন। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি কী অবস্থা থেকে কবি ভাই ও আপনি এসেছেন। আমি শুধু অবস্থার একটা দিকই বিবেচনা করেছি। অন্য দিকটা দেখতে পাই নি। আপনারা আমার ওপর রাগ করে আমায় ছেড়ে যাবেন না।

পারুলের কথায় নন্দিনী গলে গেল। বলল, না, আর যাব না।

পারুল খুশি হয়ে আমাদের পেয়ালায় চা ঢেলে দিতে এগিয়ে এল।

চা খাওয়ার পর আমি ওপরে এসে দেখি মিতু মুখ ভার করে আমার কামরায় বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিরে মন খারাপ করে আছিস কেন?

মামা নন্দিনী ফুপু কী সব বলল, আম্মা কী ফুপুকে চলে যেতে বলেছে?

মহা উৎকণ্ঠা নিয়ে মিতু আমাকে প্রশ্ন করল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না ওসব কিছু নয়। জানিস তো তোর নন্দিনী ফুপুর এক বোন আসার সময় পথে পাক বাহিনীর গুলীতে শহীদ হয়েছে। ওর কী মাথার ঠিক আছে? তার ওপর গত রাত তুইও তোর মার সাথে শুতে গেলি। বেচারা একা একা দুঃস্বপ্নেরও ভয়ে ঘুমোতে না পেরে কাঠ হয়ে আমার ঘরে এসে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছে।

নিজের অজান্তেই কিশোরী মেয়েটিকে আমি যেন কৈফিয়ত দিলাম। যদিও জানি এই মিথ্যা মেশানো সত্যে মিতুর কিছুই আসে যায় না এবং এ কৈফিয়ত না দিলেও চলত।

কেন আমাকে ডাকলেই হত।

এত রাতে তোদের জাগাতে গেলে সারা হোটেলের মানুষজন জেগে উঠত।

নন্দিনী ফুপুর আপনজন আর কেউ নেই?

হয়ত আছে। কিন্তু একটু থিতু হওয়া না গেলে তো ও আর ওর আপনজনদের তালাশ করতে পারবে না।

থাকুন না আমাদের সাথে। মামা আপনি কী আমাদের রেখে অন্য বাসায় চলে যাবেন?

আমি মিতুর কথার কোনো জবাব খুঁজে না পেলে হাসলাম, আমি আর কোথাও যাব না। এখানে কী আমার কেউ আছে?

মামিকে খুঁজে পেতে নিয়ে আসুন না মামা। মামি এলে কী নন্দিনী ফুপু রাগ করবেন?

তা কেন করবেন? তোর মামির তো সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশে কোথাও নিরাপদেই আছেন। তোর মামি তো আর অশিক্ষিত গাঁয়ের মেয়ে নয়, ঢাকার মেয়ে। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারবে।

আমি মিতুর সব কৌতূহল এক সাথে মেটানোর একটা দায়িত্ববোধ থেকে জবাব দিলাম।

মিতু হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা মামা, মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করতে আপনি আব্বা আপনারা যুদ্ধে যাবেন না?

এবার মিতু কিশোরী সুলভ ঔৎসুক্যে এমন এক প্রশ্ন করল যা সহজেই আঁতে ঘা লাগার মত। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমরা তো যুদ্ধ করব বলেই এসেছি। যারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নানা জায়গায় হানাদার বাহিনীকে ঠেকাচ্ছে আমরা তো তাদের সাহায্য করতেই দেশ ছেড়ে ভারতে চলে এসেছি। আমরা এখানে থেকে লিখে সারা বিশ্বের মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করে এই যুদ্ধের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করব।

আমার কথা শেষ হবার মুহূর্তেই নন্দিনী এসে ঘরে ঢুকল। পেছন থেকে পারুল বলল, মামা- ভাগ্নি কাদের জন্য অস্ত্র আর রসদের যোগান দিচ্ছেন?

আমি হাসলাম। মিতু বলল, আমরাও যুদ্ধ করব। মামা লিখবে আর আমি গেয়ে মানুষকে জাগাব, একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।

ঠিক আছে, এখন আমাদের ঘরে চল। এরা চা- নাস্তা করে এসেছেন, একটু বিশ্রাম নিতে দাও।

বলল পারুল। আমি জানতে চাইলাম, ইমাম কী এখন থিয়েটার রোডে যাবে?

তাই তো বলল।

আমি কী তার সাথে যাব?

আপনি বরং আপনার লেখক বন্ধুদের সাথে ঘুরে ফিরে দেখা সাক্ষাৎ করে আসুন। বেরুবার আগে একটু আমার ঘরে আসবেন তো ভাই। চল মিতু।

পারুল মিতুকে নিয়ে চলে গেলে নন্দিনী বলল, কোথায় যাবে, আনন্দ বাজার?

কবি বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে তা সেখানেই আগে যেতে হবে। কিন্তু তারাশঙ্করের মৃত্যুর সংবাদ দেখে মনে হচ্ছে সেখানে আজ কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।

সুতারকিন স্ট্রীটে আনন্দবাজার অফিসে যাওয়ার পর খুব ইচ্ছে থাকলেও আমার মন বলছিল আজ সেখানে পরিচিত কাউকে পাওয়া মুস্কিল হবে। তারাশঙ্করের মৃত্যু সংবাদে কলকাতার লেখকগণ স্বস্থানে থাকবে বলে আমার মনে হল না।

নন্দিনী বলল, যদি সেখানে না যাও তবে আমাকেও নিয়ে চল না। একটু ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে আসব।

তোমার প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বাংলাদেশের কে কোথায় কীভাবে আছেন জানা থাকলে ভাল হত। আমি তো কোনো কিছুই জানি না। বলতে গেলে এ শহরটা আমার কাছে অচেনাই। তবে তুমি যদি চাও ভবানীপুর তোমার পিসির কাছে একবার যেতে পারি। অন্তত সীমাদির মৃত্যুর খবরটা তাদের জানানো উচিত।

তারা আমাকে গ্রহণ করবে না হাদী। সেখানে গেলে তারা যদি তোমাকে যথার্থ আতিথ্য না দেয় তখন আমার খুব খারাপ লাগবে। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

নন্দিনী মাথা নিচু করে ধীরে সুস্থে কথাগুলো বলল।

আমি বললাম, এর উল্টোওতো ঘটতে পারে। সেখানে না গিয়ে তুমি সব জানলে কী করে? হাজার হলেও তোমার বাপের বোন তোমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেবে এটা আমি ভাবতে পারি না নন্দিনী।

অর্থাৎ তারা গ্রহণ করলে তুমি আমাকে সেখানেই রেখে আসতে চাও?

না, তা চাই না। বরং তারা তোমাকে আত্মীয়ের দাবিতে জোর করে রাখতে চাইলেও আমি তোমাকে ফেলে আসব না।

তাদের না হয় আত্মীয়তার এবং রক্ত সম্পর্কের দাবি আছে। তুমি তাদের কোনো দাবির কথা তুলে আমাকে আনবে?

কেন, গত রাতে যে দাবিতে তুমি আমার বিছানায়, আমার পাশে শুয়ে সারা রাত কেঁদে কাটালে এটা কী কোনো দাবি নয়?

বললাম আমি।

তাহলে চল আমি যাব।

আমি বললাম, একটু দাঁড়াও আমি গোসল সেরে কাপড় পরে নিই। তুমি বরং এই ফাঁকে পারুলের কাছ থেকে আমার জন্য এক জোড়া বেরুবার মতো পোশাক নিয়ে এস।

নন্দিনী আমার কথায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি গোসলের জন্য বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম।

গোসল করে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার ওপর একজোড়া ইস্ত্রি করা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। নন্দিনী পোশাক রেখে সম্ভবত নিজের কামরায় তৈরি হতে গেছে। আমি কাপড়গুলো পরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে পারুলদের ঘরের দিকে রওনা হলাম। যাবার সময় নন্দিনীর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে কলিং বেল টিপলাম। নন্দিনী দুয়ার খুলে একটু কপাট ফাঁক করে মুখ বাড়াল। আমি বললাম, আমি পারুলের সাথে কথা বলে আসছি।

নন্দিনী বলল, আমাদের বেরুতে টাকা লাগবে না? হাজার খানেক সঙ্গে নেব? আমি বললাম, দাঁড়াও, আমি পারুলের সাথে আগে কথা বলে নিই। সম্ভবত পারুল আমাকে হাত খরচের কিছু টাকা দিতেই ডেকেছে। যদি সেখান থেকেই পাই তবে গচ্ছিত টাকায় এখনই হাত দেয়ার ইচ্ছে নেই। তুমি কী বল?

কী বলব, তোমার মতই আমার মত।

বলে দরজা এঁটে দিল নন্দিনী।

আমি ঘরে ঢোকা মাত্রই পারুল বলল, আসুন ভাই। আপনাদের জামাই তার অফিসের পৌঁছেই এই মাত্র টেলিফোন করেছিল। আমাদের বাসা ঠিক হয়ে গেছে। আমরা কাল পার্ক সার্কাসের একটা বাসায় উঠব। আমাদের জন্য সেখানে তিন তলায় একটা আস্ত ফ্লাট পাওয়া গেছে। ওপরে নিচে যারা আছেন তারা সবাই বাংলাদেশী। সবাই আমাদের অফিসার ও কর্মচারী। পাঁচ কামরার ফ্লাট। আমাদের কোনো অসুবিধাই নাকি হবে না।

আমি বললাম, এখন কী আমরা বেরুব?

পারুল বলল, যান না, একটু ঘুরে আসুন। আর এই খামটা রাখুন। এতে হাজার দুয়েক টাকা আছে।

আমি হাত বাড়িয়ে খামটা নিতে গেলে পারুলের বিছানার শিথানে রাখা একটা মান্ধাতার আমলের কালো টেলিফোন সেট বেজে উঠল। পারুল টেলিফোন তুলে সাড়া দিয়েই বলল, আপনার সাথে কথা বলবে।

আমি টেলিফোনটা ধরেই বললাম, হ্যালো।

কবি ভাই, বাংলাদেশ থেকে আসা সব কবি- সাহিত্যিককে আমি আপনার আগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছি। এরা সবাই পার্ক সার্কাস এলাকার বালু হাক্কাক লেনে আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতারের

যোগাযোগ কেন্দ্রের সাথে জড়িত। তারা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষায় আছে। আপনি এখনই সেখানে চলে যান।

আমি বললাম, সেখানে গেলে এখন কাদের পাবো?

শুনেছি গাফফার চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, আসাদ চৌধুরী আরও অনেকে সেখানে আসা- যাওয়া করেন। আপনি গেলে কাউকে না কাউকে তো সেখানে পেয়ে যাবেন। আমি আমাদের দফতরে আপনার জন্য একটা চাকুরির চেষ্টা করছি। আশা করছি নন্দিনীদিরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

খুব আত্মবিশ্বাস আর আনন্দের সাথে ইমামের কথা উপচে পড়ছে। আমি কী বলে যে ইমামকে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছিলাম না। শুধু কাঁপা গলায় বললাম, আমি আর নন্দিনী এখুনি পার্ক সার্কাস রওনা হচ্ছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি টেলিফোন রেখে পারুলকে বললাম, আমরা এখুনি বেরুচ্ছি। আমাদের ঘরের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস।

আমরা রাস্তায় বেরিয়েই একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। আমি কালেভদ্রে পান খাই। দাঁড়ালাম, কারণ বালু হাক্কাক লেনটা কোথায় তা খুঁজে বের করা দরকার। পান কেনার অছিলায় গলিটির দিশা পাওয়া যাবে ভেবে আমি দোকানিকে দুটো পান দিতে বললাম।

দোকানি মুখ তুলে আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, জর্দা?

আমি বললাম, একটায় একছিটে জর্দা আর খয়ের।

নন্দিনীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, তোমারও জর্দা লাগবে?

দিক না একটু জর্দা।

রাস্তায় বেরুতে পেরে নন্দিনীও মনে হচ্ছে খানিকটা বেপরোয়া, একটু হেসে জবাব দিল নন্দিনী। আমি পানঅলার দিকে তাকালাম। ষাট- পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ। কাঁচাপাকা চাপ দাঁড়ি। মাথায় টুপী। নিবিষ্ট দক্ষতায় কাটা পানপাতার ওপর খয়ের ঘষছে। এই সুযোগে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বালু হাক্কাক লেনটা কোন্ দিকে?

সেখানে কার বাড়ি যাবেন?

চমকে প্রশ্ন করল লোকটা।

আপনারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছেন?

আমি ও নন্দিনী একসাথে জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

আমাদের জবাব শুনে লোকটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে হাতের পান পাতা দুটো ছুঁড়ে সামনের বালতিতে ফেলে দিল।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার?

সামনের দোকান থেকে পান নিন। আমি আপনাদের কাছে পান বেচব না। আপনারা পাকিস্তান ভেঙে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তানে গাদ্দারি করতে এসেছেন। আমরা হিন্দুস্তানি মুসলমানরা আপনাদের ঘৃণা করি। যান আগে বাড়েন।

মুখে চরম বিরক্তি ফুটিয়ে বৃদ্ধটি আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। আমি হতবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নন্দিনী কিন্তু সহজে দমল না। বলল, তুমিই গাদ্দার। পাকিস্তানের দালাল। জানো এই ব্যবহারের জন্য আমরা তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি?

লোকটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় বলে উঠল, খুব দেখেছি। রোজ দেখি। কথা বাড়াবেন না মেম সাব। এখান থেকে এক্ষুনি চলে যান। জানেন না এটা পার্ক সার্কাস। যান আগে বাড়েন।

নন্দিনী পানওয়ালাটার মুখের ওপর কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। আমি তাকে ঠেলে সামনের দিকে চালিয়ে সরে এলাম, কি দরকার কথা বাড়িয়ে? এরা এখানকার বঞ্চিত মুসলিম। পাকিস্তান ছিল এদের স্বপ্ন। যারা এই স্বপ্ন ভাঙতে উদ্যত তাদের এরা মানবে কেন?

এজন্য কী এক খিলি পানও বিক্রি করবে না?

না করবে না। এদের ক্ষোভ কতটা গভীর তা তোমাকে সহানুভূতির সাথে বুঝতে হবে নন্দিনী। এদেরকেও পাকিস্তানে আমরা বাঙালি হিন্দু- মুসলমান কী অবস্থায় আছি তা বুঝিয়ে দিতে হবে। এরা ভাবতেই পারছে না ভারতীয় কূটনীতি ও সামরিক সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জনগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এ অবস্থায় আমরা কী সফল হব?

আমি নির্দ্বিধায় জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই হব। দশ কোটি মানুষ যদি পাকিস্তান বা হিন্দুস্তানের পতাকার নিচে থাকতে না চায়, সামরিক দমন পীড়ন, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালানো, অসহায় নারীর ওপর অকথ্য লাঞ্ছনা চালিয়ে কী কেউ তাদের মুক্তি সংগ্রামকে পরাজিত করতে পারে?

লোকটার ব্যবহারে আমার বুকে ভয় ধরে গেছে কবি। আমার গা কাঁপছে। বাপরে আমাদের প্রতি এখানকার মুসলিমদের এত্তো ঘৃণা? এমন ঘৃণা আর অপছন্দ নিয়ে ইন্ডিয়ার সংখ্যালঘু বিশ পঁচিশ কোটি মুসলমান বাস করে এদেশে? তাহলে তো ভারতও একদিন ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে।

নন্দিনীর এই সহসা সরল উপলব্ধিতে আমি কোনো বাধা না দিয়ে চুপ করে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

বেশ খানিকটা এগিয়ে আমরা পার্ক সার্কাসের শেষ প্রান্তে ট্রাম লাইনের একটু আগে ঝাউবীথির নিচের ফুটপাতে এসে পড়লাম। এসময় আমাদের পাশ দিয়ে একটা খালি ট্যাকসি চলে যেতে দেখে আমি হাত তুললাম। শিখ ট্যাকসি ড্রাইভার খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে মুখ বাড়াল, কীধার যানা?

বালু হাক্কাক লেন। জয়বাংলা অফিস।

নন্দিনী বলল।

ট্যাকসিওয়ালা হাতের ইশারায় গাড়িতে উঠতে বলল। আমরা উঠলাম। গাড়িতে ওঠার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা বাঁক ঘুরে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ট্যাকসি ড্রাইভার স্টার্ট রেখে আমাদের দিকে না ফিরেই গাড়ির মিটার উল্টে দিয়ে বলল, দশ রুপেয়া।

আমি খাম থেকে একটা একশো টাকা এগিয়ে দিয়ে বললাম, চেঞ্জ দিজিয়ে সর্দারজি। ঔর মেহেরবানী করকে জয় বাংলা অফিস কোন মকানমে জরাসা সমঝা দিজিয়ে।

লোকটা আমার কথায় বেশ খুশি হয়েছে মনে হল। দ্রুত হাতে ভাংতি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ওতারকে ইসতরা সামনেঅলা মকানমে যাকর পুছিয়ে। এহি আপকা ঠিকানা।

আমরা নেমে সামনের একতলা একটা বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে চেনা মানুষকে খুঁজতে লাগলাম। নন্দিনী আমার হাত ধরে থাকল। আমাদের দিকে এখানে কেউ এক নজর ফিরেও দেখছে না। আমি সাহস করে একটা টেবিলের চারদিকে ভিড় করে থাকা কয়েকজন মেয়ে পুরুষের গা ঘেঁষে ভেতরে প্রবেশ করেই চট্টগ্রাম রেডিওর এককালের

নিয়মিত স্ক্রীপ্ট লেখক, আমার বন্ধু বেলাল মোহাম্মদকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখে সালাম বললাম। বেলাল টেবিলে উবু হয়ে ক্রমাগত কী যেন লিখে যাচ্ছে। আমার আসোলামু আলাইকুম শুনে মুখ তুলেই হেসে শ্লোগান দিল, জয় বাংলা। কী আশ্চর্য আরও একজন কবি এসে গেছে। কবি হাদী মীর।

আমি হেসে বললাম, আরও এক কবি- সাহিত্যিক এখানে আছেন জেনেই এসেছি। আপনি কেমন আছেন বেলাল?

বেলাল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হেসে বলল, এ যুদ্ধে আমরা জিতবই। আপনার মতো নিরীহ কবিও যখন চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন তখন বুঝতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরাও সামিল হতে আর দ্বিধা করছে না। জয় বাংলা।

আমি বললাম, আসাদ, নির্মলেন্দু এদের সাথে দেখা হলে ভালো হত। কই, এদের তো দেখছি না।

একটু পরেই সবাইকে পাবেন। একটু ধৈর্য ধরুন। বলে বেলাল একটু দূরে সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আপনি সপরিবারেই চলে এসেছেন মনে হচ্ছে? ওকে এখানে এসে বসতে বলুন। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আপনিও বসুন। এই আপনারা কবি দম্পতিকে একটু বসতে দিন তো।

সামনের কয়েকজন যুবক বেলালের কথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমি হাতের ইশারায় নন্দিনীকে ডাকলে সে সসংকোচে পাশে এসে বসল এবং অনভ্যস্ত হাত তুলে বেলাল মোহাম্মদকে সালাম জানাল।

বেলাল বলল, আপনারা কোথায় উঠেছেন?

আমরা উডস্ট্রীটের একটা হোটেলে আছি। সাথে আমার বোন ভগ্নিপতি ও ভাগ্নি আছে। আমার বোন জামাই প্রবাসী সরকারের উচ্চপদের কর্মচারী। তার সাথে আছি বলেই ভালো আছি। আগামীকাল হয়ত হোটেল ছেড়ে অন্যত্র যাব।

যাক, আপনি ভালোই আছেন। তবে এটা জানবেন দেশ ছেড়ে আসা অধিকাংশ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক আপনাদের মতো ভাল আশ্রয়ে নেই। সবাই আমরা সব অবস্থা মেনে নিয়েছি। ঐ যে আপনার বন্ধু আসাদ চৌধুরী এসে গেছেন।

বেলালের কথায় আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম আসাদ সিঁড়ি বেয়ে এদিকেই আসছে। আমাকে দেখেই দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে কোলাকুলি করল, জয় বাংলা।

আমিও বললাম, জয় বাংলা।

ভাবির সাথে দেখা হয়েছে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, ভাবি? হামিদা কী কলকাতায় এসেছে?

আশ্চর্য আপনি এখনও তার খোঁজ পান নি? তিনি তো অনেক আগেই কলকাতা পৌঁছেছেন। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা প্রাথমিক ট্রেনিং শেষ করেছে। তিনিও তাদের একজন। সম্ভবত এখন তার অপারেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কাল আট নম্বর থিয়েটার রোডে গিয়ে ভাবির বর্তমান অবস্থানের খোঁজ নিন। মনে রাখবেন এখন আপনার বৌ আর নিরস্ত্র গৃহিণী মাত্র নন। গুলী আর হ্যান্ড গ্রেনেড মারতে জানেন।

বলেই আসাদ তার স্বভাব সুলভ কলরবময় হাসিতে ফেটে পড়লেন। আমার মুখে আর কথা সরছে না। হামিদা কলকাতায়? হামিদা সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা? হানাদার বাহিনীকে আঘাত হানতে দেশের ভেতর যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে?

কিছুই যেন আমার মাথায় ঢুকছে না। আমি একবার মাত্র আড় চোখে নন্দিনীকে দেখলাম। সে মাথা নত করে নখ খুঁটছে।

এবার নন্দিনীর দিকে চোখ পড়তেই আসাদ প্রশ্ন করলেন, ইনি আপনার বোন মিসেস ইমাম?

আমার জবাব দেবার আগেই নন্দিনী বলল, না, আমি কবির বান্ধবী। আমার নাম নন্দিনী ভট্টাচার্য। ভৈরববাজার থেকে এসেছি। আমি ইমাম পরিবারের আশ্রয়ে। আপনি তো কবির ভগ্নিপতিকে ভালো করেই চেনেন মনে হচ্ছে?

আসাদ বলল, হাঁ, এদের সবাইকে চিনি। আমার দিকে ফিরে বললেন, একটা দেশাত্ববোধক কবিতা স্টকে আছে নাকি? দিন, কালই প্রচার করব।

আমি বললাম, না এখনও কবিতার মতো কোনোকিছু বানিয়ে ফেলার ফুরসৎ পাই নি। একটু সময় দিতে হবে।

অফুরন্ত সময়। মনস্থির করে একটা বুক কাঁপানো কবিতা লিখে ফেলুন।

আসাদের কথায় আমি হাসলাম, দেখা যাক।

বেলাল আমার স্ত্রীকে চিনতেন না। সম্ভবত তিনি ধরে নিয়েছিলেন আমার সঙ্গিনী আমার স্ত্রীই হবেন। এখন আমার স্ত্রী ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্বা জানতে পেরে এবং আমার সাথে এখনও তার যোগাযোগ ঘটে নি বুঝতে পেরে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, আজ তাহলে উঠি বেলাল।

একটু বসলে গাফফার ভাই আর গুণের সাথে দেখা হয়ে যেত।

এদের সাথে আগামীকাল দেখা করব। বলবেন আমি এদের খুঁজে গেলাম।

বলে নন্দিনীকে উঠবার ইঙ্গিত করে আমি বেলাল ও আসাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

.

গলিটা পার হয়ে আমরা বড় রাস্তায় পা দেয়া মাত্র নন্দিনী মুখ খুলল, কবি আমার মনে হয় বৌদির খোঁজ নেওয়ার আগেই আমার একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

আমি বললাম, আমি এখনও ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও নন্দিনী। যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে তোমার বৌদি ঠিক পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন না। তার ব্যবস্থা তিনি করে নিয়েছেন।

নন্দিনী বলল, তিনি বীর নারী। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। আমরাই বরং হাবুডুবু খাচ্ছি। আর আমি তো আগেই বলেছি, তোমার বৌ ফিরে এলে আমি আমার পথ দেখব। এখন চল ভবানীপুরের দিকে একটু ঘুরে আসি। যদিও জানি সেখানে গিয়ে তেমন কোনো ফল হবে না।

সেখানে যাওয়ার আগে একবার হোটেলে গিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করে দেখলে ভাল হয় না? এতক্ষণে ইমাম নিশ্চয়ই বাসায় ফিরেছে। বিকেলে না হয় ভবানীপুর যাওয়া যাবে।

না। তার আগেই আমরা একবার ভবানীপুর যাব। তুমি যে বলেছিলে দিদির মৃত্যুর খবরটা একবার অন্তত আমার পিসীমাকে দেয়া উচিত। এখন মনে হচ্ছে সেটাই ঠিক।

দৃঢ়তার সাথেই নন্দিনী আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ট্যাক্সির জন্য এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। আমি বললাম, আরেকটু এগিয়ে গেলে ট্রাম স্ট্যান্ডের মোড়ে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

নন্দিনী আমার কথামত হাঁটতে লাগল। আমার কেন যেন মনে হল নন্দিনী যন্ত্রের মতো শুধু পা ফেলে যাচ্ছে। তার মধ্যে কোনো অনুভূতি নেই। আমি হাত বাড়িয়ে নন্দিনীর একটা হাত ধরলাম, নন্দিনী?

হঠাৎ নন্দিনী ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছেলেমানুষি করার জায়গা বুঝি এটা? দেখছ না পথচলা মানুষ আমাদের দেখছে।

আমি তার হাত ছেড়ে দিয়ে পথের দুপাশে তাকালাম। পথযাত্রীরা সংখ্যা কম হলেও, চলতে চলতে এরি মধ্যে দুচারজন আমাদের দেখছে।

আমি বললাম, নন্দিনী আমি তোমাকে ভালবাসি।

মাঝপথে আমি বুঝি তোমার ভালবাসার প্রমাণ চাইছি?

তা কেন।

এখন চল ভবানীপুর যাই।

ভবানীপুর গেলেই কী তুমি বাড়ি খুঁজে বের করতে পারবে?

মনে হয় পারব। একটা স্কুলের পাশ দিয়ে গলিটা ঢুকছে। গলির ভেতরে ১১৭ নম্বর বাড়ি। বাড়ির ভেতর অনেক ভাড়াটের সাথে আমার বিধবা পিসিমা তার এক বেকার ছেলে ও দুটি স্কুলে পড়ুয়া মেয়ে নিয়ে থাকতেন। বহু বছর আগের কথা। আমার বোন দুটি ছিল আমারই বয়েসী, নাম অঞ্জলি আর দীপালি। আমার দাদা যাকে আমি বহুদিন আগে একজন গ্রাজুয়েট বেকার দেখে গিয়েছিলাম তার নাম অনুপ মুখোপাধ্যায়। আর পিসিমার নাম রাধারাণী দেবী। আশা করি এখনও সেখানেই থাকলে এরা আমাকে চিনতে পারবেন। তবে এমন আশা করি না, এরা আমাকে আত্মীয় হিসেবে আশ্রয় দিতে চাইবেন।

বলল নন্দিনী।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে নন্দিনীর পাশাপাশি ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে চলতে লাগলাম। ট্রাম স্ট্যান্ডের মোড়ে এসে সহজেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। আমরা গাড়িতে উঠে ভবানীপুর যেতে বললাম।

ট্যাক্সি ভবানীপুর ঢুকতেই নন্দিনী বলল, ঐতো স্কুলটা, এর পাশের গলিতে ঢুকতে হবে।

আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললাম, হিয়াই রোক যাইয়ে।

ড্রাইভার গাড়ি রাখলে আমরা ভাড়া মিটিয়ে নেমে গেলাম। গলিতে ঢুকে কেন জানি একটা অযথা ভয় ও বুকের ভেতর ধুকধুকানি অনুভব করছিলাম।

নন্দিনী বলল, চিনতে পারছি, এটাই সেই গলি। একটু সামনে গিয়ে ডানদিকের বাড়িটা।

আমি বললাম, আমার বুক কাঁপছে নন্দিনী। আমি বাড়ির বাইরে থাকব। তুমি ভেতরে যেও। তোমার আত্মীয়রা এখনও এখানে থাকলে পরিস্থিতি বুঝে আমাকে ডেকে নিও।

নন্দিনী হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে বরং একটা সিগ্রেট খাও। তারপর না হয় ধীরে সুস্থে বাড়ির ভেতর ঢুকবে। এমন কাঁপতে কাঁপতে ঢুকলে এরা কী ভাববে?

আমার ভয় লাগছে।

কিসের ভয়? আমাকে হারাবার?

বুঝতে পারছি না।

আমার কথায় নন্দিনী ঠোঁট টিপে হাসল, আমি যদি তোমার মুক্তিযোদ্ধা বৌয়ের সাথে লড়াই করে জিততে চাই, বুঝতে পারছি জিতে যাব। তবে আমি এমন কাপুরুষের মতো জিততে চাই না। নাও সিগ্রেট ধরাও।

আমি পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগ্রেট ধরিয়েই বললাম, এখানে আর দাঁড়াতে হবে না, চল বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকি।

নন্দিনীও আর কোনো কথা না বলে আমার আগে আগে চলতে লাগল। আমরা গলির মাথায় এসে ডানদিকে একটা অতিকায় শেওলা পড়া বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। নন্দিনী বলল, এটাই।

বাড়ির সামনে একটা ভাঙা দেয়াল। দেয়ালের শেষপ্রান্তে একটা গেট। একতলা এই পুরানো বাড়িটাকে ঘিরে আছে স্থানে স্থানে ক্ষয়ে সুরকি ঝরে যাওয়া প্রাচীন দেয়াল।

গেটের কপাট খোলাই। আমি ও নন্দিনী ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরের সরু গলিটা পার হতেই বাড়ির সান বাঁধানো উঠানে একজন খালি গা হাড্ডিসার লোককে বালতি থেকে মগ ভর্তি পানি নিয়ে মাথায় ঢালতে দেখলাম। পরনে একটা ধুতি লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। ভদ্রলোক আমার ও নন্দিনীর দিকে একবার একটু মুখ ফিরিয়ে দেখেও তেমন গা করলেন না। আবার মগভর্তি পানি মাথায় ঢালতে লাগল।

আমি নন্দিনীকে বললাম, এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে হয়।

জিজ্ঞেস করতে হবে না। ইনি অনুপদা। আমার পিসতুতু ভাই। চিনতে ভুল হচ্ছে না। স্বাস্থ্যটা মনে হয় একদম খুইয়ে বসেছেন।

নন্দিনীর অনুচ্চ কথাগুলোও সম্ভবত ভদ্রলোকের কানে গেছে। মগটা বালতির ভেতর রেখে তিনি নন্দিনীর দিকে ফিরলেন, কে আপনারা? কোত্থেকে এসেছেন?

আমাকে চিনতে পারছ না অনুপদা, আমি নন্দিনী। পাকিস্তান থেকে এসেছি। পিসিমা কোথায়? অঞ্জু, দীপু এদের দেখছি না যে?

ভদ্রলোক নন্দিনীর কথায় কিছুক্ষণ অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে আমার ও নন্দিনীর দিকে তাকাতে লাগলেন। চমক ভাঙলে অকস্মাৎ বলে উঠলেন, তুই নন্দিনী, হাবুল মামার মেয়ে নন্দিনী? সীমার বোন?

তার কথায় নন্দিনীর বাঁধ ভেঙে গেল। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তার স্নানরত গুরুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে অনুপ বাবু ভেজা শরীরেই নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরলেন, তোরা বেঁচে আছিস বোন? সীমা কোথায়? তার জামাই?

সীমাদি নেই অনুপদা। আগরতলা ঢোকার পথে পাক হানাদারদের গুলীতে মারা গেছে। আর জামাইবাবু ২৫শে মার্চের আগেই ঢাকায় গিয়েছিলেন। ফেরেন নি। তার খোঁজখবর জানি না। বোধহয় বেঁচে নেই।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল নন্দিনী। এদিকে এদের কান্না ও কথোপকথন শুনে আশপাশের বিভিন্ন কামরা থেকে বেশ কয়েকজন নারী- পুরুষ বেরিয়ে এসেছে। আমি হাতের সিগ্রেট ফেলে দিয়ে কী করব ভেবে না পেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবনে এমন মিলন দৃশ্য আমি আর দেখি নি। অনুপ বাবু নন্দিনীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মেয়েদের মত বিলাপ করছেন, মা নেই, অঞ্জি পালিয়ে বেঁচেছে, তুই এই শ্মশানের আগুনে আরও সর্বনাশের খবর নিয়ে কেন এলি হতভাগী?

এসময় আমার পেছনের একটি ঘর থেকে নন্দিনীর বয়েসী একটি মেয়ে এলোচুলে ছুটে বেরিয়ে এদের মধ্যে পড়ল, কে এসেছে দাদা?

মেয়েটির ব্যাকুল প্রশ্নে নন্দিনী ও অনুপবাবু যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি নন্দিনীকে বুক থেকে আলগা করে মেয়েটিকে বললেন, চিনতে পারছিস না দীপু, এ আমাদের হাবুল মামার মেয়ে নন্দিনী। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। আগে এদের ঘরে নিয়ে যা। আমি একটু জল ঢেলে এক্ষুণি আসছি।

মেয়েটি এগিয়ে এসে নন্দিনীর হাত ধরে বলল, এসো। আমি দীপালি। খুব ছোটো বেলায় তুমি একবার এ বাড়িতে হাবুল মামার সাথে এসেছিলে। আমি আর অঞ্জ তোমাকে নিয়ে সারা কলকাতায় কত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। মনে নেই?

খুব মনে আছে দীপুদি। পিসিমা কবে মারা গেলেন?

গত ফেব্রুয়ারিতে। ক্যানসার হয়েছিল।

জবাব দিল দীপালি। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ইনি বুঝি তোমাকে নিয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ দীপুদি। ইনি আমার বন্ধু। বিখ্যাত কবি, হাদী মীর। এর সাথেই আমরা ভৈরবের কাছে নারায়ণপুর বাজার থেকে রওনা দিই। পথে সীমাদির গায়ে গুলী লেগে মারা গেলে আমি এর বোনের আশ্রয়ে আগরতলায় এসে উঠি। এর ভগ্নিপতি বাংলাদেশ সরকারের বড় কর্মকর্তা। এখন পর্যন্ত এদের সাথে পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে এসে উঠেছি। বলল নন্দিনী।

দীপালি আমার দিকে ফিরে বলল, আসুন ভেতরে।

আমি ও নন্দিনী দীপালির পেছন পেছন এদের ঘরে এসে ঢুকলাম। দু কামরার একটা পুরানো বাসা। সামনের ঘরে একটা খাটের পাশে ছোট্ট টেবিল পাতা। একটিমাত্র চেয়ার পাশে। নোংরা দেয়াল। নোনাধরা সুরকির প্লাস্টার খসে পড়ছে। খাটের মাথার দিকে দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের যুগল বাঁধানো ছবি। ছবির গায়ে শুকনো মালা। ধুলোবালি মাখা ধূসর কড়িবর্গাঅলা ছাদ। ছাদ থেকে নেমে আসা একটা লোহার রডে নিস্তব্ধ আদিম বৈদ্যুতিক পাখা ঝুলছে। খাটের ওপর ময়লা রং ওঠা বেড কভারে ঢাকা বিছানা। বোঝা যায় একটা দীনহীন পরিবেশে প্রবেশ করেছি।

আমি চেয়ারটায় এসে বসলাম। দীপালি এখনও নন্দিনীর হাত ধরে আছে। আমি আগ বাড়িয়ে বললাম, আপনি একে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কথা বলুন। আমরা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্য থেকে দেশ ছেড়ে এসেছি। ওর হয়ত আপনাদের মতো আপনজনদের কাছে অনেক কিছু বলার আছে।

ওর কথা পরে শুনব। আগে আপনাকে এককাপ চা দিই।

আমি বললাম, দিন।

দীপালি নন্দিনীকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেলে স্নান সেরে অনুপ বাবু মাথা মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব। আমার বোনটিকে আপনি এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন।

আমি হাসলাম, নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ দিন। কিন্তু তাকে এখানে আপনার বোঝা হিসেবে রেখে যেতে চাই না। নন্দিনী এখন আমাদের পরিবারেরই একজন। সে শুধু তার একমাত্র পিসিমাকে সীমাদির মৃত্যুর খবরটা পৌঁছে দেবে বলে এসেছে।

আমার কথার মধ্যেই নন্দিনী এসে ঘরে ঢুকল, আমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাই কবি। বহুকাল পরে এসেছি। এদের ওপর দিয়েও কম ঝড় বয়ে যায় নি। এইমাত্র দীপুদি বলল অঞ্জুদি কিছুদিন আগে একটি মুসলমান হকার ছেলেকে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে হাওড়া চলে গেছে। এরা অঞ্জুদির সাথে, তার বরের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়। কিন্তু অঞ্জুদি লজ্জায় আসতে চায় না। আমার বিশ্বাস, আমি এদের লজ্জা ভাঙিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারব।

আমি বললাম, নন্দিনী তুমি থাকতে চাইলে আমি কী আর বলতে পারি?

রাগ করলে?

না।

আমি কাল সকালে দীপুদিকে নিয়ে উডস্ট্রীটে যাব। ইমাম সাহেব আর পারুলকে আমি বুঝিয়ে বলব।

কাল ইমামরা হোটের ছেড়ে পার্ক সার্কাস এলাকায় চলে আসবে।

জানি। সে জন্যই খুব সকালে গিয়ে হাজির হব।

নন্দিনী এমনভাবে বলছে, মনে হল, তার মনের মধ্যে একটা স্বনির্ভর সিদ্ধান্ত আছে। দীপালি ততক্ষণে চা আর একটা প্লেটে সন্দেশ এনে টেবিলে রাখল। আমি বললাম, আপনার বোনকে আমি এখানে রেখে যাব ভাবি নি।

হয়ত ও নিজেই ভাবে নি এ বাড়িতে আমরা এখনও আছি। তাছাড়া আমার মা ছিলেন খুব রক্ষণশীল। একটি মুসলমান ছেলের সাথে সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে দেখলে মা হয়ত ওকে ঘরে ঢুকতেই দিত না। মা নেই ভালোই হয়েছে। তা না হলে তার নিজের মেয়েই মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে সুখে আছে শুনলে মরমে মরে যেত।

আপনাদের বুঝি এখন আর সে সংস্কার নেই?

আমাদের কেন, এ শহরে কেইবা এখন জাতপাত মানে? ঐ দেখুন আমার দাদা, অঞ্জুদির ভালবেসে গৃহত্যাগের কথা শুনে কেঁদেকেটে দুচোখ ভাসিয়ে দিলেন। এখন প্রতিদিন শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে অঞ্জুদির বরের সাথে চা- বিস্কুট খেয়ে আসেন। বলেন, ছেলেটি নাকি খুব ভদ্র আর শিক্ষিত। বোনের পছন্দের তারিফ করেন। বলেন, এমন একজন ধার্মিক ভগ্নিপতি পেয়ে তিনি ধন্য। সময়ই সব বদলে দিচ্ছে।

বলল দীপালি।

আমি সন্দেশ ও চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম, আজ তাহলে উঠি। কাল দেখা হবে।

অনুপবাবু বললেন, দাঁড়ান আপনাকে গলির মাথায় রেখে আসি।

আমি পকেট থেকে পারুলের দেওয়া খামটা বের করে নন্দিনীকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, খামটা রাখো। আমার কাছে হোটেলে যাওয়ার মতো ট্যাকসি ভাড়া আছে। নন্দিনী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী ভেবে যেন খামটা নিল। আমি অনুপ বাবুর সাথে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

০৬. রাস্তায় বেরিয়ে মনস্থির

রাস্তায় বেরিয়ে আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না এখন কোথায় যাব। অনুপদা আমাকে গলিটা পার করে কোথায় গিয়ে ট্রাম চাপব বুঝিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন। আমি হাঁটতে হাঁটতে একটা ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়ালাম। কেন যেন মনে হল সুতারকিন স্ট্রীটে আনন্দবাজার অফিসে গেলে অনেক লেখক বন্ধুর সাথে আমার দেখা হবে। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যাদের সাথে আমি কবিতা লেখা শুরু করেছিলাম হয়ত এদের অনেকের সাথেই আমার সাক্ষাৎ হবে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে অন্তত চাক্ষুষ দেখতে পাব। এদের সাথেই আমি একদা কবিতা পত্রিকা ও কৃত্তিবাসে লেখা শুরু করেছিলাম। এখন তো ওরাই পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক। আনন্দবাজারের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানে এখন এরা কর্মরত। হয়ত সেখানে গেলে এরা আমাকে

আমার এই দিশেহারা অবস্থায় কোনো সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া যে কোনো অবস্থায় থাকি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমার কিছু লেখা উচিত। হয়ত আমার রচনা যে কোনো রাজনৈতিক বক্তার বক্তব্যের চেয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে।

ট্রাম স্টপেজ দাঁড়িয়ে নানা চিন্তায় মনটা ভার হয়ে এল। হামিদা, আমার স্ত্রী এই কালকাতাতেই কিংবা এর আশেপাশে কোথাও কোনো সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আছে। আট নম্বর থিয়েটার রোডে গেলেই তার হদিস বের করা অসম্ভব হবে না। অথচ আমার মন সেদিকে যেতে চাইছে না কেন তবে কী আমি হামিদাকে ভালবাসি না? নন্দিনীর প্রতি আমার এই পক্ষপাত কী তবে অপরাধ? অবৈধ শারীরিক আকর্ষণ মাত্র? নাকি সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে আমি এই দুটি নারীকেই ভালবেসে ফেলেছি? দুটি নারীর প্রতি এক পুরুষ- আত্মার ভালবাসা কী পাপ? ধর্মীয়ভাবে এর সমর্থন আছে, তা আমি জানি। কিন্ত ধর্মের সমর্থন আমি খুঁজছি কী তবে আমার ব্যক্তিগত লোভকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক সমাধান দিতে?

এসব এলোমেলো চিন্তার মধ্যে স্টপেজে ট্রাম এসে দাঁড়ালে আমি তাতে উঠে পড়লাম। আমিও জানি না এ ট্রাম কোথায় যাবে? খালি সীট পেয়ে আমি বসে পড়লাম। পাশের সীটের যাত্রীকে বললাম, আমি সুতারকিন স্ট্রীটে যাব। সামনে কোথায় গিয়ে নামলে আমার সুবিধে হবে?

এ্যাসপ্লানেড।

এ ট্রাম কী এ্যাসপ্লানেড যাবে?

হ্যাঁ। আপনি ঠিক ট্রামেই উঠেছেন। আপনি জয় বাংলার লোক?

হ্যাঁ।

আপনারা কী পাকিস্তানের সাথে পেরে উঠবেন?

সাড়ে সাত কোটি মানুষ ওদের সাথে না থাকতে চাইলে মেরে কেটে কত দিন রাখবে?

এটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। তবে দেখবেন পাকিস্তানী তাড়িয়ে আবার মাড়োয়ারিদের পাল্লায় পড়বেন না।

লোকটার কথায় এবার আমি তার দিকে ভালো করে দেখলাম। মধ্য বয়ক অভিজ্ঞ বাঙালি ভদ্রলোক। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। পরনে ধুতি- পাঞ্জাবি। গায়ের রং বেশ ফর্সা। আমি

বিহ্বলের মতো তাকিয়ে আছি দেখে ফের বললেন, দেখুন না কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গকে মাড়োয়ারিরা কবজা করে নিয়েছে। কলকাতা প্রকৃতপক্ষে আর বাঙালিদের শহর নেই, বুঝলেন, একটু সাবধান থাকবেন।

ভদ্রলোকের কথা ফুরোবার আগেই ট্রামটা অন্য এক স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে।

আচ্ছা, নমস্কার আসি। সামনের আরও একটা স্টপেজ পার হলেই চৌরঙ্গী, এ্যাসপ্লানেড।

বলতে বলতে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। কন্ডাকটর আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে টিকেট দিল। আমি এ্যাসপ্লানেডে ঢোকার মুখে চৌরঙ্গীতে নেমে একটা ট্যাকসি ধরলাম।

বেলা তিনটার দিকে আমি সুতারকিন স্ট্রীটে আনন্দবাজার অফিসের সামনে এসে নামলাম। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে পত্রিকা অফিসের কাউন্টারে কাঁচের এপাশ থেকে দেখলাম বিশাল গোফলা এক রিসেপশনিস্ট অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে আগন্তুকদের সাথে কথা বলছে। আমি দর্শনার্থীদের ভিড় থেকে আলাদা হয়ে এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম না আমি কার সাথে দেখা করার কথা রিসেপশনের স্লিপে লিখব। শক্তি না সুনীলের? এখনও আমার দ্বিধা কাটছে না। এরা কী সত্যি এতদিন পরেও আমার নাম মনে রেখেছে? যদি দেখা না করতে চায়?

এসময় রিসেপশনের গোঁফঅলা ভদ্রলোক হাতের ইশারায় আমাকে কাছে যেতে ডাকলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার নাম সৈয়দ হাদী মীর। সুনীর গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে চাই।

ভদ্রলোক আমার কথা শেষ হওয়ামাত্রই টেলিফোন তুললেন। অপর প্রান্তের সাথে তার কী কথা হল আমি বুঝতে না পারলেও টেলিফোন রেখে দিয়ে বলরেন, যান।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে রিসেপশন হয়ে ভেতরে লিফটে এসে দাঁড়ালাম। লিফট চালককে সুনীল বাবুর কথা বলতেই সে বোতামে চাপ দিল। লিফট এসে নির্দিষ্ট তলায় থামলে সে আমাকে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে যেতে বলল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাঁ দিকে একসারি কামরা পার হয়ে এগোতে লাগলাম। শেষে বাইরে টুলের ওপর বসে থাকা একজন পিয়নের দেখা পেতেই সুনীল বাবুর কামরাটা দেখিয়ে দিতে বললাম। ছেলেটি উঠে এসে আমাকে সুনীলের কামরায় পৌঁছে দিয়ে বলল, ভেতরে যান। বাবু ভেতরে আছেন।

আমি ভেতরে প্রবেশ করেই সুনীল বাবুকে সামনে পেলাম। আমি এর আগে কখনো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে চাক্ষুষ দেখি নি। অথচ কৃত্তিবাস সম্পাদনার সময় তার সাথে কত চিঠিপত্র

আদান-প্রদান ও বাংলাদেশের কবিতা সম্বন্ধে মতো বিনিময় হয়েছে। একবার তিনি আমার কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে তার প্রিয় কবিদের তালিকায় তিনি আমার নামও লিখে রেখেছেন। এই তো এখন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার সামনে। তার মুদ্রিত ছবি আমি এর আগে কোনো কোনো পত্র পত্রিকায় দেখেছি বলেই এখন তাকে চিনতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। আমাকে দেখেই হাত থেকে কলম রেখে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আপনি হাদী মীর? কখন, কীভাবে বর্ডার ক্রস করলেন? গতকালই তো আপনার নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে কবি শঙ্খ ঘোষ অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে একটি প্রতিবেদন পাঠ করলেন। বসুন। আপনার পরিবার-পরিজন কে কোথায়? তারা সবাই ঠিকমত আছে তো?

আমি বললাম, যতটুকু জানি আমার পরিবার-পরিজনের এখনও তেমন কোনো বিপর্যয় ঘটে নি। ঢাকা থেকে বেরুবার আগেই স্ত্রীর সাথে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। শুনেছি তিনি নিরাপদেই এখানে, এই শহরে এসে পৌঁছেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত আছেন। এখনও তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে নি। আশা করছি, দুএকদিনের মধ্যেই তার সাথে দেখা হবে। আমি ও আমার এক বোন, ভাগ্নি এবং ভগ্নিপতি গতকাল কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। বোনের জামাই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বড় কর্মকর্তা, সচিব। এখন উডস্ট্রীটে একটি আর্মেনিয় হোটেলে উঠেছি। আগামীকাল ভারত সরকারের সহায়তায় পাওয়া পার্ক সার্কাসের একটা বাড়িতে গিয়ে স্থায়ীভাবে উঠব।

আমি তো ভাবতেই পারছি না আপনি পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছেন। আমার সামনে সৈয়দ হাদী মীর? এটা সত্যি এক অভাবনীয় ঘটনা। আমাদের ভয় ও আফসোস ছিল আপনারা সবাই হয়ত পাকিস্তানী হানাদারদের গুলিগোলায় মারা পড়েছেন কিংবা সামরিক ক্যাম্পে আটক।

আনন্দমিশ্রিত বিহ্বল কণ্ঠে সুনীল বললেন। আমি বললাম, আপনার আন্দাজ একেবারে মিথ্যে নয়। তবে প্রথম আঘাতটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাকামী ছাত্রছাত্রী ও রাজনীতিকদের ওপর দিয়ে গেছে। সাংবাদিকদের ওপরও। ইত্তেফাক অফিসটিকে আমার চোখের সামনে গোলার আঘাতে জ্বলতে দেখেছি। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে ঢাকার একমাত্র পুলিশ অবস্থানকে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। আসার সময় পথে-প্রান্তরে কত যে নিরীহ মানুষের লাশ আর জ্বালিয়ে দেয়া গ্রাম দেখে এসেছি তার হিসেব নেই। শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। জানি না আমাদের এই দলে দলে ভারতে পালিয়ে আসার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিণাম কী হবে। ভারতই বা এই বিপুল উদ্বাস্তুর ভার কীভাবে সইবে? কতদিন সইবে?

এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না। চলে যখন এসেছেন একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। বললেন সুনীল।

আমি বললাম, আপনি আমাকে তুমি করেও বলতে পারেন। আপনি আমার থেকে পাঁচ ছবছরের বড়ই হবেন।

ঠিক আছে তুমিই বলব। তোমার তো একটা নতুন কবিতার বই বেরুবার কথা ছিল। বেরিয়েছে?

না। কম্পোজ হয়েছিল। প্রুফের ফর্মাগুলো সাথে নিয়ে এসেছি। হোটেলে আছে।

ভালই হল। এখান থেকেই বেরুবে। তুমি পান্ডুলিপি তৈরি করে আমাকে এনে দিয়ে যেও। তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো?

আমি বললাম, আছে। প্রকৃতপক্ষে আমি বা আমার বোন- ভগ্নিপতির তেমন অসুবিধে নেই।

খুব ভালো কথা। এখন তাহলে তোমার স্ত্রীর খোঁজখবর নিয়ে শান্ত হও। লেখালেখি শুরু করে দাও। অচিরেই আশা করছি তোমাদের দুর্ভোগ কেটে যাবে। হতাশ হবার কিছু নেই। আমরা মানে আমি তোমাকে দেখব।

সুনীলদার কথায় আমার দুচোখ পানি বেরিয়ে এল। ভারতে প্রবেশের পর এই প্রথম একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সুপরিচিত ব্যক্তির প্রকৃত সহানুভূতির কথা শুনে মনে হল আমি অনাত্মীয় পরিবেশে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ি নি। এখানেও লেখক হিসেবে স্বাধীন মর্যাদা থাকবে। আমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমার কলমকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারব।

আমি বললাম, সুনীলদা আপনার কথায় সাহস পাচ্ছি। মনে হচ্ছে লিখতে পারব। এই কয়দিন ঢাকা থেকে বেরিয়ে পথে- প্রান্তরে মানুষের প্রতি মানুষের যে নিষ্ঠুরতা আর পাশবিকতা দেখে এসেছি তাতে মনে হয়েছিল বুঝি কবিতার আর মূল্য থাকবে না। মানুষের সর্বপ্রকার সুকুমার বৃত্তিরই বুঝি অবসান ঘটে গেছে। এখন আপনার সাথে কথা বলে মনে হচ্ছে, আমার ধারণা বোধ হয় একপেশে।

সুনীলদা হাসলেন, কবিদের প্রকৃত কাজ বন্দুকবাজরা যদি শেষ করতে পারতো তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীরাই সব শেষ করে দিয়েছিল। তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের রবীন্দ্রনাথকে আবার পুনরুজ্জীবিত করল। এটাই কী বড় প্রমাণ নয় যে মানুষের সুকৃতি কখনো পরাজয় মানে না?

সুনীল বললেন।

আমি বললাম, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে পরিচিত হতে চাই। তিনি তো আনন্দবাজারেই আছেন জানি।

হ্যাঁ। এখানেই। আনন্দবাজারের ছোটদের বিভাগ দেখেন। আগে একটু চা খাও। আমি শক্তিকে খবর দিচ্ছি। এখানে আরো তোমার পরিচিতজনেরা আছেন। সবার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে।

তাছাড়া ঢাকার একজন লেখক তা বেশকিছু দিন যাবতই কলকাতা প্রবাসী। বেলালকে চেনো? বেলাল চৌধুরী?

আমি বললাম, হাঁ চিনি বৈকি।

তাকেও তোমার আগমন বার্তা জানিয়ে দেব। তোমার খুঁজে বের করতে হবে না। খবর পেরে সেই তোমাকে খুঁজে বের করবে।

বলে তিনি কলিং বেল টিপলেন। একজন পিয়ন ঘরে এসে ঢুকলে বললেন, চা দাও। আর শক্তিবাবুকে বল বাংলাদেশ থেকে আমাদের বন্ধু নাম হাদী মীর এসেছেন। আমার সামনে আছেন।

লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন, কই, আপনিই হাদী?

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সুনীল বললেন, এই যে শক্তি। ইনি হাদী মীর।

আমি শক্তি বাবুর বাড়িয়ে দেয়া হাতখানা চেপে ধরলাম, আপনি আমার প্রিয় কবি।

আরে হাদী, তোমার কবিতা আমার যা ভালো লাগে না, ওসব কী মুখে বলে কোনো কবিকে বোঝানো যায়? বল ভাই, কীভাবে এলে? আসতে কোনো কষ্ট পাও নি তো? আমাকে তুমি বলে ডাকো। তোমার বন্ধুত্ব চাই হাদী। তোমার আত্মীয়তা চাই।

শক্তির কথায় আমিও কেমন যেন হয়ে গেলাম। তার সাথে কোলাকুলি করতে গিয়ে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললাম। যেন বহুদিন প্রবাস যাপনের পর দুই সহোদরের সাক্ষাৎ ঘটেছে। আমাদের পরস্পরের আলিঙ্গন মুহূর্তে কখন যে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এখানকার পরিচিত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ বুঝতে পারি নি। আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়েই দেখি গৌরকিশোর ঘোষ ও নীরেন চক্রবর্তী শক্তির সাথে আমার কোলাকুলির দৃশ্যটি উপভোগ করে হাসছেন। সুনীল এদের দুজনের সাথেই আমার পরিচয় করিয়ে দিলে আমি গৌরকিশোরকে বললাম, আপনি সত্যযুগ পত্রিকায় আমার প্রথম লেখা ছেপেছিলেন। এতদিন পর আপনাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি লাগছে।

জানি। তোমার আসতে কষ্ট হয় নি তো? বললেন গৌরকিশোর।

কষ্ট- লাঞ্ছনা একটু হয়েছে। তবে আল্লাকে ধন্যবাদ শেষপর্যন্ত এসে এখানে পৌঁছেছি।

তোমার স্ত্রী?

তিনিও এসেছেন অন্যপথে। আমার সাথে এখনও সাক্ষাৎ হয় নি। অচিরেই দেখা পাওয়ার আশা করছি।

কোথায় উঠেছ?

আপাতত একটা হোটেল।

আমার জবাবের সাথে সাথেই সুনীল সকলকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, হাদীর ভগ্নিপতি এ্যাকজাইল বাংলাদেশ সরকারের বড় কর্মকর্তা। আপাতত ওর কোনো অসুবিধে নেই।

সুনীলের কথায় সকলেই আশ্বস্ত হল। সকলেই আমাকে ঘিরে বসে চা পানে যোগ দিলেন। আমি আগরতলার পথে যেভাবে ভারতে প্রবেশ করেছি সব খুলে বললাম। নন্দিনীদের কথাও। সীমাদির করুণ মৃত্যুর কথা শুনে এরা স্তম্ভিত হয়ে থাকল। শুধু নন্দিনীর ওপর অত্যাচারের কাহিনী আমি মুখে ফুটে বলতে পারি নি। কেন যেন মনে হল এতে আমার দুর্দিনের সঙ্গিনীর অপমান হবে। গৌহাটিতে পাওয়া ব্যাগটার কথাও চেপে গেলাম।

আমার দুর্ভোগপূর্ণ পদযাত্রা ও সীমান্ত অতিক্রমের বিবরণ শুনে সকলেই সহানুভূতি জানালেন। সকলেই আবার মনস্থির করে লেখালেখিতে মনোযোগ দিতে পরামর্শ দিলেন। সকলেই আমাকে কোনো না কোনো ভাবে সাহায্য করতে চান দেখে মনটা ভরে গেল। আমি দৃঢ়তা ও সাহসে উজ্জীবিত হয়ে আনন্দবাজার অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যায় হোটেলে পৌঁছে সিঁড়ির ওপর মিতুকে পেলাম। আমাকে দেখে মিতু দ্রুত ছুটে এসে আমার হাত ধরল, এই যে মামা। আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন? নন্দিনী ফুপু কই?

তোমার নন্দিনী ফুপু ভবানীপুর তার আত্মীয়দের বাসায় গেছেন। কাল সকালে আসবেন।

বলতে বলতে আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গেলে মিতু আমার হাত টেনে ধরে সিঁড়ির মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল।

দাঁড়ান না মামা। আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললাম, আমার জন্য সারপ্রাইজ?

হ্যাঁ।

বেশ এখন তোমার সারপ্রাইজটা বলে আমাকে কাঠ বানিয়ে দাও তো মা।

না! অমনি বুঝি খালি খালি হবে?

আমি বললাম, বারে খালি খালি হবে কেন? তোমার ডিমান্ডটা শুনলে তো ব্যবস্থা করতে পারি।

সত্যি মামা?

সত্যি!

তাহলে আমার ডিমান্ডটা হল আগামী রোববার আমাকে ম্যাটেনি শো সিনেমা দেখাতে হবে। রিকুয়েল ওয়াজের দারুণ একটা এ্যাডভেঞ্চার ছবি চলছে চৌরঙ্গীর একটা হলে। মামা, রাজি?

আমি বললাম, চোখ বন্ধ করে রাজি।

তবে চোখ বন্ধ করে ওপরে ওঠে যান। আমাদের কামরায় গিয়ে চোখ মেলবেন। দেখতে পাবেন জিনসের প্যান্ট আর খাকি রংয়ের পুলওভার পরা এক মুক্তিযোদ্ধা আমার মায়ের সঙ্গে চা পান করছে। নাম মীর হামিদা বানু বেগম। কী মামা সারপ্রাইজ না?

আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরতে চায় না। আমি মিতুর সামনে হকচকিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বললাম, সত্যি সারপ্রাইজ মিতু, তোর মামি কখন এসেছেন?

তিনটের দিকে। আব্বার অফিসে এসেছিলেন। সেখান থেকে আব্বা গাড়িতে করে মামানিকে বাসায় নিয়ে এসেছেন। প্যান্ট আর পুলওভারে মামানিকে যা সুন্দর মানিয়েছে না, ওপরে গিয়ে দেখুন।

মিতুর কথায় সত্যি আমি যেন কাঠ হয়ে গেলাম। যেন তুলতে ভুলে গেছি কিংবা কেউ মন্ত্র বলে সিঁড়ির ওপর আমার পা দুটিকে জুতো সুদ্ধ পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে।

আমার অবস্থাটা মিতুকে আবার কৌতূহলী করে এই ভয়ে আমি খুব অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, চল তো মা ওপরে গিয়ে তোমার মুক্তিযোদ্ধা মামিকে কনগ্রেচুলেট করি।

তাড়াতাড়ি চলুন মামা।

বলেই মিতু আমার হাত ধরে টেনে ওপরের দিকে চলতে লাগল। অগত্যা আমি মিতুর সাথে নিঃসাড় মানুষের মতো চলতে লাগলাম।

ইমামদের কামরার দরজায় এসে আমরা একটু দাঁড়ালাম। আমি ঠিক স্বাভাবিক ছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে আমার পা দুটিতে এক ধরনের কম্পন অনুভব করছিলাম। এক ধরনের অপরাধবোধই আমাকে কাঁপাচ্ছিল। আমি হামিদার সামনে যাচ্ছি। যাকে আমি একদা আন্তরিক প্রেমের মধ্যেই নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। পারিবারিক বোঝাপড়া নয়, ভালোবেসে বিয়ে। তাছাড়া এমন কোনো কারণও ঘটে নি যাতে হামিদার প্রতি প্রেমে কোনো সন্দেহের ছিটা লাগতে পারে। লাগলেও হামিদা তা জানে না। নন্দিনীর সাথে দৈব যোগাযোগের কথা হামিদা এখনও জানে না। জানলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা অজানা। হামিদাকে সব কথা খুলে বলার সাহস কী আমার আছে? না, নেই। তবুও হামিদা মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ পরিস্থিতির দুর্দৈব সম্বন্ধে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। তাছাড়া আমার স্ত্রীর উচ্চশিক্ষা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী। কিন্তু নন্দিনীর সাথে দৈবাৎ সাক্ষাৎ ঘটলেও আমার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে এর কী ব্যাখ্যা আছে আমার কাছে? আমি কী নন্দিনীকে বলি নি আমি তাকেও ভালবাসি? আমি কী তবে কোনো সাময়িক প্রলোভনে নন্দিনীকে স্তোকবাক্যে বশীভূত করার জন্যে মিথ্যে বলেছি? নাকি অযৌক্তিকতার ভয়ে আমি স্বীকার করতে চাইছি না আমি দুজনকেই ভালবাসি? একজন পুরুষের দুটি নারীকেই একই সাথে ভালবাসা কী পাপ? এর মধ্যে কী কোনো লাম্পট্য ও লজ্জা আছে? যদি তাই হবে, ইসলাম- আল্লার ধর্ম এ বিধান দিত না। আমার কী উচিত নয় যা সত্য তাই আমার স্ত্রীকে বলা?

একি মামা, দাঁড়ালেন কেন, ভেতরে যান না।

আমি দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছি দেখে মিতু অবাক।

আমি বললাম, দাঁড়া না, তোর মামিকে একটা সারপ্রাইজ দেয়ার আগে তোর মার সাথে তার কী আলাপ হচ্ছে একটু শুনে নিই।

আমার কথায় মিতুও মজা পেল। মুখের ওপর তর্জনী রেখে কপাটে কান পাতল। ফিসফিস করে বলল, ভেতরে খুব হাসাহাসি চলছে মামা। বেল টিপব?

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানলে মিতু বেল টিপল। কিছুক্ষণ পরেই ছিটকিনি খুলে পারুল কপাট ধরে দাঁড়াল, এই যে ভাই এসেছেন। আসুন। ভাবি কখন এসে বসে আছে। আপনার খোঁজ নেই। নন্দিনী আপা কোথায়?

সে তো ভবানীপুরে তার আত্মীয়ের বাসায় আজ থাকবে। আগামীকাল সকালে আসবে বলেছে। শুনলাম তোর ভাবি এসেছে?

হ্যাঁ। আসুন ভেতরে।

পারুল কপাট ছেড়ে সরে দাঁড়ালে আমি ভেতরে ঢুকেই হামিদার সামনে পড়ে গেলাম। হামিদা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আরে তুমি তো দারুণ পুলওভার পরেছ? কেমন আছ?

ভাল। তুমি কেমন?

ভালই।

শুনলাম পথে নাকি দারুণ দুর্ভোগ পুহিয়েছ। ভৈরবের উদ্দেশ্য রওনা হয়েছ শুনে খুব দুঃশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সূত্রে তোমার আগরতলা পৌঁছার সংবাদ পাই। আরও পরে জানতে পারি তুমি আগরতলায় পারুলদের সাথে ভাল আছ। আমি যোগাযোগের খুব চেষ্টা করেছি, বিশ্বাস করো।

বলল হামিদা।

আমি বললাম, এসব কথা এখন থাক। আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি নিরাপদে এখানে পৌঁছেছ। বসো।

হামিদা বসল।

পারুল বলল, ভাইকে এক কাপ চাপ দিই।

আমি বললাম, শুধু চাতে এখন চলবে না পারুল। দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি। চায়ের সাথে থাকে তো যৎসামান্য নাস্তাও দরকার।

কি কাণ্ড আপনি দুপুরে কিছুই খান নি?

ভবানীপুর থেকে আনন্দবাজার অফিসে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধুদের সাথে দেখা হল। সেখানে অবশ্য চা- নাস্তা খেয়ে খিদে মরে গিয়েছিল। এখন আবার ভুক লেগেছে।

বললাম আমি। পারুল মিতুর দিকে ফিরে বলল, যাতো, নিচে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় তো এখন হ্যাভি কিছু পাঠাতে পারবে কিনা? স্যাণ্ডউইচ থাকলেও চলবে।

মিতু বলল, আমি দেখছি নিচে গিয়ে। তুমি বরং রুম সার্ভিসে টেলিফোনে একটু বলে দাও।

পারুল রিসিভার তুলল।

আমি এই অবসরে হামিদাকে আড় চোখে একটু দেখে নিলাম। জলপাই রংয়ের ফাঁপানো পুলওভারে তাকে চমৎকার লাগছে। মিতু ঠিকই বলেছিল। এ পোশাকে হামিদাকে যে কোনো পরিচিতের পক্ষেই চেনা মুস্কিল হবে। আমি তাকে দেখছি এটা সম্ভবত হামিদা আন্দাজ করতে পেরে মুখ ফিরিয়ে তার স্বভাবসুলভ সলাজ হাসি আড়াল করার জন্যে একটু কাত হয়ে আছে।

এসময় পারুল রিসিভার রেখে আমার দিকে ফিরে বলল, পুরো লাঞ্চ না হলেও ভাত, মাটন আর ডাল পাওয়া যাবে। আমি কবি ভাইয়ের ঘরে খাবারটা পাঠিয়ে দিতে বলেছি। ভাই ভাবিকে নিয়ে গিয়ে সেখানে হাতমুখ ধুয়ে চারটা খেয়ে নিন। রাতে খাওয়ার সময় সকলে একসাথে খাব। ইমাম একটু জরুরি কাজে বেরিয়েছে। রাত সাড়ে আটটায় ফিরবে। ভাবি তো আজ থাকছেনই, কী ভাবি?

হামিদা কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নুইয়ে নিঃশব্দে হাসল। পারুল হামিদার এই মিষ্টি লাজুকতায় একটু মজা পেয়ে টিম্পনী কাটতে ছাড়ল না, কি নতুন বৌ- এর মতো এমন ঢং করছ কেন? ট্রেনিং নিয়েও দেখছি বৌ ভাবটা যায় নি?

ট্রেনিং শেষ করলেও মোটিভেশনটা এখনও চলছে কিনা। আগে সেটা শেষ করতে দাও।

ওরে বাপরে, তখন তো তুমি পুরোপুরি ফ্রীডম ফাইটার বনে যাবে। তখন স্বামীর বুকেও রাইফেল তুলতে বাঁধবে না, কী বল?

জোরে হাসল পারুল।

হামিদা ও আমি পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলাম।

এসময় মিতু ছুটে এসে বলল, মামা আপনার ঘরে দুজনের খাবার পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

হামিদা বলল, দুজনের খাবার দিয়ে কী হবে? আমি তো দুপুরে ক্যাম্প থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলাম।

ঠিক আছে, আমার সাথে না হয় আরও দু এক লোকমা খাবে।

বলে আমি হামিদাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই হামিদা বলল, মহিলাটি কে?

কোন মহিলার কথা বলছ? ও নন্দিনীর? আসার সময় পথে পরিচয়। বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আমার সাথে এসেছে।

আমি যতটা পারি গলাটা হালকা করে জবাব দিলাম।

শুনলাম তোমাদের সাথেই থাকবে?

এখন আর থাকবে কিনা বলা মুস্কিল। এতদিন বিপন্ন অবস্থায় আমাদের সাথেই থাকার কথা বলত। এখন অবশ্যি ভবানীপুরে তার আপনজনদের খোঁজ পেয়েছে। তারা তাকে ফেলে দেবে বলে মনে হয় না। আর যদি ফেলেই দেয় আমি, মানে আমরা অর্থাৎ পারুলরা তাকে ফেলে দিতে পারবে না। আমি নন্দিনীকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি হামিদা।

কী ব্যাপার তোমার খুব খাতির যত্নের মধ্যেই আছেন বলে মনে হচ্ছে?

হামিদার কথায় তীব্র সন্দেহের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল।

আমি বললাম, তোমার কথা মিথ্যে নয়। নন্দিনীর ওপর যে ধরনের নির্যাতন গেছে আমি এর নিরুপায় সাক্ষী। আমার উচিত ছিল প্রাণ দিয়ে তার সম্ভ্রম রক্ষা করা। আমি তা পারি নি বলেই একটা কর্তব্যবোধের তাড়না আছে।

সে তাড়নাটা কিন্তু নিজের স্ত্রীর জন্য একবারও বোধ কর নি। এ পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস কর নি, পঁচিশে মার্চের রাতে একদল পলায়নপর ছাত্রছাত্রীর সাথে আমাকে পালাতে বলার পর আমি কীভাবে এখানে এসেছি? আমার ওপর দিয়েও তো তোমার নন্দিনীর মতই লাঞ্ছনা যেতে পারত। যদি যেত তখন কী করতে? আমাকে নিয়েও কী তখন প্রেমে ডগমগ খেতে, না লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে?

হামিদার এ ধরনের উত্তেজিত চেহারা আমার কাছে নতুন।

আমি কপাটের ছিটকিনি তুলে দেব কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না। শুধু মনে হল হামিদার কথার এখনই জবাব দেয়া অনুচিত হবে। আমি গলার স্বর নিচু করে বললাম, বিছানায় একটু শান্ত হয়ে

বস হামিদা। বেয়ারা এখনই খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকবে। খেয়েদেয়ে আগে তো আমার কথা শোনো। পরে না হয় তোমার যা বলতে ইচ্ছে করবে বলবে। তোমাকে কী পারুল কিছু বলেছে?

পারুলের দোষ দিও না তো। আমি ইমামের কাছেই তোমার বান্ধবীর বর্ণনাটা শুনেছি।

বর্ণনা মানে রূপের কথা শুনেই ভয় পেয়েছ?

আমি হাসলাম।

এ সময় কপাট ঠেলে ট্রে হাতে খাবার নিয়ে বেয়ারা ঢুকল, নমস্তে সাব। খানা।

আমি সামনের নিচু সেন্টার টেবিলটা দেখিয়ে বললাম, ওখানে রেখে দাও।

বেয়ারা দরজা ভেজিয়ে চলে গেলে আমি ছিটকিনি তুলে দিয়ে ফিরে এসে হামিদার হাত ধরলাম, আজ অন্তত ঝগড়া না করে আমার সাথে চারটা খেয়ে বিশ্রাম নাও। ইমামের কাছে শুনেছি পুরোপুরিভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছ এবং দেশের ভেতরে অপারেশন চালাতে যাচ্ছ। এ অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা আমরা কী সন্দেহহীন থাকতে পারি না?

আমার কথা শুনে হামিদা যেন পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে একবার দেখে নিল।

তবে আমাকে বল সন্দেহের কোন কারণ ঘটে নি।

আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারব না। বরং বলব সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অনেক কারণ ঘটেছে। তবুও তুমি আমার স্ত্রী। আমি তোমাকে ভালবাসি। নন্দিনী সম্বন্ধে আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতে চাই। এতে যদি তুমি ধৈর্য রাখতে পার ভালো কথা তা না হলে তোমার সিদ্ধান্ত তোমার কাছে।

আমি সব শুনতেই এসেছি।

বেশ। এখন তাহলে পোশাকটা পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে এস। শাড়ি পরবে?

আলনায় নন্দিনীর নতুন কেনা শাড়ি দুটোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। হামিদা বলল, শাড়িগুলো কার?

নন্দিনীর। পরবে?

না।

তাহলে পারুলের ঘর থেকে একটা চেয়ে নিয়ে আসি।

তোমার যেতে হবে না। আমিই আনছি।

বলে হামিদা দরজা খুলল।

আমি বললাম, দোহাই তোমার পারুলকে এ ব্যাপারে কোনো কিছু জেরা করো না।

আমাকে অত ছোট লোক ভেব না। অন্তত তোমার বোনের কাছে তোমাকে নোংরা করতে যাব না।

কপাট ভেজিয়ে দিয়ে হামিদা শাড়ি আনতে গেলো। আমি বুঝলাম হামিদা তার সহজাত আকুলতায় এমন কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে যা আমার পক্ষে অস্বীকারের জো নেই। আমি মনে মনে স্থির করলাম হামিদার কাছে কোনো কিছুই গোপন করব না। এতে যে দুর্ভাগ্যই নেমে আসুক এর সামনাসামনি দাঁড়াব।

আমি এগিয়ে গিয়ে ঘরের বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিলাম। বাতাসের সঙ্গে বিচিত্র ধরনের শব্দ তরঙ্গ এসে ঘরে ঢুকল। বাইরে গাড়ির শব্দের সাথে জমাটবাঁধা জনপদের অস্পষ্ট কলরব যেন এসে কানে শিরশিরানী তুলল। সূর্য নিশ্চয়ই এখন গড়ের মাঠের পশ্চিমপ্রান্তে অনেক দূর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে। উডস্ট্রীটের ওপরে ঝাউগাছগুলোর ধূলিধূসর পাতায় জমে থাকা আস্তরণে এখন পর্যন্ত সূর্যের তাম্বাভা রক্ত বর্ণের শেষ তাপটুকু বিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি টয়লেটে ঢুকে মুখে পানির ছিটা দিতে বেসিনে উবু হয়ে পড়লাম। কল খুলে চোখে পানির ঝাপটা দিতেই মনে হল, আহ্ কী আরাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে ফিরে এলাম। হাত মুখ মুছে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই আমার পেছনে হামিদার ছায়া পড়ল। গোলাপি রংয়ের টাঙ্গাইল শাড়ির সাথে সে রক্ত রংয়ের ব্লাউজ পরেছে। আমি চিরুনি ফেলে দিয়ে ফিরলাম, দারুণ।

কেবল দারুণ? কবি এখন কার্পণ্য কর না। আর একটু বাড়িয়ে বল। ভয় নেই তোমার নন্দিনী শুনতেও পাবে না।

আমি হেসে বললাম, না ঠাট্টা নয় দারুণ লাগছে। তৃতীয় কেউ থাকলে কবিত্ব করেই বলতাম, জাগুন জাগুন, পাড়ায় আগুন।

এবার হামিদাও হাসল, পারুলের কাছে শুনলাম পথে কুড়িয়ে পাওয়া দেবীটিও নাকি সুন্দরী। কখন ফিরবে দর্শন করে মন প্রাণ জুড়াতে চাই।

কাল সকালে আসবে।

জবাব দিলাম আমি। বুঝলাম নন্দিনীকে না দেখা এবং তার সামনে নিজেকে হাজির না করা পর্যন্ত হামিদা মনে শান্তি পাচ্ছে না। আমি বললাম, আগামীকাল নাস্তা সেরে আমরা হোটেল ছেড়ে পার্ক সার্কাসের একটা বাড়িতে গিয়ে উঠব। এর আগেই নন্দিনী দেখা করতে আসবে। তখন না হয় একহাত দেখে নিও।

ভয় করো না হাতাহাতি হবে না। ঐ স্বাদ মেটাবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা আছে আমার। সে কথা জানাতেই তোমার কাছে আসা।

ব্যাপারটা কী রকম?

আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটা বাহিনীর সাথে জড়িত। এর মধ্যে আমি শপথ গ্রহণ করেছি যে পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে হানাদার মুক্ত না হবে ততক্ষণ আমি আমার জান প্রাণ ইজ্জত দিয়ে হলেও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে এই লড়াই চলবে। অস্ত্রে, কৌশলে, সত্যে এবং প্রয়োজনবোধে মিথ্যেয় ক্রমাগত এদের আক্রমণ করে যাব। দেশমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সাংসারিক বন্ধন বা ব্যক্তিগত সম্পর্কে ফিরে যাব না।

তার কথা গুলি বেশ গুছিয়ে বলল হামিদা। তার কথার মধ্যে এবং মৃদু উচ্চারণ ভঙ্গিতে একটা বাড়তি দৃঢ়তা লক্ষ্য করে আমি বললাম, এ ধরনের শপথ নেওয়ার আগে কারো অনুমতি বা উপদেশ গ্রহণের সম্ভবত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন হয় না কী বল?

হয় কিনা আমি জানি না। হয়ত হয় না। তবে তোমার অনুমতি ছাড়া আমি একটা সামরিক ইউনিটে নাম লিখিয়ে মানসিক অনুশোচনায় ভুগছি। আমার স্বামী আছে অথচ এদের বলেছি আমি অবিবাহিত। আমাদের ক্যাম্পে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রছাত্রী। অনেকেই তোমার নাম জানে। তোমার কবিতার ভক্ত। অথচ আমি বলি নি যে আমি অমুক কবির স্ত্রী। কারণ যুদ্ধের সময় তুমি কোন পক্ষ নেবে তা আমি জানতাম না। আমাদের পরিচিত অনেকেই স্বাধীনতার বিপক্ষে আছে।

তুমি কী তাদের সামনে পেলে আক্রমণ করতে পারবে?

গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেব। ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেব। এই যুদ্ধে আমাদের জিততে হবে কবি।

আমি যদি তোমার শত্রু পক্ষে থাকতাম কী করতে?

তুমি অন্যায়ের পথে থাকতে পার না।

হলফ করে বলা যায় না। তুমি তো এই ভয়েই স্বামীর পরিচয় গোপন করেছ।

দেখো আমাকে মানসিকভাবে আর পীড়ন করো না। তাহলে তোমার সাথে না খেয়ে না থেকেই আমি এক্ষুণি চলে যাব।

বলল হামিদা। উত্তেজনায় তার ঠোঁট জোড়া চড়ুই পাখির মতো কাঁপছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। চলো খেয়ে নেই পরে কথা হবে। এখন আর কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ক্ষুধার্ত। চল চারটা খেয়ে নিই।

হামিদা কোনো জবাব না দিয়ে খাবার ট্রে টার সামনে গিয়ে বসল। বলল, আমার ক্ষিদে নেই। তবুও তোমার সাথে সামান্য মুখে তুলব। কে জানে হয়ত বা এটাই হবে আমার প্রিয়জনের সাথে শেষ আহার্য। শেষ মিলন।

শেষ মিলন মানে?

আমি এ সপ্তাহেই কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকব। যদিও বলা বারণ তবুও তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি আমরা ঢাকার কাছে ডেমরার একটা গ্রামে আস্তানা গেড়েছি। সেখান থেকে ঢাকায় অপারেশন চালাতে হবে। আমার কাজ হবে সংবাদ আদান-প্রদান ও আক্রমণের ধারা পরীক্ষা করে ইউনিটকে জানানো। খুব রিস্কি।

তোমাকে এরা খুব কঠিন দায়িত্ব দিয়েছে।

কেউ দেয় নি আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। তুমি দোয়া কর যেন সফল হই।

হামিদার কথায় আমি চুপ মেরে থাকলাম। সে খাবারের বাটিগুলা থেকে ঢাকনা সরাতে সরাতে বলল, নাও শুরু কর।

হামিদা খাসির ঝাল গরম সরুয়া থেকে একটা বড় হাড্ডিসহ মাংসের টুকরা আমার পাতে দিল। যেমন অতীতে সব সময় দিয়ে এসেছে। আমি বাষ্প-জমা দৃষ্টিতে তার পরিবেশন দেখতে লাগলাম।

হামিদা মুখ তুলে একবার আমাকে দেখল, মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। পুরুষের কান্না খুব বিশ্রি লাগে, জানো। আজ রাতটা তোমার সাথে থাকব। থাকতেই এসেছি। আর তোমার বান্ধবীর ব্যাপারেও কোনো প্রশ্ন করবো না। কেন করব? আমি স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আমি আর আগের মতো নেই। আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকেই হিংসা করার মতো অবস্থায় এখন আর নেই হাদী। তুমি কী নন্দিনীর জন্য হৃদয়ে কোনো টান অনুভব করছ? নাকি শুধু কবির কর্তব্যবোধ?

আমি হামিদার এধরনের কথার কী জবাব দেব? একবার শুধু তাকে মুখ তুলে একটু দেখে মাথা নুইয়ে ভাতের লোকমা বাঁধতে লাগলাম।

এখন আবার কথা বলছ না কেন? আমি নন্দিনী সম্বন্ধে সবকথা তোমার বোন ও ভগ্নীপতির কাছে শুনেছি। তারা আমার ক্ষতির কথা চিন্তা করেই ক্যাম্পে খবর পাঠিয়ে আমাকে ডেকে এনেছে। আমি কোনো ঝগড়া বা ঘরকন্না করতেও আসি নি। তবে যেটুকু না জানলে নারীর হৃদয় সহজে শান্ত হয় না তা জানার জন্যই এতক্ষণ জ্বালাতন করলাম। নন্দিনী কী সত্যি আমার শূন্যস্থান পূরণ করার যোগ্য?

আমি জানি না। যখন তোমার কোনো খোঁজ পাত্তা জানতাম না তখন সে বলত তোমার ফিরে আসার শর্তে সে আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি চলে এলে সে তার পথ দেখবে। এখন সে জানে তুমি এদেশেই আছ এবং মুক্তিযোদ্ধা।

আমি সত্য কথাই আমার স্ত্রীকে বলতে গেলাম। হামিদা ততক্ষণে খাওয়া শুরু করেছে। খেতে খেতে বলল, তাহলে তো তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটার আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত। আমাদের মুখোমুখি হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। ভেবেছিলাম রাতটা তোমার সাথে থাকব।

এর মানে তুমি এখনই চলে যেতে চাও?

আমার মনে হয় এটাই ঠিক হবে।

এবেলা তুমি কোথায় গিয়ে উঠবে?

আমার ক্যাম্পে যাওয়ার গাড়ি আট নম্বর থিয়েটার রোড থেকে দিনরাত আসাযাওয়া করছে। আমার চলে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি তুমি অনুমতি দাও খেয়েই রওনা হব।

একটা রাত অন্তত আমার সাথে থাকতে পার না?

আমি একটু অনুনয় মিশিয়ে বললাম।

বেশ কিছুকাল পরে আমাকে পেয়ে তোমার লোভ জেগে উঠেছে কবি। দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা একটু ও ভাবছ না। তুমি না কবি, একটু সেক্রিফাইসও করতে পার না?

হামিদা রহস্যময়ীর মতো হাসল।

আমি বললাম, তোমার এই মুহূর্তের রূপ, এই গোলাপি শাড়ি আর গাঢ় লাল রংয়ের ব্লাউজ, সোনাদানাহীন নিরলংকার শরীরই তো একজন কবির দেশ। সেই দেশের পক্ষে লিখব বলেই তো আমি প্রতিজ্ঞা করে এখানে এসেছি। অন্তত একটা রাত তোমার উষ্ণতা ও আলিঙ্গনের মধ্যে কাটাতে চাওয়া কী স্বামী হিসেবে আমার অপরাধ?

বেশ একটা রাত আমি এখানে থাকব। তবে একটা শর্ত তোমাকে মানতে হবে।

কী শর্ত?

আমি খুব ভোরে উঠে কাকপক্ষী জাগার আগে হোটেল ছেড়ে চলে যাব। আটকাবে না। বলো রাজি?

আমি বললাম, নন্দিনীকে দেখলে তোমার মায়া হত। হয়ত তখন এমন শক্র ভাবতে না।

দেখো আমি শুধু তোমার স্ত্রী নই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যোদ্ধা। আমার সামনে হানাদার বাহিনী ছাড়া অন্য কোনো টার্গেট নেই। আমি চাইনা এখন কোনো মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ছবি আমার রক্তে মিশে যাক। যাতে দুই শক্রর মধ্যে দিশেহারা হয়ে আমার নিশানা পড়ে যায়। জয় বাংলা।

উত্তেজিত হয়ে বলল হামিদা। মুহূর্তের মধ্যে হামিদার লাবণ্যময়ী চেহারা পাল্টে রুক্ষ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। এমনিতেই হামিদার কণ্ঠদেশ ও গ্রীবা অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে একটু প্রশস্ত। এখন হার বা অন্য অলংকার না থাকায় তাকে আরও প্রশস্ত ও ফর্সা মনে হল। উত্তেজনায় শুধু কণ্ঠের হাড় দুটি থির থির করে কাঁপছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে ভোরে তুমি চলে যাও। চল এখন খেয়ে দেয়ে গড়ের মাঠে গিয়ে সন্ধ্যাটা ঘুরে বেড়িয়ে আসি। জীবনকে যখন নিজেই তুমি এমন অনিশ্চিত করে ফেলেছ তখন একটা সন্ধ্যা অন্তত এই মহানগরীর ফাঁকা মাঠে স্মরণীয় করে রাখি। যাবে?

যাব।

আঙ্গুল চেটে জবাব দিল হামিদা।

আমরা সূর্যাস্তের সাথে সাথে পারুলকে বলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আমি ট্যাক্সি ডাকার উদ্যোগ নিতেই হামিদা বলল, গড়ের মাঠতো কাছেই। চল হেঁটেই যাই।

আমি বললাম, খুব কাছে না। তবু চল হেঁটেই যাই। তুমি আবার হাঁপিয়ে পড়বে না তো?

পড়লামই বা, তুমি ধরে তখন পাজা কোলে করে নিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে শুইয়ে দিও।

আমি বললাম, এর মধ্যে কলকাতার অনেক কিছু চিনে ফেলেছ মনে হচ্ছে?

শুধু চিনে ফেলি নি। একদিন জয় করতে চাই।

জয় করতে?

হ্যাঁ। যদি আমাদের লড়াইটা ব্যর্থ না হয় যদি আমরা জিতি এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হয়ে যাই তবে জেনো বাংলাদেশের মুসলিম কিষাণদের রক্তে ভেজা কৃষি পণ্য, পাট আর জমিদারি খাজনার তৈরি এ শহরও আমরা একদিন জয় করে নেব। এ কলকাতা জব চার্ণকের নয় ভাটি অঞ্চলের নিপীড়িত কিষাণদের উদয়াস্ত ঘামের নুনে তৈরি। এ শহর আমাদের। একদিন আমাদেরই হবে।

হামিদার আশায় উদ্বেলিত এমন কণ্ঠস্বর আমার একেবারেই অচেনা। আমি হেসে তার একটি হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে ফুটপাত ধরে চলতে লাগলাম। আমি কোনো জবাব দিচ্ছি না। উপলব্ধি করে হামিদা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি বোধ হয় আমার কথায় হাসছ?

আমি হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিলাম, না। তোমার কথায় ঠিক হাসছি না। তোমাকে ভালোবাসি বলে বিশেষত আজ এই মুহূর্তে তোমাকে খুব ভালো লাগছে বলে হাসছি। আমি প্রকৃতপক্ষে আমাদের মুক্তির লড়াইয়ের পরিণাম সম্বন্ধে খানিকটা হতাশ। যদিও এই যুদ্ধের হারজিতের ওপর তোমার আমার সকলেরই ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, পাকিস্তান আর অখণ্ড থাকছে না। বাংলাদেশ থেকে অচিরেই পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয়ের কালিমা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে।

তবে আর হতাশার কথা বলছ কেন?

পাকিস্তানীরা চলে গেলেই আমরা বিজয়ী হব এমন সম্ভাবনা তো আপাতত দেখছি না। এক প্রবল পরিচিত শত্রুকে পরাজিত করতে আমরা আরেক প্রবল অপরিচিত শক্তির সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে ঘরে ফিরতে পারব বটে তবে বিজয়ী হব কিনা জানি না।

আমার কথায় হামিদা কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে আমি নিজেই আবার তাকে আশান্বিত করার জন্যে বললাম, তবে সব কথার ওপরে সত্য হল, বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের কিষাণ পরিবারের যুবকরা দলে দলে এই মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তারা সশস্ত্র হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্র করে কেউ মাঝ পথে যুদ্ধটা থামিয়ে না দিলে এই যুদ্ধের পরিণাম আখেরে বাঙালি মুসলমানদের জন্য সুদূরপ্রসারী এবং সুফলদায়কই হবে।

এ যুদ্ধ কোনো ষড়যন্ত্রই মাঝপথে থামিয়ে দিতে পারবে না।

কণ্ঠে কোনোরূপ দৃঢ়তার আভাস না দিয়েই বলল হামিদা। আমি হাসলাম।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গী পার হয়ে এসে মাঠের একটা খোলা জায়গায় বসলাম। জায়গাটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া উন্মুক্ত স্থান হলেও মানুষের গুঞ্জনে মুখর। জোড়ায় জোড়ায় নারীপুরুষ এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প-গুজব করছে। ফেরিওয়ালা, চীনে বাদামওয়ালা ঘুরছে আশেপাশে। ওদিকে সারা চৌরঙ্গী এলাকার জন কোলাহল ও গাড়ি এবং বাস-ট্রাকের সম্মিলিত ধাতব শব্দে সারা প্রান্তরের ওপর দিয়ে একটা নাগরিক উত্তেজনার স্রোত বইছে। একটু একটু বাতাসে হামিদার আঁচল স্থানচ্যুত হয়ে কাঁধ থেকে সরে যাচ্ছে। আর হাত দিয়ে সে এখানে সেখানে আব্রু রক্ষার চেষ্টা করছে। আমি হেসে বললাম, চীনেবাদাম খাবে?

না।

কিছু একটা খাও।

কিছু না।

বলল হামিদা। আমি বললাম, কি ভাবে ঢাকা থেকে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলে সে কথা কিন্তু শোনা হল না।

শুনতে চেয়ো না। মানুষের লোভ, হিংসা আর তার পরশ্রীকাতরতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামগুলো পার হয়ে এসেছি। হত্যা আর বিশ্বাসঘাতকতা, ধরিয়ে দেওয়া ও নারীর লাঞ্ছনা দেখতে দেখতে এসে পৌঁছেছি। তবে দয়ামায়া, ভালবাসা আর বীরত্বের ঘটনাও কম দেখি নি। এর বেশি আর কী শুনতে চাও? তোমার বৌয়ের বিশ্বস্ততার প্রমাণ চাও নাকি?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না।

চাইলেও দিতে পারব না।

হেসে বলল হামিদা।

আগে তুমি এভাবে কথা বলতে না।

কীভাবে?

এই এখন যেমন বলছ।

বললাম আমি।

হামিদা মাঠের ঘাসের ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ার ভঙ্গিতে পা দুটি মেলে দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে হাসল, তখন আমরা একটা পরিবার ছিলাম। আমাদের যেমনই হোক একটা সংসার ছিল। আমরা দুজন দুধরনের জীবিকায় ছিলাম। যতক্ষণ ঘরে ফিরে তোমাকে না দেখতাম কিংবা তোমার ফেরার অপেক্ষায় থাকতাম ততক্ষণ আর কিছুতেই আনন্দ পেতাম না। প্রকৃতপক্ষে আমরা ছিলাম সুখী। আমরা রাজনীতি কাকে বলে জানতাম না। যুদ্ধ, দেশত্যাগ, কোনোকিছুর সাথেই আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। আমাদের পরিশ্রম আমাদের তৃপ্তি আমাদের সুখী করে রেখেছিল। এখন রাজনীতি, যুদ্ধ আর স্বাধীনতার মর্ম আমরা বুঝতে বাধ্য হয়েছি। এ যুদ্ধ জিতলে আমরা দেশে ফিরতে পারব। হেরে গেলে কিংবা মরে গেলে সেই পুরনো সংসারে ফেরার তো প্রশ্নই আসে না। জিতলেও আমরা আর আগের অবস্থায় থাকব না। তোমার আমার একদা যে চাকুরি ছিল সে চাকুরি আর পাবো না। আমাদের শাজাহানপুরের সেই ভাড়া বাড়িটায় আমার বিবাহিত জীবনের সব পুঁজি, সব সংগ্রহ আমরা ফেলে রেখে চলে এসেছি। তুমিও এক কাপড়ে আমিও এক কাপড়ে। এতদিনে আমাদের বাসাটি নিশ্চয়ই লুট হয়ে গেছে। সাবেক জীবন, সাবেক সংসার কিছুই আর আমরা ফিরে পাবো না, কবি। আর তা ছাড়া

বল, তাছাড়া কি?

আমি কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তার কথা আমার কেন জানি না খুব ভাল লাগছিল। আমার মর্মস্পর্শ করে যাচ্ছিল আমার স্ত্রীর কথাগুলো। এ ধরনের বাস্তব সম্মত উপলব্ধি আমার স্ত্রীর মধ্যে আমি অতীতে কখনও দেখি নি। বলা যায় আমি খুব অধীরতা নিয়ে হামিদার কথাগুলো শুনছিলাম।

তাছাড়া তখন তুমি আমাকে ভালবাসতে।

এখনও বাসি।

মিথ্যে বলে কোনো লাভ নেই কবি। এখন তোমার চোখের সামনে আমি আছি বলে আমাকে কামনা কর। অভ্যেসের টানে আমাকে চাও। আমি তোমার ধর্মপত্নী বলে। আমি না এলে কিংবা পথে কোনো দুর্ঘটনার আমি মারা পড়লে তোমার সত্যিকার কোনো ক্ষতি হত না। এতদিন হয়ও নি। হয় নি যে নন্দিনী তা তোমাকে বুঝতে দেয় নি।

একটি অসহায় মেয়ের প্রতি বিরূপ হয়ে তুমি এসব বলছ।

আমি হামিদার কথার তরঙ্গ এখন প্রতিরোধ না করে পারছিলাম না।

মোটেই না। আমার কথায় এমন ভয় পাচ্ছো কেন? কই আমি তো ভয় পাচ্ছি না? অথচ এই যুদ্ধ, এই দেশ ত্যাগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হল আমার। সবচেয়ে ভালবেসে বিয়ে করে স্বামী সংসার মুহূর্তের মধ্যে হারাতে বসেছি। বসেছি বললে অবশ্যি খানিকটা আশা আছে বোঝায় কিন্তু আমি জানি কবি আমার আর আশা নেই। তোমার ভাগ্য ভালো যে সকল দুর্ভাগ্য ও ভাঙ্গনের মধ্যে তুমি নন্দিনীকে পেয়েছ। ভালবেসেছ। একবারও আমার কথা মনে পড়ে নি। কিংবা পড়লেও তা তোমার অপরাধ বোধেরই প্রতিচ্ছবি ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয়। তোমার একজন স্ত্রী আছে এই দ্বিধা। অথচ দ্যাখো, আমি একবারও তোমার মুখ এ কয়দিন মুহূর্তের জন্যও মন থেকে সরাতে পারি নি। অথচ কত মানুষ কতভাবে সাহায্যের ছুঁতোয় এগিয়ে এসেছে। আর কত গায়ে পড়া অসভ্যতা দেখলাম। আসলে অন্য পছন্দ আমি সম্ভবত তোমাকে পেয়ে একদা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। এখন, কবি সত্যি আমার আর কোনো উপায় রইল না।

কথাগুলো শেষ করে হামিদা সোজা হয়ে উঠে বসল। আমি দেখলাম তার গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। হামিদা কাঁদছে। এখন কোনোরূপ আশ্বাসের বাক্যকেই সে অপমান ভাববে। হামিদাকে আমি জানি। তাছাড়া হামিদা আমার ও নন্দিনীর সম্পর্ককে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে। তার উপলব্ধিতে কোনো ভুল বা মিথ্যে ছলচাতুরী নেই। বরং মিথ্যে আছে আমার মধ্যে। হামিদার প্রতি আমার এতদিন যে উদ্বেগ ছিল তা কর্তব্যবোধ ও ভয় থেকেই। আমার একজন স্ত্রী আছে অথচ অন্য একজনের প্রতি জেগে উঠেছে প্রেম। এরই বৈধতার প্রশ্ন নানা যুক্তি হয়ে আমাকে প্রবোধ দিচ্ছিল মাত্র। অথচ কত সহজেই না হামিদা এই মিথ্যে প্রবোধের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দিতে চাইছে।

হামিদা মাঠের পূর্ব দিকের বিশাল ইমারতগুলোর চূড়োয় প্রজ্বলন্ত আলোকস্তম্ভের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে আছে দেখে আমি বললাম, আমাকে এখন কী করতে বল?

অন্তত আমার সম্বন্ধে অযথা দুঃশ্চিন্তা ছেড়ে দিতে পরামর্শ দিচ্ছি।

এর মানে হল আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তুমি কোনো আশাই রাখো না। এ সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে বলে তোমার ধারণা।

ধারণা নয়। এটাই সত্য।

এখন তাহলে তুমি কী করতে চাও।

এবার আমিও তারই মতো প্রশ্ন করলাম। যে ধরনের প্রশ্ন একদা আমার মুখ থেকে হামিদার কাছে অভাবনীয় ছিল। হামিদাও চমকে আমার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি মুক্তিযোদ্ধা। দেশমুক্তি ছাড়া আপাতত আমার কোনো কর্তব্য নেই। তোমার কাছে শুধু একটা অনুগ্রহ চাইব।

বলো।

যুদ্ধের পর আমার একটা খোঁজ নিও। জান তো আমার আপন বলতে কেউ নেই। ঢাকায় ফিরে আমি কী করব, কোথায় যাব কোনো কিছু জানি না। তখন তোমার একটা সাহায্য বা অবলম্বন আমার দরকার হবে। যদি দেশে ফিরে নিজেকে চালাবার মতো কোনো অবলম্বন আমি যোগাড় করতে পারি তখন না হয় তালাকনামা পাঠিয়ে দিও। ততদিন তোমার নন্দিনীকে একটু ধৈর্যধারণ করতে হবে। এর আগে তোমাদের বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। শুধু অনুগ্রহ করে তালাকনামাটা পাঠিও না। আমাকে কথা দাও।

ঠিক আছে, কথা দিলাম। তবে আমার ও নন্দিনীর ব্যাপারে তুমি আগাম একটু বেশি ভাবছ। নন্দিনীর সাথে আমার সম্পর্কটা যাই হোক, নন্দিনী হয়তো এ ধরনের চিন্তা করছে না। আদৌ হয়তো নন্দিনী এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা দেখছে না।

আমি একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আমার প্রকৃত সন্দেহের কথা তুললাম। হামিদা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটি মুছে নিয়ে বলল, তাতেও আমার তো কোনো লাভ দেখছি না। তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। তোমাদের ভালবাসা আমার ঘর ভেঙে দিয়েছে এতে তো কোনো মিথ্যে নেই। এখন যদি তুমি ও নন্দিনী নতুন সংসার পাড়তে না পার তাতে আমার ভাঙা সংসার কী আর জোড়া লাগবে? অমন জোড়াতালি আমি সব জেনে বুঝে কেন চাইব কবি? তোমার যে দয়াটুকু চাইলাম সেটা আমি নিরুপায় বলে। তুমি তো জান আমাকে আশ্রয় দিতে পারে এমন আপনজন আমার একজনও দেশের বাড়িতে নেই। না বাপ, না ভাই। আমি তখন কোথায় এবং কার কাছে গিয়ে উঠব? আমার অসহায়তার কথা তো তোমার অজানা নেই। মনে করে দেখো, বহু বৎসর

আমরা দুজনে প্রেম আর ভালোবাসার মধ্যে বাস করেছি। এর একটা কৃতজ্ঞতাবোধ উভয়ের মধ্যে আছে। আজ না হয় নন্দিনীর কাছে আমি পরাজিত। প্রেম নেই যখন মানি তখন আর কিছু চাইবার নেই আমার। কিন্তু দয়ামায়া তো আছে। সেটা কী চাইতে পারি না?

আমি তো বলেছি তুমি একটু আগাম বেশি দুশ্চিন্তায় আছ। তেমন অসুবিধেয় তুমি পড়বে না।

বললাম আমি।

এধরনের একটা প্রতিশ্রুতিই আমার দরকার ছিল। এখন চল হোটেলে ফিরি। পারুলরা খাওয়ার টেবিলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

আমরা উঠলাম।

.

সকালে মিতুর চেঁচামেচিতে সকলের ঘুম ভাঙলে আমিও চোখ মেললাম। গতরাতে হামিদা আমার পাশে যেখানে শুয়েছিল সেখানে পারুলের কাছ থেকে চেয়ে আনা গত সন্ধ্যার শাড়ি ব্লাউজ ভাজ করে বালিশের ওপর রাখা। দরজাটা ভেতর থেকে খোলা থাকায় মিতু এসে ঘরে ঢুকল।

মামা জাগুন না। গোছগাছ করতে হবে না?

তোর মামি চলে গেছে?

সেই কখন। মামানিই তো আব্বা- আম্মাকে জাগিয়ে বিদায় নিয়ে তারপর ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে গেল।

বলল মিতু। তার মামানির এভাবে চলে যাওয়াটা সম্ভবত তার কাছেও একটু বিসদৃশ ঠেকেছে। আমি বললাম, আমাকে জাগিয়ে দিলে পারতি।

মামিই তো দিল না। বলল তোর মামা একটু ঘুমাক। এখন অত ভোরে জাগাতে হবে না। আমি গত রাতেই তোর মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেখেছি।

আমি কোনো কথা না বলে বিছানায় উঠে বসলাম। মিতু বলল, মামা আপনাকে চা দিতে বলি?

আমার পায়ের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে খাট থেকে নামতে নামতে বললাম, যা বলে আয়।

মিতু খুশিতে নাচছে। নতুন বাড়িতে যাওয়ার কিশোরীসুলভ আনন্দ। সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে আমি টয়লেটে এসে ঢুকলাম। ঢুকেই চোখে পড়ল সামনের আয়নার ওপর একজোড়া খাকি রংয়ের চুলের ফিতে শুকুচ্ছে। কাল হামিদার বেণীতে এই ফিতে দুটি ছিল। যাওয়ার সময় সে হয়তো বেণী বাঁধবারও সময় পায় নি। কেন জানি না বুকের ভেতর থেকে প্রবল হু হু শব্দে একটা কান্না বেরিয়ে এল। আমি নিজেকে আর সামাল দিতে পারছিলাম না। বেসিনের কলটা ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

.

আমরা গোছগাছ করে ট্যাক্সি ডাকার আগে নাস্তার জন্য নিচে নেমে এলাম। আমাদের সবারই মালপত্র রুমের বাইরে দোরগোড়ায় রেখে এসেছি। শুধু গৌহাটিতে পাওয়া টাকার ব্যাগটা আমি হাতে করে নিচে নিয়ে এসেছি। আমার হাতে ব্যাগটা দেখে একবার ইমাম বলেছিল, আপনি এটা কষ্ট করে টানছেন কেন? বেয়ারাই আনতে পারত।

আমি বললাম, ব্যাগটা নন্দিনীর। এটা বরং আমার হাতেই থাক।

ইমাম হেসে বলল, নন্দিনী কী সত্যি আমাদের সাথে থাকবেন?

তার আত্মীয়বাড়ি যাবার আগে নন্দিনীর সাথে এ ধরনের কথাইতো হয়েছিল। এখন অবশ্য তার আত্মীয়- স্বজনের সন্ধান পেয়ে তার মতের পরিবর্তনও হতে পারে। আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না।

বললাম আমি।

ইমাম বলল, তিনি যদি আমাদের সাথে থাকতে চান তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। এখন তো তার এখানে আসার কথা ছিল বলে শুনেছি।

তার কথা শেষ হবার আগেই নন্দিনী এসে আমাদের খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সকলকে সালাম জানাল, আমি এসে পড়েছি।

নন্দিনী একা এসেছে দেখে আমি বললাম, ভবানীপুর থেকে কেউ আসে নি?

নন্দিনী বলল, না একাই এসেছি। আমি ঠিক চিনে চলে এসেছি। মনে হয় কলকাতায় ছোটো বয়সে একবার যে এসেছিলাম সেটা এখন একটু একটু কাজে লাগছে। এখন কোনো কিছুই আর অপরিচিত মনে হচ্ছে না।

আমি বললাম, অনুপদা আর তার বোন কেমন আছে। তাদের নিয়ে এলে না কেন?

তারা আসতে চেয়েছিলেন। আমিই বরং বলেছি নতুন বাসার ঠিকানা নিয়ে গিয়ে একদিন তাদের নিয়ে আসব।

বলল নন্দিনী। তার কথায় একটা আনন্দ উচ্ছল ভাব।

আমি বললাম, তোমাকে খুব খুশি খুশি লাগছে নন্দিনী।

নন্দিনী হাসল।

পার্ক সার্কাসের একটা ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলা ইমামের জন্য বরাদ্দ হল। আমরা উডস্ট্রীটের আর্মেনিয় হোটেলটি সকালেই ছেড়ে এসেছি। সারাদিন বাসাটা গোছগাছ করতেই পারুল ও নন্দিনীর কেটে গেল। আমিও খানিকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যদিও গোছানোর মতো ঢাকা থেকে আমরা কিছুই নিয়ে আসি নি, এমন কী পারুলদেরও উল্লেখ করার মতো আসবাপত্র তেমন কিছু ছিল না, তবুও একটা নতুন বাসায় উঠলে ঝাড়পোছ ও ধোয়ামোছা তো করতেই হয়। তাছাড়া রান্নাবান্নার ডেগডেকচির জন্য ইমাম একজন লোককে বাজারে পাঠিয়ে সবকিছু সংগ্রহ করাল। সকালেই বাড়ির বুড়ো মুসলমান দারোয়ান কোত্থেকে যেন এক ওড়িয়া কাজের মেয়েকে জোগাড় করে আনল রান্না আর ঘর মোছার জন্য। মেয়েটি ষোল সতের বয়সের। বেশ চটপটে। এসেই দুপুরের রাঁধাবাড়ায় লেগে গেল। ঘরবাড়ি গুছিয়ে খেতে খেতে বেলা গড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা। ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে গোছল সেরে এসে সকলে যখন খাওয়ার টেবিলে বসলাম বেলা তখন সাড়ে তিনটা। এতক্ষণ নন্দিনীর সাথে মন খুলে কথা বলার ফুরসৎই পাওয়া যায় নি।

আমি বললাম, নন্দিনী তোমার আমাদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত কী অনুপদা জানেন? তারা কী তোমাকে এ ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন?

আমি তাদের বলেছি আমার দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে আমার একটা কর্তব্য আছে। আমি স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে আসি নি। বাধ্য হয়ে এখানে এসেছি আর ততোধিক বাধ্য হয়েই মুক্তিবাহিনীর পক্ষে দাঁড়াব। আমি সীমাদির মৃত্যুর ঘটনা, আমার ওপর পাশবিক লাঞ্ছনার বিবরণ খোলাখুলি আমার কুটুম্বদের বলেছি। তোমার কথা, পারুল ও ইমাম ভাইয়ের দয়ার কথা সবি বলে এদের অনুমতি নিয়ে ভবানীপুর ছেড়ে এসেছি। ফের সেখানে গেলেও ওদের গলগ্রহ হতে যে চাই না

এটা অনুপদাকে বুঝিয়েছি। শুধু আমার বোনটা একটু কেঁদেছে সীমাদির জন্য। এখন ইমাম আর পারুল যদি না তাড়ায় এখানেই থাকব।

ইমাম বলল, সাবাস। আমরা আর আপনাকে বলব না যে আপনি এখানে থাকবেন কী না। জানব আমাদের মতো দেশ থেকে এসেছেন এবং আমাদের সাথেই বিজয়ী হয়ে ফিরে যাবেন।

ইমামের কথায় খাওয়ার টেবিলে খুশি আর আশ্বাসের আবহাওয়া যেন ছড়িয়ে পড়ল। মিতুর খুশিটা বোঝা যায়। সে একবার আমার দিকে মুখ তুলে হাসল। পরমুহূর্তেই পারুলের সতর্ক গভীর দৃষ্টির ইঙ্গিতে মাথা নুইয়ে খেতে লাগল।

আমি আন্দাজ করলাম এরা সকলেই হামিদার গতকালের আগমন ও একরাত হোটেলে অবস্থানের বিষয়টি নন্দিনীর কাছে চেপে যেতে চাইছে। হয়তো আমার আত্মীয়দের ধারণা এতে আমার ও নন্দিনীর সম্পর্কটা সন্দেহযুক্ত হবে কিংবা আমি অসন্তুষ্ট হব। এই দুর্ভাগ্যের দিনে ওরা আমাকে হারাতে চাইবে না এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু গতরাতে হামিদার উপস্থিতির কথাটা গোপন রাখা যে অন্যায় এবং আমার বোন, ভাগ্নি ও বোনের স্বামীর কাছে যে আমি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছি তা মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম। তাছাড়া হামিদার গতরাতের পরাজিত চেহারায় যে প্রেম ও উদারতা ছিল তাতে তো একবারও মনে হয় নি নন্দিনী বা আমার প্রতি তার সামান্যতম বিদ্বেষ আছে। মুহূর্তের জন্য গতরাতের হামিদার অশ্রুভরা কথা আমার মনে ভেসে উঠল। আর দেশের মুক্তির জন্য তার ভয়াবহ সিদ্ধান্তের কথাও। আমি নন্দিনীর মুখের দিকে না তাকিয়েই বললাম, তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি নন্দিনী।

নন্দিনী প্লেট থেকে মুখ তুলল।

আমার স্ত্রীর সাথে গতকাল আমার দেখা হয়েছে।

আশ্চর্য, এতক্ষণ একথা আমায় বল নি কেন? বৌদি কেমন আছেন? কোথায় দেখা হল, থিয়েটার রোডের অফিসে?

উপর্যুপরি একসাথে এতগুলো প্রশ্ন করলেও নন্দিনীর গলা ও চেহারা যে থর থর করে কাঁপছে তা আমি ধরতে পেরে একটা ঢোক গিলে সামনের পানির গ্লাসটা হাতে নিলাম।

আমার অবস্থা বুঝে ইমামই অনেকটা আশ্বাস দেয়ার সূত্রে বলল, আমার সাথে থিয়েটার রোডের অফিসে ভাবির দেখা হলে আমি তাকে হোটেলে নিয়ে এসেছিলাম। ভাবি একরাত আমাদের সাথে ছিলেন। আবার সকালেই তার গ্রুপে ফিরে গেছেন। তিনি ট্রেনিং শেষ করে ফ্রন্টে আছেন। দেশের

ভেতরে অপারেশনে যাবেন। এ অবস্থায় একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আটকানো যায় না। তাছাড়া আমার দৃষ্টিতে আটকানো পাপও।

ইমামের কথায় নন্দিনীর মধ্যে একটা হতচকিত ভাব। একবার পারুলের দিকে তাকিয়েই আমার দিকে ফিরল। পারুল ও ইমাম মাথা নুইয়ে চুপচাপ খেতে লাগল। আমিও নন্দিনীর চোখের ওপর চোখ রাখার সাহস পাচ্ছিলাম না। আমিও মুখ নিচু করে খাওয়ার ভান করলাম। শুধু মিতুই এই গুমোট অবস্থাটা ভাঙার জন্য দৈবভাবে কথা বলে উঠল, মামানিকে অলিভ রংয়ের ড্রেসে যা সুন্দর লাগছিল না নন্দিনী ফুপু, দারুণ। প্যান্ট, পুলওভারে কী স্মার্ট। আর জানো আম্মা মামানির পকেটে একটা পিস্তল ছিল। একদম গুলিভরা পিস্তল। মামানি আমাকে দেখিয়েছে।

তোমার মামানিকে আরও একটা দিন ধরে রাখলে না কেন মিতু? একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে জীবন সার্থক করতাম।

নন্দিনীর কথায় মিতু ফের বলল, কত সাধলাম, থাকল না যে। মামানি বলে কিনা ফের ঢাকায় দেখা হবে।

মিতুর কাছে বোধহয় বড়দের সব ব্যাপাই একটু খাপছাড়া। কেমন যেন একটু রহস্যময়। সে আমাদের দিকে বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে নিজের খাওয়ার দিকে মন দিল।

.

খাওয়ার পর নন্দিনী হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের দিকে উঠে গেল। আমি ভাবলাম সে বোধহয় হাতমুখ ধুয়ে আবার খাবার টেবিলে ফিরে আসবে। ডাইনিং স্পেস থেকে বেসিনটা একটা দেয়ালের আড়ালে থাকায় আমি নন্দিনীকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু নন্দিনী ফিরল না। একে একে আমরা সবাই খাওয়া শেষ করে উঠলাম। ইমাম আগে হাত মুখ ধুয়ে চলে গেলে আমি ও পারুল দুজন দুটা বেসিনে পাশাপাশি দাঁড়ালাম। পারুল সোপ কেস থেকে সাবান তুলে নিয়ে হাতে মাখাতে মাখাতে হাসল।

দিদির বোধহয় আজ ঠিকমত খাওয়া হল না।

হামিদা এসেছিল, একথা তো আর মিথ্যে নয়। তাছাড়া আমি একথা গোপন করতে যাব কেন? গোপন রাখলেও নন্দিনী একদিন জানতই। তখন তোদের প্রতি একটা সন্দেহ সৃষ্টি হত।

আমরা অবশ্যি বলতে যেতাম না।

কেন তোরা এরকম করতি?

ইমাম চায় না প্রবাসে আপনার মনে কোনো অশান্তি সৃষ্টি হোক। তার ধারণা কবিরা সাধারণ সামাজিকতা মেনে চললে কবিতা লিখতে পারেন না। সমাজে কবি সাহিত্যিকদের সাত খুন মাফ।

বলতে বলতে পারুল একটু রহস্যময় হাসি হাসল। যেন তার শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের অবৈধ কার্যকলাপের অযাচিত সমর্থন নিজের স্বামীর মুখ থেকে পেয়ে সে খানিকটা দায়মুক্ত।

আমি বললাম, তোর কাছে নিশ্চয়ই নন্দিনীকে এভাবে নিয়ে আসা এবং তার সাথে আমার এভাবে মেলামেশাটা একটা পাপ?

ভাইয়া আমি আপনার খুব নিকট আত্মীয়া হলেও অন্যের বৌ। এদের পারিবারিক মর্যাদার কথা ও শিক্ষাদীক্ষার কথা তো আপনি জানেন। আমি খুব ভয় আর অস্বস্তির মধ্যেই ছিলাম। আপনাদের জামাই আমাকে আশ্বস্ত না করলে আমি হয়ত আপনাকে আমাদের সাহচর্য ছেড়ে যেতেই বলতাম।

মাথা নিচু করে জবাব দিল পারুল। সাবানটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

ইমাম তোকে সত্যি যা বলেছে আমাকে খুলে বলবি?

আমার কৌতূহল দেখে পারুল আবার হাসল, ইমাম বলেছে আপনি যে পরিস্থিতি ও বিপদকে তুচ্ছ করে আমাদের কাছে এসেছিলেন সেটা স্বাভাবিক সামাজিক ন্যায় অন্যায় বিচারের সময় নয়। এটা যুদ্ধ পরিস্থিতি। নন্দিনী দিদিদের দুঃখে আপনি সত্যিকার কবির আচরণই করেছেন, একথা ইমামই আমাকে বুঝিয়ে অস্বস্তি দূর করে দিয়েছে। বলেছে এই অবস্থায় পড়লে ইমামও নাকি এই করত। সে বলে, একজন মহিলাকে আপনি নাকি ভয়ে বিপর্যয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

কথাগুলো বলে হ্যান্ডেল থেকে একটা সাদা তোয়ালে টেনে আমাকে দিয়ে পারুল আবার হাসল, আমি এবার আসি ভাই। আপনাদের জামাই অপেক্ষা করছে।

আমি বললাম, আমার কথা শেষ হয় নি। আর একটু শোন। হামিদাকে তুই আর ইমাম নন্দিনী সম্বন্ধে কী বলেছিস যাতে সে ভাবছে তার ঘর ভেঙে যাচ্ছে?

এমন কথা বলেছে নাকি ভাবি?

হ্যাঁ। সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।

আমরা নন্দিনীকে নিয়ে আসা সম্বন্ধে আপনি যা যা বলেছেন এর বেশি কিছু বলি নি। তিনি কিছু না বলে শুনে শুধু গেলেন। যাওয়ার সময় অবশ্য আমাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। নামার সময় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ইমামকে বললেন, কবিকে বলবেন মুক্তিযুদ্ধের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কিছু কবিতা লিখতে। কলকাতায় বসে থাকলে নাকি আপনার লেখালেখি কিছু হবে না। এসব বলে মিতুকে গেট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে একাকী গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে বললেন, চালাও। সম্ভবত গাড়িতে উঠেও ভাবি কাঁদছিলেন। কারণ রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছতে মিতু দেখেছে। রাতে কী আপনাদের ঝগড়া হয়েছিল?

আমি পারুলের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে নিজেরই উদগত অশ্রুভরা চোখ দুটি লুকোবার জন্য বেসিনটা ও পারুলকে পেছনে রেখে সোজা নিজের কামরার দিকে হাঁটা দিলাম। এতে পারুল কতটা হতবাক হবে তা একবারও দেখার সাহস আমার হল না।

আমার জন্য নির্দিষ্ট কামরার তালাটা খোলার আগে নন্দিনীর কামরার ভেজানো দরজার দিকে একবার তাকালাম। নন্দিনী হয়ত ভেতর থেকে দুয়ার বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে। নাকি নন্দিনীও হামিদার আগমনের কথা জেনে উপুড় হয়ে কাঁদছে?

নিজেকে খুব শ্রান্ত মনে হল আমার। দুয়ার খুলে ঘরে ঢুকেই বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। হয়ত মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়তাম। লেপটা যেই পা দিয়ে টেনে তুলে গায়ে দিতে চেষ্টা করছি এমন সময় বাইরে নন্দিনীর আওয়াজ পেলাম।

খোলো। আমি আসব।

আমি উঠে দরজা খুললাম।

পিঠের ওপর ভেজা চুল ছেড়ে দিয়ে নন্দিনী দাঁড়িয়ে আছে। মুখে একটা দুর্বোধ্য। হাসি ছড়িয়ে বলল, ভেতরে যেতে দিতে কোনো আপত্তি নেই তো?

আমি জবাব না দিয়ে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে নন্দিনীকে পথ করে দিলাম। ভেতরে ঢুকে নন্দিনী আমার কামরাটা দেখতে লাগল। টাকার স্যুটকেসটা খাটের নিচে রাখা ছিল। মাথা নুইয়ে সেটা দেখল।

আমি এসে আবার বিছানায় বসলাম।

ইমাম সাহেবের বদৌলতে আমরা বেশ রাজার হালেই থাকব দেখছি।

হেসে বলল নন্দিনী।

আমি কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করেই থাকলাম। বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক নয়। হামিদার সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারটা নন্দিনীর মধ্যে কোনো উদ্বেগই সৃষ্টি করে নি। খুব স্বাভাবিক হাসিখুশি চেহারা। একবার হাত ঘুরিয়ে তার বিপুল ভেজা কেশরাশি পেছন থেকে সামনে বুকের ওপর রেখে আমার সামনে অবলীলায় ঝাড়তে লাগল।

আমি বললাম, বসবে?

তোমার ঘুমটা মাটি করে বসতে মন চাইছে না।

সারাদিন এমন খাটাখাটনি করলে এখন একটু বিশ্রাম নিলে তো পারতে।

বিশ্রাম নিলে তোমার এখানেই একটু শোব।

নন্দিনী খাটের ওপর আমার পাশে এসে বসল।

আমি ভাবলাম হামিদার কথায় রাগ করে তুমি বুঝি পেট ভরে ভাতও খেতে পারলে না।

তার ওপর মিছেমিছি রাগ করতে যাব কেন? তিনি তো আমার কোনো ক্ষতি দূরে থাক একনজর দেখার জন্যও থাকলেন না।

সে থাকলে বুঝি তুমি খুশি হতে?

তা অবশ্য হতাম না। তবে বেদখল জায়গা ছেড়ে দিতাম।

এখন বুঝি আর ছাড়তে মন চাইছে না?

কেন চাইবে, যখন তিনিই হেরে ছেড়ে দিয়ে গেলেন?

হেসে বলল নন্দিনী। হাত দিয়ে আবার কেশরাশি বুকের ওপর থেকে পিঠের দিকে ফিরিয়ে দিতে দিতে শব্দ করে হেসে উঠল, আমি সত্যি আজ পরিশ্রান্ত। তোমার পাশে শুয়ে শুয়ে কিছু কথা বলব। তুমি শোবে না?

মিতু হঠাৎ এ ঘরে এলে কেমন হবে?

কী আর হবে? ভাববে তার নতুন মামি মামার সাথে খুনসুটি করছে। লজ্জা পেয়ে পালিয়ে বাঁচবে।

এবার আমিও হেসে ফেললাম।

তোমার এমন উল্লসিত হওয়ার কারণটা খুঁজে পাচ্ছি না তো। বলবে নাকি

কেন বলব না? আমার বলার মানুষ জগতে তুমি ছাড়া আর কে আছে? তবে তোমার পাশে একটু শুতে দাও, এক্ষুনি বলছি।

আমি বিছানায় উঠে দুটো বালিশের একটি আলাদা করে রাখা মাত্রই আমার শোয়ার তোয়াক্কা না করেই সে শুয়ে পড়ল। মুখে আঁচল চাপা হাসি। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বললাম, দরজাটা বন্ধ করে আসি।

দরজায় ছিটকিনি এঁটে ফিরে এলে নন্দিনী উঠে বসল।

এত ভয় পাচ্ছ কাকে? তোমার স্ত্রী তো সব কথা জেনে শুনেই পালিয়েছে।

পালিয়েছে বলো না। বল দেশের প্রতি দায়িত্ববোধই তাকে লড়াই- এর ময়দানে ডেকে নিয়ে গেছে। হামিদার সাথে তোমার আমার কোনো তুলনা চলে না নন্দিনী। হামিদা ধর্ষিতা বাংলাদেশের প্রতীক। হামিদা দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ ও ইজ্জত সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে মৃত্যুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। হামিদাই এখন বাংলাদেশ নন্দিনী, হামিদাকে দেখে আমার লজ্জা লাগছে। মনে হচ্ছে এক ধরনের কাপুরুষতার মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি।

আমার নিজের গলা নিজের কাছেই উত্তেজিত শোনাল। নন্দিনীর দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না আমি। মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে থাকলাম। নন্দিনীও কোনো কথা বলছে না। এভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকলে আমি কেঁদে ফেলতে পারি এই ভয়ে আমি তার দিকে না ফিরেই বললাম, তুমি শোও, আমি টয়লেট থেকে আসি।

আমি উঠে দুয়ার খুলে বাইরে এলাম। আমার কামরাটায় এটাচড কোনো বাথরুম না থাকায় আমি ডাইনিং স্পেসের পাশে একটা বাথরুমে এসে নিজেকে সংবরণ করলাম। আমার এখন প্রকৃতপক্ষে টয়লেটের কোনো প্রয়োজনই ছিল না শুধু নন্দিনীর সামনে আবেগে- উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত কেঁদে না ফেলি এ ভয়েই এখানে পালিয়ে এলাম।

মিনিট দশেক পার হলে আমি মুখের উপর ঠান্ডা পানির ঝাপটা লাগিয়ে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজের কামরায় ঢুকে দেখি নন্দিনী বালিশের উপর তার অফুরন্ত চুলের সিক্ত গোছা

ছড়িয়ে দিয়ে ময়ুরীর মতো চোখ মুদে শুয়ে আছে। এই মুহূর্তে অপূর্ব রূপসী মনে হল নন্দিনীকে। তার সপ্রতিভ শূন্য গলায় কোনো কণ্ঠহার বা অলংকার না থাকায় গাত্রবর্ণকে সকালের আকাশের মতো স্নিগ্ধ মনে হল।

ঘুমিয়ে পড়লে মনে হচ্ছে?

না।

ঘুমাও না কেন, ঘুমাতে তো চেয়েছিলে?

আমি যথাসমভব গলাটা নিচু রেখে কথা বলতে চাইলাম। একটু আগে এমন উত্তেজিতভাবে হামিদার প্রসঙ্গ উত্থাপন যে ঠিক হয় নি এটা বুঝতে পেরেই যেন আমার গলার আওয়াজ অস্বাভাবিকভাবে খাদে নেমে এল।

নন্দিনী চোখ মুছে বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই আমার কথার জবাব দিল।

তুমি কাঁদছিলে?

না তো।

বৌদির জন্য তুমি কাঁদছিলে। কান্না লুকোবার জন্য টয়লেটে পালালে।

আমি কথার জবাব দিলাম না। চুপচাপ বিছানায় নন্দিনীর গা ঘেসে খাটের ওপর বসলাম।

হামিদা বৌদির এভাবে চলে যাওয়াটা তোমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে। অনুতাপ ও প্রেম তোমার হৃদয়কে খুবলে খাচ্ছে আমি জানি। আমি এসেছিলাম তোমার পাশে শুয়ে তোমাকে সান্ত্বনা দিতে। খুনসুটি করতে নয়।

নন্দিনী উল্টো দিকে পাশ ফিরলে তার বালিশের একাংশকে খালি হতে দেখে আমি আর কথা না বলে তার পাশে শুয়ে পড়লাম। আমাকে আরও একটু জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য নন্দিনী বিছানার আরও ভেতর এগিয়ে গেল। চুল সরিয়ে অন্য বালিশটা মাথার নিচে খুঁজে পাশ ফিরে কথা বলতে লাগল।

হামিদা বৌদি বীরনারী। বাংলাদেশের সাহসের প্রতীক। আমি তাকে হৃদয় থেকেই শ্রদ্ধা জানাই। সাক্ষাৎ হলে একথা অবশ্যই বলতাম। তবে তিনি ধর্ষিতা নন। ধর্ষিতা দেশমাতৃকার প্রতীক আমি।

কবি তুমি তো জানো বাঙালি নারীর চরমতম লাঞ্ছনার কালিমা নিয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি। কারো জন্যে সত্যি যদি কোনো মহৎ রচনা কবিরা সৃষ্টি করেন তবে আমার চেয়ে বড় উপমা অন্তত তোমার অভিজ্ঞতায় আর কেউ আছে কি? আমার জানা মতে নেই। কোনো শহীদের কথা বলতে গেলে সীমাদির মৃত্যুর যে ছবি তুমি চোখের সামনে দেখলে এর চেয়ে মর্মান্তিক বিষাদমাখা কী কোনো কবি কোনোদিন চাক্ষুস দেখেছে?

সেসব কথা এখন আমাকে কেন মনে করিয়ে দিচ্ছ নন্দিনী?

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। অতীত দুঃস্বপ্নের দিন ও রাতগুলো যেন এখন নন্দিনীর কথায় আমার মানসপটে চলচ্চিত্রের মতো ভাসতে লাগল।

তুমি বলছিলে না তুমি কাপুরুষতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছ? প্রকৃতপক্ষে প্রেমে কোনো কাপুরুষতা নেই। প্রেম- ভালবাসা অযৌক্তিক আকর্ষণ বলেই কবিরা এতে ডুবে যায়। তুমি আমাকে ভালবাসো বলেই যন্ত্রণা ও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছ। হামিদা বৌদিকেও তুমি একদা প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, কিন্তু তার বীরমূর্তি ও ভয়াবহ বিহ্বল প্রতিজ্ঞা তোমার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তুমি, আমি কেউ হামিদা বৌদির মতো সাহসী নই। তবে কাপুরুষও নই। আমরাও দেশের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য পালন করতে পারি।

কি রকম কর্তব্য?

আমরাও খানিকটা স্বার্থত্যাগ করে দেশের ভেতরে গিয়ে দুর্ভাগা মানুষের আর মুক্তিবাহিনীর সেবা করতে পারি। যুদ্ধে না হয় আনাড়ি বলে এগোতে পারব না। অন্য কাজ তো করতে পারি। পারি না কি?

নন্দিনীর কথায় আমি একটু চমকে গেলাম।

আমরা দেশের ভেতর গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও সেবা করতে পারি? সেটা কীভাবে সম্ভব? আমি বিছানা থেকে উঠে বসলাম।

তোমার কথা একটু খুলে বল নন্দিনী, আমরা কীভাবে আবার দেশের ভেতরে ঢুকতে পারি? কীভাবে, কোনো পথে কার কাছে আমরা যাব? কে আমাদের বিশ্বাস করবে?

আমি আবার খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেও নন্দিনী চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল। এখন তাকে একটা নিস্তরঙ্গ রহস্যময় সরোবরের মত লাগছে। আমিই আবার কথা বললাম, তোমার পরিকল্পনাটা আমাকে বল নন্দিনী, সাধ্যে কুলালে আমি তা করব।

সত্যি করবে কবি?

এবার সে লাফিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, আমি জানতাম তুমি রাজি হবে। আমার কথা শুনবে। তুমি তো কবি।

আমি হেসে বললাম, আগে তোমার প্রস্তাবটা শুনি তো?

এই তিন লক্ষ টাকা ও স্যুটকেসের সমস্ত কাগজপত্র আমরা প্রকৃত মালিকদের ফেরত দিয়ে কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গায় বিপ্লবীদের সাথে সম্পর্কিত মেয়েটির কাছে যাব। তার হাতে স্যুটকেসটা পৌঁছে দিয়ে আমাদের ভুল ও লোভের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমাদের একটু শেলটার দিতে বলব।

গলায় দৃঢ়তা মিশিয়ে কথা বলছে নন্দিনী। তার চোখের ভেতর যেন বাংলাদেশের এক বিশাল ছায়ামেদুর দীঘির টলমলানি।

আমি বললাম, নন্দিনী তুমি আরও ভেবে দেখো। এই টাকার স্যুটকেসটা তুমিই এনেছ। এর ওপর সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমারই, আমি মানি। তবুও বাংলাদেশের এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বাস্তু। এই স্যুটকেসের টাকায় আমরা বাঁচতে পারি। এমনকি সুখীও হতে পারি। এটা হেলায় হারানোর বোকামী না করাই সঙ্গত। একটু ভেবে দ্যাখো।

আমার কথা আমি তোমাকে খোলাখুলি বললাম কবি। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্ধেকটা অধিকার তোমার। টাকাটা ফেরত দিই বা না দিই। আমাদের ভাগ্য আমাদেরকে এক জায়গায় বহুদিন পর্যন্ত বেঁধে রাখার অবস্থায় এনে ফেলেছে। বরং আজ রাতটা তুমি চিন্তা করে দেখো। তবে যাই করতে হয় একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। সময় ও সুযোগ আমাদের জন্য অনন্তকাল দুয়ার মেলে রাখবে না।

নন্দিনীর কথার প্রতিটি শব্দই যেন পাথরের খণ্ডের মতো আমার লোভ ও অকর্মণ্যতার ওপর বৃষ্টি বর্ষিয়ে দিল।

০৭. অনেক চিন্তা- ভাবনার পর

দুদিন অনেক চিন্তা- ভাবনার পর আমি ও নন্দিনী স্থির করলাম টাকাটা আমরা প্রকৃত মালিক অর্থাৎ চুয়াডাঙ্গার ঠিকানায় পৌঁছে দেব। ব্যাগের ভেতর টাকার প্যাকেট এবং কাগজ পত্রের সাথে কাষ্টম কলোনীর যে মেয়েটির কথা চিঠিতে লেখা আছে সেখানে। যেভাবেই হোক ব্যাগটা পৌঁছে দিলে বিপ্লবীরা তাদের যুদ্ধকালীন কৃচ্ছতায় খানিকটা সচ্ছলতা অনুভব করবেন। তারা হয়তো ব্যাগটা খোয়া যাওয়াতে দারুণ অসুবিধায় আছেন। তাছাড়া গৌহাটি বিমানবন্দরে যে ভদ্রলোক

ব্যাগটা আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তার অবস্থাটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তিনি যদি ছাড়া না পেয়ে থাকেন তবে তার গ্রেপ্তারের খবরটাও তার সঙ্গীসাথীদের পৌঁছানোর নৈতিক একটা দায়িত্ব আমাদের ওপরই বর্তেছে।

টাকাটা ফেরত দেওয়ার প্রস্তাবে আমি প্রথম সম্মত হতে দ্বিধা করলেও নন্দিনীর নির্লোভ চেহারা ও বার বার মিনতিতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। তাছাড়া হঠাৎ পথে দৈবভাবে পাওয়া এই বিপুল অর্থে আমাদের যে বৈধ কোনো অধিকার নেই এই অনুশোচনাও আমাদের উভয়েরই মনে সম্ভবত অতিশয় গোপন ছাইচাপা আগুনের মতো জ্বলছিল। আর হামিদার হোটেলে আগমন এবং সব কিছু জেনেশুনেও ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ, সামাজিকতা, স্বামী ও পারিবারিক আশা আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞায় নন্দিনীর মনে পরাজিতের বেদনা সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এই যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সে। তার বোন হানাদার বাহিনীর গুলী বর্ষণে পথে প্রাণ হারিয়েছে। তারও নারীত্ব লুণ্ঠিত হয়েছে হানাদারদেরই সহযোগিদের হাতে। তার পক্ষে আকস্মিক স্বাচ্ছন্দ্য, কারো প্রেমময় সঙ্গ কিংবা পথে পাওয়া টাকায় নিরাপদ আশ্রয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যে অসম্ভব তা আমি উপলব্ধি করেই টাকাটা ফেরত দেয়ার উদ্যোগে রাজি হয়ে গেলাম।

একদিন দুপুরের খাওয়ার পর নন্দিনী আমার ঘরে এসে দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে আমার বিছানায় এসে বসল।

আমি বললাম, আমাকে কিছু বলবে?

আমাদের বোধহয় আর দেরি না করে স্যুটকেসটা চুয়াডাঙ্গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

গম্ভীর হয়ে বলল নন্দিনী।

আমি বললাম, আমার মনে হয় আমাদের নিজেদের চেষ্টায় কোনো কিছু সাব্যস্ত করার আগেই ইমামকে সবকিছু খুলে বললে কী করা যায় এর পরামর্শ চাইলে ভালো হয়।

এতে যদি ইমাম সাহেব ও পারুল রাজি না হয়? এখন তো যুদ্ধ। এ বিপদের সময় এরা যদি আমাদের এত টাকাকড়ি নিয়ে দেশের ভেতরে যেতে বারণ করেন?

ঘটানাটা ফাঁস করার ব্যাপারে নন্দিনীকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হল।

আমি বললাম, এরা কেন রাজি হবেন না? টাকাটা যেহেতু দেশের ভেতরকার একটা মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের। নীতিগতভাবে ইমাম এতে রাজি হবেনই। তবে তিনি এ প্রস্তাব দিতে পারেন টাকাটা

আমাদের বদলে এখান থেকে অপারেশনে যারা নিত্য যাওয়া আসা করছেন তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার।

আমি এতে রাজি হতে পারি না।

দৃঢ়তার সাথে অস্বীকৃতি জানাল নন্দিনী।

আমি বললাম, কেন?

এতে ঐসব মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হবে। আমরা যদি টাকাটা ফেরত না দিই এরা কোনোদিন আমাদের জিজ্ঞাসা করার জন্য খুঁজে বেড়াবে না। তারা আমাদের চেনে না। নাম ঠিকানাও তাদের অজানা। আমরা যদি অন্যের হাতে টাকাটা পাঠিয়ে এদের গোপনীয় অবস্থানকে অন্যের কাছে উন্মুক্ত করে দিই তবে এদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হবে। আমি তা করতে পারব না কবি। টাকা কেবল তুমি আর আমিই পৌঁছে দেব। পৌঁছে দিয়ে আমরা ক্ষমা চেয়ে এদের আশ্রয় প্রার্থনা করে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সামিল করে নিতে বলব। আমার ধারণা এরা আমাদের অবিশ্বাস করবে না।

নন্দিনীর কথায় আমি একটু চমকে গেলাম।

তোমার প্রস্তাবটা মন্দ নয়। তোমার বেশ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আছে নন্দিনী। আমি তো অত কথা ভাবতেও পারি নি। বিষয়টা মন্দ নয়। কিন্তু ইমামদের কিছুই না জানানো কী ঠিক হবে? আমরা বাংলাদেশের ভেতরে যেতে চাইলে ইমামের সহায়তা ছাড়া সেটা কীভাবে সম্ভব?

বললাম আমি।

নন্দিনী বলল, ইমাম ও পারুলকে সব কথা জানিয়েই আমরা যাব। তবে কারো হাতে টাকা ও গন্তব্যের ঠিকানা না দিয়ে ইমাম সাহেবের সহায়তায় অপারেশনে যাওয়া কোনো মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপই তো আমাদের বাংলাদেশের ভেতরে পৌঁছে দিতে পারে। চাইকি তারা আমাদের দর্শনা কাষ্টম কলোনীতেও ছেড়ে আসতে পারে। পারে না কি?

আমি হাসলাম।

নন্দিনী বলল, তাহলে আজ রাতেই এদের কাছে টাকা পাওয়ার ইতিহাস এবং আমাদের যাওয়ার প্রস্তাবটা তুলতে হবে।

কে তুলবে?

তোমার দ্বিধা থাকলে আমিই তুলব।

সেটাই বরং ভালো হবে। আমি সব কথা তোমার মতো গুছিয়ে বলতেও পারব না।

তবে যাওয়ার ব্যাপারে তোমারও খানিকটা দৃঢ়তা দেখাতে হবে। নইলে তোমার বোন তোমাকে জেনেশুনে বিপদের ভিতর যেতে দেব কেন?

অর্থবহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল নন্দিনী।

আমি বললাম, পারুল তোমাকেও যেতে দিতে সম্মত হয় কিনা সেটাই আগে দেখো।

হাসল নন্দিনী। বালিশের ওপর নখ খুটতে খুটতে বলল, তুমি হলে ভাই। যাকে তারা দেশ থেকে ডেকে নিয়ে এসেছেন বিপদ আপদ থেকে দূরে রাখার জন্য। আর আমি কে? আমি হলাম একটা বাড়তি বোঝা। যার আগমনে এই পরিবার, তোমার নিজের সংসারেই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। পারুল নির্বোধ মেয়ে নন। সবই তিনি বুঝতে পারছেন।

আমি একথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করেই থাকলাম। নন্দিনীর ধারণাটা অবাস্তব নয়। পারুল স্বভাবতই তার আচরণে এ ধরনের পক্ষপাত এতদিন গোপন রাখে নি। শুধু ইমামের নির্লিপ্ততার জন্যেই সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না।

.

রাতে খাওয়ার টেবিলে ইমামের ডান পাশের চেয়ারে নন্দিনী গিয়ে বসল। বাঁ পাশে পারুল। উল্টো দিকে বসলাম আমি আর মিতু। সাধারণত প্রায় প্রত্যেক দিনই নন্দিনী, আমি আর মিতু একদিকে বসি। আজ ইমামের সাথে কথা বলতে হবে বলেই নন্দিনী ইমামের ডানদিকে বসেছে। পারুল আবার সামান্যতম অস্বস্তিবোধ করে এ জন্যই সম্ভবত নন্দিনী আসন গ্রহণ করেই আগেভাগে বলতে শুরু করল, ইমাম সাহেবের সাথে আমার কিছু কথা আছে বলেই একটু কাছাকাছি বসলাম। আশা করি মিসেস ইমাম কিছু মনে করবেন না।

পারুল প্রথমে একটু হতভম্ব। পরে হেসে বলল, কী আশ্চর্য! আমি কিছু মনে করব কেন? আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন না। গোপনীয় বিষয় হলে বলুন আমি বরং কিছুক্ষণের জন্য উঠে যাই!

না আমার কথাগুলো আপনাকেও শুনতে হবে। উঠে গেলে চলবে না।

গলায় একটু গুরুগম্ভীর ভাব আনার চেষ্টা করছে নন্দিনী।

আমি কারো দিকে না তাকিয়ে প্লেটে ভাত তরকারি তুলে নিতে লাগলাম।

নন্দিনীর ভাবসাব দেখে ইমাম একটু অবাক হলেও মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার জন্য যেন তৈরি করে নিল। হেসে মুখ ফিরিয়ে বলল, বিষয়টা কী খুবই সিরিয়াস মিস নন্দিনী?

ইমামের প্রশ্ন এবার নন্দিনীর কপট গাম্ভীর্যের দেয়াল তার উচ্চকিত খিল খিল হাসিতে ভেঙে ছড়িয়ে গেল। সকলেই, এমন কী আমিও অকারণে হাসতে লাগলাম।

হাসি থামিয়ে নন্দিনী বলল, ইমাম ভাই, আমার আর কবির ওপর একটা গুরুতর দায়িত্ব বর্তেছে। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার দায়িত্ব। আপনার আর পারুলের অনুমতি ও সহায়তা পেলে আমরাও এই লড়াইয়ে কিছু করতে পারি।

পারুল আর ইমাম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আমার দিকে দেখল। আমি আর দ্বিধা না করে বললাম, আমরা একটা খুব জরুরি মিশনে দেশের মাটিতে ফিরতে চাই।

ইমাম কিছু আঁচ করার আগেই পারুল ত্রস্ত হয়ে বলল, বলেন কী ভাই? এই যুদ্ধের মধ্যে ঢাকায় ফিরতে চান?

আমি বললাম, না বোন আমার বিজয়ী না হয়ে কী করে ঢাকায় যাব? আমরা বরং বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে একটা শহরে যাব।

সীমান্তের কোনো শহরই এখন নিরাপদ নয়। তবে আপনারা কোথায় যেতে চান জানলে অবশ্য আপনাদের যাওয়া উচিত হবে কিনা সেটা বলতে পারব।

কৌতূহলী চোখ তুলে নন্দিনীর দিকে তাকাল ইমাম।

নন্দিনী বলল, আমরা দর্শনা কাষ্টম কলোনীতে যেতে চাই। সেখানে একটা মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপকে কিছু অর্থ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পড়েছে আমার আর কবির ওপর। আমরা স্থির করেছি আমরা সেখানে যাবই। রাস্তাঘাট আমাদের অচেনা বলে আপনার সাহায্য চাই। ওদিকে যেসব মুক্তিযোদ্ধা

আসা- যাওয়া করছেন আপনি কী তাদের কোনো দলের সাথে আমাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন না?

খুব পারি। তার আগে জানা দরকার আপনার ও কবি ভাইয়ের ওপর টাকা- পয়সা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বটা দিল কে?

ভাতের প্লেটে লোকমা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিল ইমাম। বেশ একটু উদ্বেগ নিয়ে আমার দিকেও তাকাল। নন্দিনী কিছু বলার আগেই আমি বললাম, ভাই আমরা আপনার কাছে কিছুই লুকোতে চাই না। এ দায়িত্ব কেউ আমাদের ওপর চাপায় নি। দৈবভাবে এ দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে এসে পড়েছে। আমরা গৌহাটি থেকে কলকাতার প্লেনে ওঠার আগে ওয়েটিং রুমে এক ভদ্রলোক অনেক মাল- সামান নিয়ে নন্দিনীর পাশের সীটের এসে বসে। প্লেনে ওঠার ডাক পড়লে একটা হ্যান্ড ব্যাগ একটু কষ্ট স্বীকার করে প্লেন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য ভদ্রলোক নন্দিনীকে মিনতি করতে থাকলে ভদ্রতার খাতিরে নন্দিনী ব্যাগটা নিয়ে প্লেনে উঠে যায়। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ডরা ভদ্রলোককে সিঁড়ির কাছে আটকায় এবং টানতে টানতে তাকে টার্মিনালের দিকে নিয়ে যায়। আমি ও নন্দিনী ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে থাকি। হোটেলে এসে ব্যাগটা খুলে আমরা এতে তিন লাখ টাকা, একটা গোপনীয় চিঠি ও কিছু কাগজপত্র পাই। চিঠি থেকে জানতে পারি এই টাকা মিঃ আলী নামক এক ভদ্রলোককে অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার জন্য পাঠানো হচ্ছিল। হ্যান্ডব্যাগটা দর্শনা কাষ্টম কলোনীর বি- ৩ নং হাউসের নাসরিন নামক দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রীকে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। এই হল কাহিনী। ঘটনাটা আগেই আপনাকে এবং আমার বোনকে আমার জানান উচিত ছিল। জানাতে পারি নি কারণ টাকাটার প্রতি আমার ও নন্দিনীর লোভ জেগে উঠেছিল। আমরা ভেবেছিলাম এই টাকায় আমি ও নন্দিনী যুদ্ধের সময়টা কলকাতায় সুখে কাটাতে পারব।

ঠিকই তো ভেবেছিলেন। এখন হঠাৎ আবার মতো পাল্টাতে যাচ্ছেন কেন? যখন অজ্ঞাত বিপ্লবীদের বোঁচকা পৌঁছে দেয়ার ভার আপনাদের ওপর কেউ চাপায় নি। তা ছাড়া এতে যে বিপদ আছে সেটাও ভাবতে হবে।

আমার কাহিনী শুনে মুহূর্তের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল ইমাম। পারুল তো সব শুনে খাওয়া রেখে হা করে ইমামের কথা শুনতে লাগল।

মিতু শুধু ছেলে মানুষের মতো বলে উঠল, বাবা তিন লাখ টাকা ফেরত দেবেন মামা। আমাকেই দিয়ে দিন না।

ফাজলামা করো না মিতু। বড়দের সব কথা শুনতে চাই। খেয়ে চুপচাপ ঘরে যাও।

মিতুকে ধমক দিল পারুল।

ইমাম একবার চোখ তুলে নন্দিনীর দিকে তাকাল, টাকাটা দর্শনায় নিজেরাই নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব বোধহয় আপনার?

প্রস্তাব নয়, প্রতিজ্ঞা।

সেখানে গিয়ে যদি কোনো বিপদে পড়েন?

সে রকম সম্ভাবনা তো আছেই।

আপনার সাহস আছে।

গম্ভীর হয়ে বলল ইমাম।

আমি বললাম, সাহসের কথা নয় ভাই। তার চেয়ে বড় কথা হল গ্লানিবোধ। টাকাটা একদল মুক্তিযোদ্ধার। যারা দেশের ভেতরে লড়ছে। একটা দুর্ঘটনায় আমাদের হাতে এসে পড়েছে। এখন আপনিই বিবেচনা করুন এ টাকা আমরা নিয়ে বসে থাকতে পারি কিনা। এ টাকা আমাকে ও নন্দিনীকে শান্তিতে ঘুমোতে দিচ্ছে না।

বেশ, আমি আপনাদের দর্শনা হল্টে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করব। তবে সেখানে পৌঁছার পর আপনাদের দায়দায়িত্ব আপনারাই বহন করবেন। আমাদের লোকেরা রাতের অন্ধকারে আপনাদের দর্শনার কাষ্টম কলোনীতে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে।

খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল ইমাম।

নন্দিনী বলল, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না। আমরা দেশের ভেতরে গিয়ে মুক্তি বাহিনীর সাথে মিশে দেশের জন্য কিছু করতে চাই। প্রাণ বাঁচানোর জন্য এখানে বসে থাকতে চাই না।

খাওয়া সেরে আপনারা বরং আমাদের কামরায় আসুন। বিষয়টা নিয়ে আরও আলোচনা করতে চাই। বিপদ- আপদের ভয় থাকলেও আপনাদের মনোভাবকে আমি সম্মান না করে পারছি না। যাচ্ছেন যখন বুকে সাহস নিয়েই যান। দেশের ভেতর কোটি কোটি মানুষ বিপদ মাথায় নিয়ে বেঁচে আছে না? তারাই আপনাদের আশ্রয় দেবে সাহায্য করবে।

অপ্রত্যাশিত আশ্বাসের কথা শুনিয়ে ইমাম তার কামরার দিকে চলে গেলে পারুল নিঃশব্দে খেতে লাগল।

আমি বললাম, পারুল বোধহয় একটু চিন্তায় পড়ে গেছে।

আপনারা জেনেশুনে বিপদের মধ্যে যাচ্ছেন।

ভয়ের কিছু নেই বোন।

আচ্ছা এমন হয় না যাদের টাকা তাদের হাতে পৌঁছে দিয়ে আপনারা আমাদের ছেলেদের সাথে আবার এখানে ফিরে চলে এলেন।

পারুল সত্যি ভাবনায় পড়ে গেছে।

নন্দিনী বলল, আমরা তো বোন দেশের মধ্যেই থাকতে যাচ্ছি। সেখানে থাকার আর কাজ করার সুযোগ পেলে এখানে কেন ফিরে এসে তোমাদের বোঝা হয়ে থাকব? তোমার হামিদা বৌদিকে তো আটকাতে পার নি। তার জন্যে তোমার ভাবনা হয় না?

সে কথা আর বলবেন না দিদি। ভাবির কথা ভাবলে আমার রাতে দুর্ভাবনায় ঘুম কেটে যায়। গত রাতটাও আমি ভাবির কথা ভেবে বিছানায় জেগে বসেছিলাম। এখন আবার আপনারা যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

খাওয়া শেষ করে পারুল মিতুকে নিয়ে উঠে গেল।

.

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা পারুলদের কামরায় ইমামের সাথে পরামর্শ করে ফিরে এলাম। স্থির হল তিনজন মুক্তিযোদ্ধা থিয়েটার রোডের অফিস বাড়ি থেকে আমাদের সীমান্তের কাছে একটা ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। আমরা কয়েকদিন সেখানেই থাকব। দেশের ভেতর থেকেই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এসে আমাদের ভেতর নিয়ে যাবে। শর্ত হল আমি ও নন্দিনী কোনো ব্যাপারেই কোনো কৌতূহল প্রদর্শন করতে পারব না। নিজেদের পরিচয় দিতে হবে স্বামী- স্ত্রী বলে এবং গ্রুপ কমাণ্ডারের আদেশ বিনা ওজরে মেনে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছব। কাষ্টম কলোনীর গেটে পৌঁছার পর এদের আর কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না। ইমাম এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের যাওয়ার আয়োজন। করবে। মোটামুটি এই ভাবে সব ঠিক হলে আমি ও নন্দিনী আমার কামরায় এসে বসলাম। নন্দিনী বলল, আজ একটু শান্তিতে ঘুমোব। আমি এবার উঠি, বেশ রাত হয়েছে।

আমি হেসে বললাম, রাতটা আজ এখানে কাটালেও পার, ভবিষ্যতে যখন স্ত্রীর ভূমিকায় গ্রামেগঞ্জে যেখানে সেখানে রাত কাটাতে হতে পারে।

ব্যাপার কী হঠাৎ এত দয়া?

ভবিষ্যৎ অজানা বলে লোভ জেগে উঠেছে।

হ্যাংলামো করে কত গা ঘেষাঘেষি করলাম। একবার যে ফিরেও তাকাল না তার মনে লোভ? বিশ্বেস হয় না কবি। এবার আমি ঘরে যাই।

নন্দিনী গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে দুয়ার মেলে দিলাম।

.

ইমামের ব্যবস্থামত এক সপ্তাহের পর আমরা সীমান্ত পার হয়ে কুষ্টিয়ায় একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে দর্শনা হল্ট মাত্র পাঁচ মাইল। আমরা পাঁচজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সাথে ভোর রাতের দিকে নিমতা গাঁয়ের এক স্কুল শিক্ষকের বাড়ির গোয়াল ঘরে পূর্ব ব্যবস্থামত আশ্রয় নিলাম। সন্ধ্যার একটু আগে একটা খালের পাড় ধরে পাঁচ মাইল এগিয়ে গিয়ে দর্শনা হল্ট থেকে একটি রিকশা নিয়ে কলোনীতে পৌঁছতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নূর মোহাম্মদ গোয়ালের খড় বিছানো একটা গাদার কাছে আমাকে ও নন্দিনীকে বসিয়ে দিয়ে এখানেই সারাদিন বিশ্রাম নিতে হবে বলে জানাল।

দিনটা আপনাদের দুজনকে এখানে থাকতে হবে। এখান থেকে মুহূর্তের জন্যও বেরুনো চলবে না।

নন্দিনী বলল, আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন তো?

না সিস্টার, আমাদের ডিউটি এখানে নয়। অন্যত্র আমরা অপারেশনে যাব। সেটা অনেকদূর। আপনাদের জন্য লোকেরা এসে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। ভয় পাবেন না। আমরা এখনই রওনা হচ্ছি। আপনাদের যা যা দরকার খাওয়া- থাকা সব এখানে বসেই যথাসময়ে পাবেন। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। অন্য ভাইয়েরা এসে ইঙ্গিত দিলেই বিনা দ্বিধায় তাদের সাথে রওনা হবেন। আচ্ছা আমি আসি।

বলে কমান্ডার নূর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকে থ্যাঙ্কস্ বলে তার হাতটা চেপে ধরলাম। নূর নিঃশব্দে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে গেলে স্কুল শিক্ষক আহমদ আলী একটি কিশোরীকে নিয়ে আমাদের খড়ের গাদার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনাদের চা- নাস্তা এখুনি এ মেয়েটি এনে দেবে। এর নাম সালেহা। আপনারা যতক্ষণ থাকবেন সালেহা আপনাদের

দেখশোনা করবে। হাতমুখ ধোয়ার দরকার হলে খড়ের ওপরই পানি ঢেলে সেরে নেবেন। এমন কী বাথরুমের কাজও। খবরদার বাইরে উঁকিঝুঁকি মারবেন না। আমি আসি।

আহমদ আলী সালেহাকে নিয়ে চলে গেলে আমি নন্দিনীকে বললাম, আসল মুক্তিযোদ্ধার জীবন বোধহয় আমাদের শুরু হল।

তোমার ভয় লাগছে?

সঠিক বললে বলতে হয় উৎকণ্ঠায় ভুগছি।

আমার কিন্তু একটুও ভয় লাগছে না বরং একটা কিছু করতে পারব ভেবে আনন্দই লাগছে।

বলল নন্দিনী।

এর মধ্যে সালেহা নামক কিশোরীটা এসে গোয়ালের স্বল্প সংখ্যক কয়েকটি গরু বাছুরের দড়ি খুলে বাইরে নিয়ে গেল। গোবর আর গরুর চেনার গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলেও আমরা খড়ের গাদার পাশে বিছানা খড়ের ওপর পরস্পরের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকলাম। আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নন্দিনী বলল, বাংলাদেশে আমাদের প্রবেশের এই প্রথম প্রভাত বেলায় আমাকে একটা আদরের চুমু খাও না কবি। নাও ঠোঁট দুটি এগিয়ে দিচ্ছি।

তুমি সত্যি পাগল নন্দিনী। বুঝতে পারছ না আমরা এখানে একটুও নিরাপদ নই। মাষ্টার সাহেবের সতর্ক করে দেয়ার পরও যদি এমন ছেলেমানুষী করো তবে আমাদের কোনো উদ্দেশ্যেই সিদ্ধ হবে না।

আমার কথায় নন্দিনী হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল, আমি প্রকৃতপক্ষে কবির উৎকণ্ঠা তাড়াতে চাই। যারা জীবন বাজি ধরে এখানে এসেছে তাদের আবার প্রাণের জন্য এত মায়া?

আমরা একটা মিশনে এসেছি ধরা পড়লে বা মরে গেলে মিশনটি বিফল হবে। তোমার মুখে এখন হাসি তামাশা মানায় না নন্দিনী।

তামাশা নয়, প্রেম।

প্রেমের চেয়ে বড় বিষয় হল ধরা না পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সেবা করা। টাকাটা পৌঁছে দিয়ে দেশের ভেতরে একটা কর্তব্য স্থির করা।

বললাম আমি। আমার কথা ফুরোবামাত্র খড়ের গাদার ওপাশ থেকে সালেহা টিনের একটা বড় থালায় চায়ের কাপ, চিতোই পিঠা, ডিম ভাজি ইত্যাদি এনে আমাদের সামনে রাখল। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, আপনারা খান। আমি পানির জগ আর গেলাস এনে দিই।

আমরা কোনোরূপ আওয়াজ না করেই গরম চিতোই পিঠা আর ডিমভাজিতে কামড় লাগালাম। হঠাৎ এমন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তা উদ্বেগে থাকার দরুণ বুঝতে পারি নি। নন্দিনী খুশি এবং ব্যঙ্গ মেশানো স্বরে বলে উঠল, এযে দেখছি প্রেমিক পুরুষের চুম্বনের চেয়েও মিষ্টি।

আমি হাসলাম কিন্তু নন্দিনীর বিদ্রুপের কোনো জবাব দিলাম না। নাস্তার পর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নন্দিনীর টাকার হ্যাণ্ডব্যাগটিতে মাথা রেখে খড়বিচালীর ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়া মাত্র ঘুমে দুচোখ বুজে এল। আমি নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমে ডুবে যেতে যেতে আমার সঙ্গিনীর হাসি- মস্করা শুনতে পেলাম। শুনতে শুনতেই স্বপ্নের উপত্যকায় একটি প্রচণ্ড গুলীবর্ষণের চিত্র দেখে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আর ঠিক তখনই আমার বিপরীত দিক থেকে কে একজন প্যান্ট আর পুলওভার পরা নারীযোদ্ধাকে দেখলাম হাতে একটি পিনখোলা হ্যাণ্ডগ্রেনেড হাতের তালুতে মুঠো করে ধরে আমার দিকে সক্রোধে ছুঁড়ে মারল। বোমাটা আমার মাথার কাছে প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হলে আমি চিৎকার করে খড়ের গাদার ওপর ঘুম ভেঙে বসে পড়লাম।

কি ব্যাপার, ঘুমিয়েই দুঃস্বপ্ন দেখলে নাকি?

নন্দিনীর গলা শুনে আমি চমকে তার দিকে চেয়েই বললাম, পানি খাব।

সে জগ থেকে পানি গড়িয়ে আমার মুখে ধরলে আমি পরম তৃষ্ণায় কাঁপতে কাঁপতে গেলাসের সবটুকু পানি ঢকঢক করে খেয়ে ফেললাম।

.

বেলা পাঁচটায় সালেহা একজন তরুণকে নিয়ে গোয়ালে এসে ঢুকল। আমি ও নন্দিনী দুপুরের খাওয়ার পর একটা দীর্ঘ দিবানিদৰা শেষ করে সবে জেগেছি। তরুণটি নন্দিনীর সামনে এসে বলল, আমার নাম কুদ্দুস। আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। আর দেরি না করে এখনই চলুন।

আমি বললাম, তুমি কী একাই আমাদের নিয়ে যাবে?

আমি নিয়ে যাব না। যারা নিয়ে যাবেন তাদের হাতে ছেড়ে আসব।

নন্দিনী বলল, আমরা যাত্রার জন্য রেডি।

তাহলে আল্লার নাম নিয়ে আমার পেছনে আসুন।

মুহূর্তের মধ্যে নন্দিনী হ্যাণ্ডব্যাগটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বলল, চলুন।

আমরা গোয়ালটার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা তখন লাল হয়ে পশ্চিম দিকে ঢলে গেছে। নিমতা গাঁটাকে অতিশয় দরিদ্র কৃষকদের একটি ছোটো গাঁ বলে মনে হল। ভোররাতের দিকে আমরা যখন গাঁয়ে প্রবেশ করি তখন আধো- অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারি নি। এখন চারিদিকে গোলপাতা কিংবা ছনের চালার নিচু কুঁড়ের ব্যাপকতা দেখে গ্রামটার দারিদ্র্য আন্দাজ করলাম। আমরা যখন বের হয়ে আসি সালেহাকে দেখলাম ঘরের ভেতরেই থেকে গেল। বাইরে এসে ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম। একেবারেই কচি বয়েস। ষোল- সতেরোর বেশি হবে না। ফর্সা গোলগাল চেহারা। গায়ে একটা সবুজ শার্ট ও খাকি রংয়ের প্যান্ট। পায়ে রবারের সেন্ডেল। আমি তার গা ঘেষে চলতে চলতে বললাম, এ গাঁয়ে হানাদারের হামলার ভয় আছে নাকি?

আছে। গত রাতে আমাদের পাশের গাঁয়ের হাটে পাকবাহিনী তিনজন চাল বেপারীকে শুধু শুধু গুলী করে মেরে ফেলেছে। আসলে তারা আমাদের মাষ্টার সাহেবের বাড়ির ঠিকানা খুঁজছে। যার বাড়িতে আপনারা এতক্ষণ কাটিয়ে এলেন।

আহমদ আলী সাহেব এ খবর জানেন?

জানেন।

খুব নিচুস্বরে জবাব দিল ছেলেটি।

এ অবস্থায় আমরা নিরাপদে দর্শনায় পৌঁছুতে পারব বলে ভাববো?

জানি না। আমার ওপর হুকুম আপনাদের নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের শেষ মাথায় তালগাছের নিচের প্রাইমারী স্কুলের বারান্দায় পৌঁছে দেওয়া। তারা সেখান থেকে আপনাদের নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, কুদ্দুস, আজ যখন বিপদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তখন আরও একটা দিন আশেপাশের কোনো আশ্রয়ে অপেক্ষা করে গেলে হয় না?

ছেলেটি হাসল, যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানকার গ্রুপ লীডারকে একথা বলবেন। আমাদের এলাকায় তো প্রতিদিনই লড়াই চলছে। পাল্টা মারও লাগান হচ্ছে। যারা আপনাদের নিয়ে যাবে তারা আজ সকালে খালের ভেতর একটা নাওয়ের মাঝে লুকিয়ে থাকা পাঁচজন পাকসেনাকে খতম করেছে। তারা খুব সাহসী দল। ঘাবড়াবেন না।

আর কোনো কথা না বলে আমরা কুদ্দুসের পাশাপাশি চলতে লাগলাম। গাঁয়ের ভেতরের ঘরবাড়িতে মানুষের সাড়াশব্দ পেলাম। একটা ছোটো পুকুরের ঘাটে দেখলাম মেয়েরা বাসন মাজছে। আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় কেউ কেউ মাথা তুলে অবাক হয়ে নন্দিনীকে দেখতে লাগল। দুএকটি নেংটা ছোটো ছেলেমেয়ে আমাদের পিছু নিয়েছে দেখে কুদ্দুস তাদের ধমক দিয়ে হাঁকিয়ে দিল।

কুদ্দুসের সাথে আমরা গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তের একটা স্কুলের বারান্দায় এসে উঠলাম। স্কুল বাড়িটা বেশ লম্বা। বারান্দাটায় ইটবাঁধানো। সামনে একটা ফাঁকা জায়গা। সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের এটাই খেলার মাঠ। মাঠের পূর্বপ্রান্তে তালগাছের সারি। কুদ্দুস বারান্দায় উঠেই ইশারায় আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলে তালবনের দিকে রওনা দিল। সূর্য এর মধ্যেই অনেকখানি নেমে ঢলে পড়েছে। গ্রামের দিকে তাকালে মনে হয় এটা একটা নিষ্প্রাণ লোকালয় মাত্র। গোধূলিবেলা হওয়া সত্ত্বেও কোনো গরুবাছুর চোখে পড়ছে না। শুধু বহুদূরে মধ্যগ্রাম থেকে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ অস্পষ্ট ভাবে কানে আসছে। আর এদিকে তালগাছের চূড়ায় বেলুনের মতো ঝুলে থাকা বাবুইয়ের বাসাগুলো ঘিরে হল্লা ও তর্কপ্রবণ অসংখ্য পাখির চিৎকারে জায়গাটা মুখর। আমার নিজের গ্রামের কথা অকস্মাৎ মনে পড়ায় আমি নন্দিনীকে বললাম, বাংলাদেশের গ্রাম-লোকালয়ের চেহারা আর জীবনযাপন সর্বত্রই এক।

এমন উদ্বেগ- উৎকণ্ঠার মধ্যেও এসব খুঁটিয়ে দেখার সময় আছে দেখছি? বাংলাদেশের কবিদের উদাসীনতা ও শহর- গ্রামে একই রকম। মাছের চোখের মতো পলকহীন।

নন্দিনীর কথায় আমি হেসে ফেললাম। চমৎকার উপমা তো! মাছের চোখের মতো পলকহীন। তোমার লেখালেখির অভ্যেস থাকলে মন্দ হত না।

কবি হওয়ার চেয়ে কবিকে দখল করে নেয়ার চেষ্টাটাই এমন কী আর মন্দ। তোমার অবর্তমানে তোমার কাব্যের সমালোচনা আমার দখলদারির জন্য না হয় একটু মন্দ বলবে। কিন্তু আমার সংস্পর্শে তোমার রচনা রসাতলে তলিয়ে গেছে একথা কেউ বলবে না আশাকরি। তুমি কী বল?

ঘাড় কাৎ করে একটা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে হাসল নন্দিনী। আমিও হাসলাম। এতক্ষণে বেলা গ্রামসীমান্তের বৃক্ষসীমার ওপর একদম তেজ হারানো আলোর বলের মতো লুটিয়ে পড়তে চাইছে। একবার তালবনের দিকে তাকালাম। কুদ্দুস আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলে এদিকে হেঁটে গেছে। নন্দিনী বলল, কুদ্দুস বোধহয় কাউকে ডেকে আনতে গেছে। আমরা এই স্কুলের বারান্দাটায় একটু বসলেও পারি।

আমি বুঝলাম নন্দিনী অনিশ্চয়তার ধুকপুকানিতে কাঁপছে। তার কথায় আমি নিজেই বারান্দায় ধুলোবালি ফুঁ দিয়ে সরিয়ে বসে পড়লাম। হ্যান্ড ব্যাগটার ওপর কনুই রেখে বললাম, বস।

নন্দিনীও বসল। ততক্ষণে বেলা পশ্চিমের মাঠের প্রান্তসীমার গাছের ছায়ার ভেতর অকস্মাৎ ডুবে গেল। যদিও পরিপূর্ণ অন্ধকারে এখনও নেমে আসে নি। তবুও ছায়ায় একটা আবরণের মধ্যে স্কুল বাড়িটা ও সামনের ফাঁকা মাঠটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাবুই পাখিদের কিচিরমিচির হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেছে। তালপাতার ঝুলন্ত বাসাগুলোকে মনে হচ্ছে ডাইনীদের শুকনো স্তনের মত। হঠাৎ ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, কুদ্দুস মনে হয় একটু দেরি করছে।

দেরি আর কই দেখলে, এই মাত্রতো ছেলেটা গেল। তুমি বরং একটা সিগ্রেট খাও টেনশন কেটে যাবে। আমাদের যারা নিয়ে যাবে তাদের দেখা পেলে তো ছেলেটা ফিরবে।

নন্দিনীর কথা শেষ হওয়া মাত্রই বারান্দায় দুটি মানুষের দীর্ঘ ছায়া দেখা গেল। তালবনের দিকে থেকে ছায়াদুটি স্কুলের বারান্দায় এসে উঠল। দুজনের কাঁধেই অস্ত্রের নল উঁচু হয়ে আছে। আমরা চুপ করে বসে থাকলাম। নন্দিনী অন্ধকারে আমার হাত চেপে ধরেছে।

মানুষ দুটি এগিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। একজন বলল, সিগ্রেটটা নিভিয়ে ফেলুন।

আমি মুহূর্তের মধ্যে সিগ্রেটটা জুতোর নিচে চেপে ধরলাম। বললাম, কুদ্দুস কোথায়?

কুদ্দুসের আর দরকার হবে না। আপনারা এখন আমাদের সাথে যাবেন। এখান থেকে দর্শনা হল্ট সাড়ে তিন মাইল পথ। পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

বলল একজন।

আমি আর নন্দিনী বিনাবাক্যে উঠে দাঁড়ালাম। হ্যান্ড ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, চলুন, আমরা রেডি।

রওনা হওয়ার আগে আপনাদের একটু সতর্ক করার আছে। প্রথম কথা হল পথ চলতে চলতে আমাদের কোনো প্রশ্ন করবেন না। চতুর্দিকে রাজাকার বাহিনী পাহারা বসিয়েছে। নিজেদের মধ্যে কোনো আলাপ আলোচনা চলবে না। পথে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে আপনারা কোনো জবাব দেবার চেষ্টা করবেন না। যা বলতে হয় আমরা বলব। তেমন অবস্থায় পড়লে আপনারা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবেন। আমরা এখন যেদিকে হাঁটা দেব ঠিক সেদিকে নাক বরাবর হেঁটে গেলে আপনারা দর্শনা হল্ট স্টেশনে পৌঁছে যাবেন। কাউকে কোনো প্রশ্ন করার দরকার নেই। ভয় নেই, পথে কোনো চ্যালেঞ্জে না পড়লে আমরাই আপনাদের দর্শনার কাষ্টম কলোনীতে পৌঁছে দেব। পথে কোনো বিপদ ঘটলে কী করতে হবে তাই শুধু জানালাম। আমার

নাম মোজাফফর। আমি এখানকার মুক্তিবাহিনীর গ্রুপ লীডার। আর আমার সঙ্গীর নাম লতিফ, ট্রেইন্ড ফাইটার।

আসসালামু আলাইকুম।

লতিফ আমার সাথে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। আমিও সালামের জবাব দিয়ে বললাম, আমরা বোধহয় আপনাদের ওপর বাড়তি বোঝার মতো চেপে গেছি।

মোজাফফর হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে বলল, বোঝা কেন হবেন। আপনারাও যতদূর জানি দেশের জন্যই বিপদ মাথায় নিয়ে দেশের ভেতর চলাফেরা করছেন। হরহামেশাই আমরা লোকদের চলাফেরায় সাধ্যমত সাহায্য করছি। আজ দুদিন ধরে শত্রুরা এই অঞ্চলে খুব সতর্ক হয়ে উঠেছে। এখানকার কয়েকটি অপারেশন পাক বাহিনী মার খেয়ে পাগলের মতো যাকে তাকে খুন করছে। রাজাকাররাও খুব এ্যালার্ট। এ অবস্থায় আপনাদের দায়িত্ব এসে পড়ায় একটু সাবধান থাকা দরকার। আচ্ছা আপনাদের কেউ হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে জানেন?

আমি বললাম, না আমাদের কারো গ্রেনেড ছোঁড়ার কোনো ট্রেনিং নেই। তবে শিখিয়ে দিলে পারব।

না, মুখের কথায় মুহূর্তের মধ্যে শিখিয়ে দিলে পারবেন না। নিজের অস্ত্রে নিজেরাই মারা পড়বেন। জানা থাকলে দুটি গ্রেনেডও দুজনের হাতে দিতাম। এখন কথা নয়, চলুন।

বললেন মোজাফফর।

আমরা তার কথামতো তার পেছন চলতে শুরু করলাম। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চতুর্দিকে ঝিঁঝি পোকার শব্দ গ্রাম্য পথঘাট মুখর। আমরা যাদের অনুসরণ করে হাঁটছি তাদের নাম জানলেও স্পষ্ট ভাবে মুখ দেখতে পাই নি। এখনও মোজাফফর ও লতিফ আমাদের কাছে দীর্ঘতর ছায়া মাত্র। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের মুখাবয়ব কেমন তা বোঝা যায় নি। পথে নেমে এরা এমন নিঃশব্দে আঁটছে যে এদের সতর্কতার প্রভাব আমাকে ও নন্দিনীকেও নিশ্চুপ করে দিয়েছে। আমরা শুধু হেঁটে যাচ্ছি। গ্রামের পথ, জমির আইল আর কখনও কখনও কোনো গৃহস্থের উঠোন ডিঙিয়ে এবং পুকুরের পাড় মাড়িয়ে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। কী এক ধরনের উদ্যম যেন আমাদের সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। নন্দিনী আমার বাঁ হাতটা আঁকড়ে ধরে হাঁটছে। সে চলতে চলতে নিজেই শাড়ির আঁচল শক্ত করে কোমরে পেঁচিয়ে নিয়েছে। তার চলা দেখলে মনে হবে সারারাত হাঁটলেও সে ক্লান্ত হবে না। মাঝে মাঝে আমার ডান হাতটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য হ্যান্ড ব্যাগটা আমার হাত থেকে নিঃশব্দে কেড়ে নিয়ে হাঁটছে। আবার নিজের হাতকে বিশ্রাম দেবার জন্য আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সবি চলছে মুখে একটিও শব্দ উচ্চারণ না করেই।

মাঝরাতে আমরা একটা বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। রাস্তায় পা দিয়েই মোজাফফর বললেন, এবার আমরা একটু কথা বলে নিতে পারি। আপনি ইচ্ছে করলে একটা সিগ্রেটও খেয়ে নিতে পারেন। এখান থেকে কলোনীটা খুবই কাছে। একটু এগোলেই বাতি চোখে পড়বে।

নন্দিনী বলল, তাহলে ও একটা সিগ্রেট খেয়ে নিক আর আমি একটু পথের উপর বসি। পা দুটো একটু ভারী লাগছে।

মোজাফফর মনে হল একটু লজ্জিত হয়ে হাসলেন।

হ্যাঁ, আপনার কথা এতক্ষণ একটুও বিবেচনার মধ্যেই আনা হয় নি। একটানা বহুদূর হেঁটে এসেছেন। আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। আপনি একটু বসে বিশ্রাম নিন। আমরা বরং তিনজন তিনটা সিগ্রেট ধরাই।

বললেন মোজাফফর। আমি তার কথা শেষ হওয়া মাত্র আমার পকেট থেকে প্যাকেট খুলে এদের দুজনকে সিগ্রেট অফার করলাম।

মোজাফফর ও লতিফ একটু সংকোচের সাথে আমার কাছে থেকে সিগ্রেট নিলেন। লতিফ হেসে বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে সিগ্রেট ধরাতে দিই নি বলে খুব শরম লাগছে।

আমি হাসলাম। মোজাফফর বললেন, কাজ শেষ হলে কী এ পথেই ফিরবেন?

নন্দিনী বলল, একথা তো এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছি না ভাই। আদৌ ফিরব কিনা সেটাই জানি না।

যদি ফেরেন কিংবা ফেরার সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময় দিতে পারেন তবে বলুন আমাদের স্থানীয় কর্মীরা এগিয়ে এসে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, তেমন সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সময় আমরা এই মুহূর্তে দিতে পারছি না। যদি ফিরি তবে যাদের কাজে যাচ্ছি তারাই আশা করি ফেরার ব্যবস্থা করবে।

ঠিক আছে। এবার চলুন হাঁটি।

বললেন মোজাফফর।

আমি সিগ্রেট ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। নন্দিনী বলল, এবার ব্যাগটা বরং আমাকে দাও আমি নিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটি। কলোনীর গেটে পৌঁছে তোমায় হাওলা করে দেব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দর্শনা কাষ্টমস্ কোয়ার্টারগুলোর গেটে এসে উপস্থিত হলাম। মোজাফফর বলল, যদি আপনারা কিছু মনে না করেন তবে এখান থেকেই আমরা বিদায় নেব। আমাদের ওপর ভার ছিল আপনাদের এ পর্যন্তই পৌঁছে দেয়ার। আমার মনে হচ্ছে কলোনীর ভেতর আপনাদের কোনো বিপদ নেই। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, রাত দুটোর গাড়িতে যশোর থেকে এসেছেন। আপনারা যাদের কাছে এসেছেন তাদের নাম বললেই কোয়ার্টার দেখিয়ে দেবে।

মোজাফফর ও লতিফ আমার সাথে করমর্দন করে ও নন্দিনীকে সালাম জানিয়ে বিদায় দিল। আমরাও দেরি না করে কলোনীর গেটে এসে ঢুকলাম। ঢুকেই একজন পাহারাদারের সামনে পড়ে গেলাম। নন্দিনী এ অবস্থায় একটু অপ্রতিভ না হয়ে সোজাসুজি পাহারাদারের সামনে এগিয়ে গেল, আমরা রাতের গাড়িতে যশোর থেকে এসেছি। এখানে নাসরিনদের কোয়ার্টারটা কোনো দিকে একটু দেখিয়ে দেবেন?

সশস্ত্র পাহারাদারটা সম্ভবত একটু উদাসীন। সে নন্দিনীর দিকে ভাল করে না তাকিয়েই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, গেটে আপনাদের রিকশা থাকলে ভেতরে নিয়ে যান। দক্ষিণ সারির প্রথম বাড়িটাই নাসরিনের আম্মার। আপনারা কী রিকসা ছেড়ে দিয়েছেন?

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, রিকশাঅলা গেটের ভেতরে যেতে চায় না। বলে রাতে ভেতরে ঢোকা নাকি বারণ। এজন্যই তো রিকশা ছেড়ে দিলাম। এখন কী করি বলুন তো।

এখন কী আর করবেন। সোজা হেঁটে চয়ে যান। ঐযে লাইট পোস্টটা দেখা যাচ্ছে এর নিচের টিনের শেডগুলোই নাসরিনের মায়ের কোয়ার্টার। আপনারা তার কী হন?

আমি তার বোন। আর ইনি আমার স্বামী।

বলল নন্দিনী।

আপনারা যশোর থেকে এসেছেন। যশোরের খবর কী? শুনলাম সেখানে মুক্তিবাহিনী খুব মার লাগাচ্ছে?

আমি বললাম, শুনেছি তো সারাদেশেই এরা সুবিধা মতো মার লাগাচ্ছে। তবে চোখে তো দেখি নি, তাই বলতে পাচ্ছি না। বিশ্বাস করি কী করে? সব জায়গা থেকেই তো খানসেনাদের

দাপটের কথা শুনছি। ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে, গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এইসব।

আরে রাখুন সাহেব। হারামজাদা এখন মুক্তিবাহিনীর ভয়ে কাঁপছে। বেটারা নির্ঘাত হারবে। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনছেন তো। স্কুল কলেজের ছেলেদের মার খেয়েই খান সাবরা চোখে সর্ষেফুল দেখছে। সারা দেশে একটা মানুষও এদের পক্ষে নেই। এ অবস্থায় যুদ্ধ করবে কী?

বলল পাহারাদার। বেশ খুশি খুশি ভাব। বুঝলাম এ লোক আমাদের কোনো অনিষ্ট করবে না। মুক্তিবাহিনীর কৃতিত্বে এ আনন্দিত। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নাসরিনদের কোয়ার্টারের দিকে হাঁটা ধরলাম।

কোয়ার্টারের সামনে এসে নন্দিনী বলল, কবি আমার বুক কাঁপছে।

আমি বললাম, এখানে এই লাইট পোষ্টটার নিচে একটু দাঁড়াও। আগেই ঠিক করে নিই কেউ দরজা খুলে দিলে কী বলবে।

যা বলতে হয় আমিই বলব। যার ব্যাগ আমরা যেহেতু তার নামটাও জানি না, শুধু একটা চিঠি পড়ে জানি টাকাটা ও কাগজপত্র এই কলোনীতে নাসরিন নামের একটি স্কুলছাত্রীকে পৌঁছে দেয়ার ইঙ্গিত আছে, এর বেশিকিছু আমরা করতে বা বলতে যাব না। এরা যদি বেশি প্রশ্ন করে তখন বলব আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ওপর ভরসা করেই টাকাটা নিয়ে এখানে এসেছি। এরা যদি সন্দেহ করে এদের বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, করতে পারে, আমরা কোনো জবাব দেব না।

বলল নন্দিনী।

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। লাইট পোষ্টের আলো এসে দরাজায় পড়ায় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কপাটের একদিকে আলকাতরা দিয়ে ইংরেজি সেভেন সংখ্যাটি লেখা। সম্ভবত এটাই কোয়ার্টারের নাম্বার। আশেপাশের কোয়ার্টারগুলো খুব বেশি দূরে নয় পনের বিশ গজ দূরে দূরে এক একটা বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির সামনে এক চিলতে বাগান। গাদাফুলের ঝোপ থেকে এক ধরনের বন্য গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কড়া নাড়ার পরও ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে আমি আবার একটু জোরে দরজার পাটে আঘাত করলাম। এবার ভেতর থেকে খুব ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি জবাব দিলাম, দরজাটা খুলুন, আমরা আপনাদের মেহমান।

ভেতর থেকে বেশ ক্ষীণ কণ্ঠে কে যেন বলল, এতরাতে কে আপনারা? আম্মা তো বাড়িতে নেই, বেনাপোল গেছেন। দরকার থাকলে কাল সকালে আসবেন। এতরাতে আমি দুয়ার খুলব না। বাসায় আমি একা আছি। আপনারা সকালে আসবেন।

সতর্ক মেয়েলী গলা। এবার নন্দিনী এগিয়ে এসে দরজার পাশে দাঁড়াল। এবং বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে ভেতরের মেয়েটিকে ডাক দিল, শোন নাসরিন। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

শুনতে পাচ্ছি। কী বলছেন বলুন। আপনি কে?

আমাকে তুমি চিনবে না নাসরিন।

আমি চিনবো না, তবে আমার নাম জানলেন কী করে?

কীভাবে তোমার নাম জানলাম এটা বলতেই তো নানা বিপদের মধ্যে এতো দূর এসেছি। নাসরিন, তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা তোমার বা তোমাদের শত্রু নই। বরং বন্ধু। তোমাদের সাহায্য করতেই এসেছি। খুব বিপদ মাথায় নিয়ে এসেছি। আমাদের এভাবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। আমরা তোমাকে একটা ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে এসেছি।

খুবই অনুচ্চকণ্ঠে, বেশ আবেগ মিশিয়ে নন্দিনী কথাগুলো বলল । কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাসরিনের আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মনে হল নাসরিন বেশ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছে কী করতে হবে ভেবে পাচ্ছে না।

এবার আমি ডাকলাম, নাসরিন।

না, আমি এভাবে এতরাতে আপনাদের জন্য দুয়ার খুলে দেব না। আপনারা এখন চলে যান। সকালে আসবেন। তাছাড়া আপনারা কে আমি তো চিনতেই পারছি না। কোনো ম্যাসেজ থাকলে বাইরে থেকেই তো বলতে পারেন।

বেশ জেদের সাথে নাসরিন আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে নন্দিনী মুখ বাড়িয়ে নাসরিনকে ডাকল, শোন নাসরিন, যদি আমাদের সন্দেহ করে দুয়ার খুলতে ভয় পাও তবে ঐ পাশের জানালাটা খুলে আমাদের সাথে একটু কথা বল। আমরা বহুদূর থেকে তোমার কাছে এসেছি। তোমাদের সাহায্য করতেই এসেছি। এখানে থাকার আমাদের কোনো পরিচিত জায়গা নেই। আমরা এখন কোথায় যাব বলতো? তুমি আশ্রয় না দিলে আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব।

এবারকার অনুরোধে মনে হয় একটু কাজ হল। নাসরিন বলল, বাঁ দিকের জানালার কাছে সরে আসুন।

আমরা দ্রুত দরজা ছেড়ে বাঁদিকের অন্ধকার জায়গাটায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে একটা কচুবনের ওপর সম্ভবত কোয়ার্টারের একটা জানালা আছে। আমরা এদিকটায় সরে এসে দাঁড়াতেই অন্ধকার দেয়ালের মধ্যে একটা জানালা খোলার শব্দ পেলাম। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পেলাম না। একটা টর্চের আলো এসে নন্দিনীকে ও আমাকে মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত করেই নিবে গেল। আকস্মিক আলোর কম্পিত বিনিময়ের ভেতর জানালায় মেয়েটিকে স্পষ্ট না বুঝলেও তার হাতে একটা উদ্যত পিস্তলের আভাস পেলাম। মেয়েটি অর্থাৎ নাসরিন বলল, আপনারা এতরাতে কোত্থেকে এসেছেন?

আমি কিছু বলার আগেই নন্দিনী বলল, কলকাতা থেকে।

আপনারা কে?

জবাবে আমি বললাম, আমার নাম সৈয়দ হাদী মীর। আর ইনি নন্দিনী চক্রবর্তী।

আপনারা স্বামী স্ত্রী?

নন্দিনী বলল, হ্যাঁ।

কোন গ্রুপের নোক আপনারা?

আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি জোগালে আমি নির্দ্বিধায় জবাব দিলাম, আমরা নিমতার মোজাফফর গ্রুপের লোক। এই ব্যাগটায় তোমার জন্য জরুরি ম্যাসেজ আছে বলেই আমরা সুদূর কলকাতা থেকে নিমতার সালাম মাস্টারের বাড়ি হয়ে এখানে এসেছি। তুমি যদি এক্ষুনি দুয়ার খুলে না দাও আমরা বাধ্য হয় তোমার জন্যে আনা ব্যাগটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেতে। যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানালাটা অন্ধকার হয়ে থাকল। নাসরিন কোনো জবাব দিচ্ছে ।

আরও খানিকটা সময় অপেক্ষা করে নন্দিনী কোমল গলায় ডাকল, নাসরিন।

বলুন।

এই ব্যাগটায় তোমার জন্য একটা চিঠি আছে। বাতিটা জ্বালো আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তোমাকে দিচ্ছি। নাসরিন একথার কোনো জবাব না দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর কী ভেবে হঠাৎ বলল, ওদিকে আসুন দুয়ার মেলে দিচ্ছি।

আমরা আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটা শব্দ করে দরজা খুলে গেলে ভেতর থেকে পিস্তল হাতে একলাফে নাসরিন লাইটপোস্টের আলোয় মধ্যে বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে পিস্তলের তাক রেখে বলল, আপনাদের সাথে কোনো হাতিয়ার থাকরে মাটিতে রেখে দিন। তাড়াতাড়ি করুন।

নাসরিনের এই আকস্মিক মুক্তিযোদ্ধাসুলভ দক্ষতায় মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেলেও আমি পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় বললাম, আমাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই নাসরিন। তুমি চেক করতে পার।

ঠিক আছে যে ব্যাগটা আমাদের দিতে এনেছেন তা মাটিতে নামিয়ে রাখুন।

ব্যাগটা তখন নন্দিনীর হাতে থাকায় সে নাসরিনের কথা অনুযায়ী কাজ করল। ব্যাগটা মাটিতে রাখা মাত্র নাসরিন সেটা ছোঁ মেরে নিজের হাতে তুলে নিল।

আপনারা এবার ঘরের ভেতরে যান।

আমরা তার কথামত কপাট পেরিয়ে অন্ধকার কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। নাসরিন বাইরে থেকে অকস্মাৎ দরজার দুটি পাট টেনে এনে সম্ভবত তালা মেরে দিল। টিপ তলার বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। সবটা ঘটনা এমন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল যে আমি ও নন্দিনী উভয়েই হতভম্ব। কিন্তু নাসরিনককে আমি বা নন্দিনী স্পষ্ট ভাবে কেউ একবারও দেখতে পারি নি। শুধু বুঝতে পেরেছি মেয়েটা বয়েসে কিশোরী হলেও বেশ লম্বা এবং শারীরিক শক্তির অধিকারিণী। হয়তো বা যুবতীই হবে। শুধু তার চেহারাটাই কোনো আলোর ঝলকের মধ্যে একবারও স্পষ্ট দেখার সুযোগ ঘটে নি। তবে গলায় আওয়াজটা খুব মিষ্টি।

নন্দিনী তার হতভম্ব ভাব কাটিয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, আমাদের কী আটক করলে নাসরিন?

কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সকাল পর্যন্ত এভাবেই এখানে থাকতে হবে। আমি আমার পার্টির লোকদের কাছে ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা যদি সত্যি কোনো ক্ষতি করতে না এসে থাকেন তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনারা যদি শুয়ে বিশ্রাম নিতে চান তবে ঘরের ভেতর বিছানা পাতা আছে শুয়ে পড়ুন। আলো জ্বালার দরকার হলে কপাটের পাশেই সুইচ বোর্ড আছে

দেশলাই জ্বেলে দেখে নিন। বেশি হই চই করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না। এ কলোনীতে কয়েক ঘর পাকিস্তানী আছে আবার তাদের সাপোর্টারও কয়েকজন আছে। খুব সাবধানে থাকতে হবে, বুঝলেন?

নন্দিনী বলল, আমরা সবই বুঝতে পারছি নাসরিন। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। পালাবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমরাও তোমাদের সাথেই থাকতে চাই। তোমাদের সাথে থেকে লড়তে চাই। আর একটা কথা, যে ব্যাগটা নিয়ে যাচ্চো ওতে লাখ তিনেক রূপীর ভারতীয় কারেন্সী আছে। টাকাটা তোমাদের। ব্যাগটা সাবধানে নিয়ে যেও।

ঠিক আছে, এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ুন। আমি আমাদের লোকজনের কাছেই যাচ্ছি।

বলল নাসরিন।

আমি পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে বললাম, আলো জ্বালছি তুমি সুইচটা কোথায় দেখে নিয়ে বাতি জ্বালো।

বাতির কী দরকার? তোমার দেশলাই থেকে আর একটা কাঠি জ্বেলে বিছানাটা কোথায় পাতা আছে দেখে নিলেই তো হয়। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না কবি।

নন্দিনীর কথায় আমি আর একটা কাঠি জ্বালালাম। বসার ঘর ছেড়ে আমরা একটু ভেতরে গেলেই একটু সুসজ্জিত কামরা দেখতে পেলাম। এখানেই একটা বিছানা পাতা। নন্দিনী সোজা গিয়ে বিছানায় পড়ল। কাঠিটা নিবে গেলে আমিও গিয়ে বিছানায় বসলাম।

যাক আমাদের ওপর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। হ্যান্ডব্যাগটা বুকের ভেতর পাথরের মতো চেপে বসেছিল। এখন যাদের টাকা তাদের হাতে পৌঁছে যাবে।

বলল নন্দিনী।

আমি বললাম, আমি কিন্তু তোমার মতো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমরা এখন যাদের আওতায় এসেছি তারা স্বাভাবিক মুক্তিযোদ্ধা নয়। এরা আন্ডারগ্রাইভে থেকে বহুদিন আগে থেকে স্থানীয় শোষক- পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং সম্প্রসারণবাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সাম্প্রতিক মুক্তির লড়াই এদের জন্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে মাত্র। এরা যে আমাদের বন্ধুভাবে নেবে তা আগে থেকেই আন্দাজ করে বসে থেকো না। এরা সহজে আমাদের বিশ্বাস করবে না।

এখন ভাগ্যের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর উপায় কী?

আমার খুব খিদে পেয়েছে নন্দিনী।

তবে তো বাতিটা জ্বালতে হয়। খুঁজলে নিশ্চয়ই কিছু খাবার জুটে যাবে। দেশলাইটা দাও আমি সুইচ বোর্ডটা কোনদিকে দেখি।

নন্দিনীর কথামত আমি দেশলাই তার হাতে নিলাম। বুঝতে পারলাম নন্দিনীও খিদেয় কাতর। সে কাঠি জ্বেলে দরজার পাশে সুইচবোর্ড খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বালাল। বেশ পরিপাটি করে সাজানো একটা মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর কোয়ার্টার বলেই ধারণা হল। আলনায় পরিপাটি করে সাজানো রংবেরঙের শাড়ি ব্লাউজ জুতো। একটা বুক সেলুফে বেশকিছু বইপত্র। ড্রেসিং টেবিলের পাশে একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। ছবিতে একজন মধ্যবয়ক শুল্ক বিভাগে কর্মরত মহিলার সাথে একটা চৌদ্দ- পনেরো বছরের কিশোরী দাঁড়ানো। ছবি দেখে মনে হয় উভয়েই বেশ ফর্সা। কিশোরীটির মুখমণ্ডল চিবুকের দিকে একটু লম্বমান। বেশ সুন্দর চেহারা। সম্ভবত এই মেয়েটি নাসরিন। পাশের মহিলাকে কাস্টমস- এর পোশাকে বেশ স্মার্ট বলেই মনে হল। মহিলা খুব দীর্ঘাঙ্গীই হবেন। মেয়েটিকে সামনে রেখে দুই কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। মা মেয়ে দুজনেই হাসিমুখ।

নন্দিনী ততক্ষণে খাবার আলমারিটা তন্ন তন্ন করে দেখছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিছু পেলে?

ভাতের ডেগ ধোয়ামোছা। তবে প্রচুর ডাল পড়ে আছে। আর একটা সরায় গোটা চারের মুরগির ডিম। একটা ব্যাগে চাউলও আছে। চুলাটা খুঁজে পেলে ভাত চাপিয়ে দিতে পারতাম।

হেসে বলল নন্দিনী।

আমি হেসে বললাম, তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খুঁজে বের করে। তোমার কথা শুনে খিদে আরও বেড়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এদিকে কেরোসিনের চুলোয় রাঁধা হয়। রান্না ঘরটা খুঁজে পেলে সব পাবে। জান তো কাল সকালে যাদের পাল্লায় পড়ব তারা কেমন আচরণ করবে তা এখনই আঁচ করা যাচ্ছে না। হয়ত কয়েকদিন খেতেই দেবে না।

আমি কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছি না। যারা নিঃস্বার্থভাবে একটা অর্থের ভাণ্ডার অপরিচিত লোকদের হাতে তুলে দেয় তাদের প্রতি জামাই আদর না করলেও প্রাণে মারবে না বলেই ভরসা করি।

ঘরের সবগুলো বাতি স্যুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিতে দিতে জবাব দিল নন্দিনী। রান্নাঘর খুঁজতে ঘরটার পেছনে কপাট মেলে দিয়ে বলল, এই তো পেয়েছি।

রান্নাঘর?

তাই তো মনে হচ্ছে।

দাঁড়াও আমিও আসছি।

বলে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিছানার ওপর নাসরিনের টর্চটাও পাওয়া গেল। আমি টর্চটা হাতে নিয়ে নন্দিনীকে সাহায্য করতে এগোলাম। নন্দিনী অল্পক্ষণের মধ্যেই রান্নাঘরের চুলা চাক্কি বের করে ফেলে হেসে বলল, এখানে রান্নাবান্নার সবকিছুই মজুত আছে কবি। আমাকে আর তেমন সাহায্য করতে হবে না। তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও আমি দুজনের খাওয়ার মতো সামান্য চাল ফুটিয়ে আনি। আসলে আমারও পেট চো চো করছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নন্দিনীর ভাত রান্না ও ডিম ভাজি হয়ে গেল। নন্দিনী বাসি ডালটাও গরম করে ডেগ শুদ্ধ টেবিলে এনে রাখল। ঘরের পাশের টিপ কল থেকে জগ ভর্তি পানিও নিয়ে এসে বলল, এসো শুরু করা যাক।

আমি টেবিলে বসতে গিয়ে হেসে বললাম, এই বোধহয় তোমার আমার প্রথম ঘরকন্না। হোক ডিমভাজি আর ডাল, অমৃত সমান লাগবে।

আমার রান্না নিয়ে আজ অন্তত ঠাট্টা করো না কবি, ভগবানের দোহাই। আমি অল্পসল্প রান্নাটা জানি। আজ এই মুহূর্তে এর পরীক্ষা নিতে চেও না। খিদেয় বুক জ্বলছে। একটু নুন মাখিয়ে হলেও চারটি ভাত পেটে পড়ুক।

নন্দিনীর কথায় আমিও লজ্জা পেয়ে হাসলাম, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। এসো শুরু করা যাক। আমি গরম সসপেনে পাশাপাশি সাজিয়ে আনা দুটি ডিমভাজির একটা ভাতের প্রেটে তুলে নিলাম। নন্দিনী ধোয়া- ওড়া গরম ভাত একটা পিতলের চামচে তুলে আমার পাত ভর্তি করে দিয়েছে।

আমি নিমকদান থেকে একটু নুন তুলে নিয়ে পাতে রেখে ভাত মাখাতে লাগলাম। প্রথম লোকমা তোলার সাথে সাথেই কোয়ার্টারের প্রবেশ দরোজায় তালা খোলার শব্দ পেলাম। নন্দিনীও উৎকণ্ঠিত হয়ে শব্দটা শুনল।

দুয়ার খুলে বেশ কয়েকজন লোক ঘরে প্রবেশ করছে অনুভব করা মাত্রই কয়েকজন সশস্ত্র স্টেনগান উঁচিয়ে আমাদের খাওয়ার টেবিলটা ঘিরে দাঁড়াল। এদের পেছনে নাসরিনকেও দেখে নন্দিনী প্লেটের ওপর ভাতের গ্রাস রেখে বলল, নাসরিন এরা আমাদের কাছে কী কিছু জানতে চায়?

নাসরিন কিছু বলার আগেই একজন সশস্ত্র ব্যক্তি নন্দিনীর দিকে অস্ত্রের তাক রেখে বলল, সত্যি করে বলুন আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?

কলকাতা থেকে।

আমি জবাব দিলাম।

এ ব্যাগটা কে আপনাদের দিয়েছে?

গোহাটি এয়ারপোর্টে এক ভদ্রলোক অনেকগুলো ব্যাগ স্যুটকেস নিয়ে কলকাতার প্লেনে উঠতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে এই ব্যাগটা একটু ধরতে বলে তার হাতে গছিয়ে দেন। প্লেনে ওঠার সময় তিনি লাইনের পেছনে পড়ে যান। আমরা ঠিকমতোই প্লেনে উঠতে পারলেও সে ভদ্রলোক চেকিং এর মধ্যে পড়ে যান। তাকে গার্ডরা টেনে লাইনের বাইরে এয়ারপোর্টের ভেতরে নিয়ে যায়। আমরা নিরুপায় হয়ে ব্যাগটা নিয়ে কলকাতায় চলে আসি। আমার ভগ্নিপতি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন বড়কর্তা বলে এবং আমরা তার পরিবারের সদস্য হয়ে আসার ফলে চেকিংয়ের ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পারায় ব্যাগটা বেঁচে যায়। আমরা জানতাম না ব্যাগের মধ্যে কী আছে। বাসায় এনে খুলে দেখি এতে অনেক টাকা ও কাগজপত্র রয়েছে। এ টাকা যে একদল মুক্তিযোদ্ধার সম্পত্তি এটা একটা চিঠি থেকে জানতে পেরে বিবেকের তাড়নায় প্রাণ বাজি রেখে আমরা ব্যাগটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি।

সম্পূর্ণ ঘটনাটা আমি সংক্ষেপে বললাম।

যিনি ব্যাগটা আপনাদের কাছে দিয়েছিলেন তার কী হল?

সশস্ত্র ব্যক্তিদের অন্য একজন পাশ থেকে আমাকে প্রশ্ন করল। আমি মুখ তুলে এবার এদের সবার দিকে তাকালাম। এরা নাসরিনসহ পাঁচজন। মেয়েটি ছাড়া সবার পরনেই খাকি পোশাক ও মাথায় মাংকি ক্যাপ। সকলেরই বয়েস ত্রিশ- পঁয়ত্রিশের মতো। এদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তির দাড়িগোঁফ আছে। মনে হল ইনিই লীডার।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমরা প্লেনের জানালা দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি। সিকিউরিটি গার্ডরা তাকে ঠেলে এয়ারপোর্টের ভেতরের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। তারপর আমরা আর তার সম্বন্ধে কিছু জানি না।

আমার জবাব শুনে এরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। নন্দিনী এ অবস্থায় খাওয়া আর সম্ভব নয় ভেবে গেলাস তুলে হাত ধুয়ে ফেলার উপক্রম করতে দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, আপনারা খাওয়া শেষ করুন। পরে আলাপ করব। ভয় পাবেন না।

তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমরা আবার খাওয়া শুরু করলাম। নাসরিন এগিয়ে এসে আমাদের পাতে ভাত বেড়ে দিতে লাগল।

০৮. মুক্তিযোদ্ধার সামনে আমরা

প্রকৃতপক্ষে এতগুলো মুক্তিযোদ্ধার সামনে আমরা আর ঠিকমত লোকমা তুলতে পারছিলাম না। নন্দিনী তো ভাতের বাসনের ওপর কেবল আঙুল বুলিয়ে খেলছিল। যদিও নাসরিন তার ভাতে ডাল ঢেলে দিতে দিতে বলল, খান। আপনি বুঝি আমাদের চাল ডাল বের করে চট করে রেঁধে নিয়েছেন?

কী করব বল, খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছিলাম।

খুব ভাল করেছেন। তবে এখন আমরা আসাতে আর খেতে পারছেন না। খান, কোনো বদ মতলব না থাকলে আমরা আপনাদের ক্ষতি করব না।

অভয় দিয়ে নাসরিন হাসল। মনে হয় সে আমাদের সাথে কিছুক্ষণ আগে যে আচরণ করেছে সেটার জন্যে সামান্য অনুতপ্ত।

আমাদের কোনোই বদ মতলব নেই নাসরিন। আমরা টাকাটা ফেরত না দিলেও পারতাম। তোমরা কোনোদিন জানতেও পারতে না টাকাটা কার হাতে পড়েছে। তোমাদের যে লোক ব্যাগটা আমার হাতে দিয়েছিলেন তিনি আমাদের নামধাম বা পরিচয় জানতেন না। এ টাকায় আমরা কলকাতায় এই যুদ্ধের মধ্যে আরামে দিন কাটাতে পারতাম। আমাদের বিবেক ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধই এখানে টেনে এনেছে। তোমরা এখন আমাদের নিয়ে কী করবে তা তোমাদের ব্যাপার। আমরা তোমাদের সাথে দেশের জন্য লড়ব বলে এখানে এসেছি।

নন্দিনীর কথায় অস্ত্রধারীরা পরপর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। দাড়িঅলা লোকটি যেন একটা ইঙ্গিত করা মাত্রই দলের অন্যেরা তাক করা অস্ত্রের নল আমাদের দিক থেকে নামিয়ে ফেলল।

দাড়িঅলা লোকটি বলল, আপনারা কী আমাদের সাথে থাকতে চান?

আপনারা যদি বিশ্বাস করে আমাদের আশ্রয় দেন তবে আমরা থাকতেই এসেছি।

জবাব দিলাম আমি।

আপনাদের কোনো সামরিক ট্রেনিং আছে?

দাড়িঅলা লোকটি আবার প্রশ্ন করল।

না। বলল নন্দিনী।

আমাদের সাথে থাকতে হলে আপনাদের ট্রেনিংটা নিতে হবে।

আমি বললাম, আমরা এ ব্যাপারে প্রস্তুত হয়েই এসেছি। এখন আপনারা যদি আমাদের বিশ্বাস করেন তবে আমাদের গ্রহণ করতে পারেন। কলকাতায় ফিরে যেতে চাই না। আপনার নামই কী আলী?

আমার প্রশ্নে দাড়িঅলা লোকটি একটু চমকে গিয়ে তার সঙ্গিদের দিকে তাকাল। নাসরিণ প্রশ্ন করল, আপনারা এ নাম কোথায় জানলেন?

নন্দিনী বলল, ব্যাগটায় টাকার সাথে যেসব কাগজপত্র ছিল সেখানেই আমরা তোমাদের নাম ও আলী বলে একজনের নাম পেয়েছি।

এবার দাড়িঅলা লোকটি বলল, আমার নামই আলী। আলী রেজা। আমি আপনাদের এত ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসে টাকাটা পৌঁছে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের পার্টির আদর্শের সাথে আপনাদের পরিচয় না থাকলেও আমরা আপনাদের আশ্রয় দেব। তবে এখানে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প একেবারে ভারত সীমান্তের কাছে। সেখানে কমপক্ষে একমাস আপনাদের থাকতে হবে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে। জনমানবহীন একটা পরিত্যক্ত গ্রামে আপনাদের থাকতে হবে। ঠিকমত খাবার জুটবে না। হানাদাররা সার্চ করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের একটা গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে। সেখানেও একটা ট্রেনিং ক্যাম্প আমরা চালু করেছি। ট্রেনিং শেষ হলে সরাসরি আপনাদের খুলনা, যশোর, কিংবা ঢাকায় গিয়ে গ্রুপ লীডারের নির্দেশে কাজ করতে হবে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আজ রাতটা একটু ভেবে দেখুন। যদি রাজি থাকেন তবে কাল আমাদের জানাবেন। আর যদি আবার কলকাতায় ফিরে যেতে চান তবে আমাদের লোকজন আপনাদর পৌঁছে দেবে।

কথাগুলো বলে আলী রেজা তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। বলল, তোমরা গিয়ে বৈঠকখানায় অপেক্ষা কর।

নাসরিনসহ অন্য তিনজন কোনো কথা না বলে সামনের কামরায় চলে গেল। আমাদেরও খাওয়া শেষ। হাত ধুয়ে মুছে আমি আলী রেজার সামনে এসে বসলাম। নন্দিনী থালা বাসন নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি ধীরে সুস্থে পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগ্রেট আলী রেজাকে দিলাম। তিনি সিগ্রেটটা নিতে নিতে হেসে বললেন, এখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন খুবই কষ্টকর। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। পলিটিক্যাল মোটিভেশন না থাকলে দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা আরও মুস্কিল। আপনাদের খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবার আপনার ও আপনার সঙ্গিনীর পূর্ণ পরিচয় আমাকে বলুন।

আমার নাম সৈয়দ হাদী মীর। আমার স্থায়ী ঠিকানা অর্থাৎ জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের গ্রন্থাগার পরিচালনা করতাম। কবিতা লেখারও চেষ্টা করি।

আয়েসের সাথে সিগ্রেটের টান দিয়ে জবাব দিলাম।

আপনার সঙ্গিনী কী আপনার স্ত্রী?

একথা কেন বলছেন?

আমরা বুঝতে পারি। না হলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। তবে আপনাদের আসল পরিচয় এবং সম্পর্কটা আমার এবং আমার পার্টির জানা থাকা দরকার, কারণ আপনারা আমার শরণার্থী হলেও আমাদের পার্টির অশেষ উপকার করেছেন। আপনাদের নির্লোভ মানসিকতা আমার কাছে একধরণের বৈপ্লবিক বিস্ময়। এই মহিলার সত্যিকার পরিচয় আমরা নথিভুক্ত করব। আমি আশা করি আপনারা আত্মপরিচয় গোপন করে সেই সৌভাগ্য থেকে অযথা নিজেদের বঞ্চিত করবেন না। আপনার নাম শুনে মনে হচ্ছে আপনার কবিতা আমিও পড়েছি। আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করলেও আকাট মুখ নই।

হাসলেন আলী রেজা।

আমার নাম নন্দিনী চক্রবর্তী। ভৈরব বাজারে বাড়ি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্রী।

নন্দিনী কখন যে ধোয়ামোছার কাজ সেরে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারি নি। আমি ও আলী রেজা মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। সে তখন হাসিমুখে আঁচল দিয়ে হাত মুছছে।

আলী বললেন, আপনি বসুন।

নন্দিনী খাবার টেবিলের খালি চেয়ারটায় বসল।

এখন মুস্কিল হল আপনাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে আপনারা একসাথে থাকার জিদ ধরবেন না। তেমন গ্যারান্টি দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবও হবে না। কারণ আপনাদের যে ক্যাম্পে পাঠাব বলে ভাবছি তা দেশের ভেতরের একটা ক্যাম্প। সেখানে কোনো মহিলা কমরেড আমাদেরই নাই। কবি সাহেবকে কাল সকালেই সেখানে চলে যেতে হবে। আর মিস চক্রবর্তী, আমি জানি না আপনারা বিবাহিত কিনা, সেজন্য মিস বললাম। আপনাকে আমাদের ভারত সীমান্তের ভেতরের একটি গ্রামে যেতে হবে। সেখানে আমাদের ক্যাম্পে কয়েকজন মেয়ে আছেন। আপনাদের প্রাথমিক ট্রেনিং শেষ হলে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। পরের ব্যবস্থা আমরা স্থির করব। আমরা অবশ্য আপনাদের এখানে ফিরে এলে আমাদের পার্টির বিয়য় এবং লিটারেচার সম্বন্ধে জ্ঞাত করব। গ্রহণ করা না করা আপনাদের ইচ্ছা। এতে মুক্তিযুদ্ধে পার্টিসিপেশন আটকাবে না। আপনারা কী কমরেড তোহার নাম শুনেছেন?

আমি বললাম, তার সাথে একদা আমার পরিচয় ও আন্তরিকতা ছিল! কয়েকবার আমি তাকে আমার ঢাকার বাসায় শেলটারও দিয়েছি।

ভেরি গুড।

হাসলেন আলী রেজা।

নন্দিনী বলল, আমিও কমরেড তোহার নাম শুনেছি। চট্টগ্রাম থাকতে শুনতাম তিনি নোয়াখালীর চরাঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করছেন।

আপনারা সচেতন মানুষ। আপনাদের সাহায্য আমাদের একান্ত দরকার। রাজনৈতিক মতপার্থক্য এখন মুক্তিযুদ্ধে বাধা হবে না। আজ রাতটা একটু ভালো করে ভেবে দেখুন। যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকেন তবে আগামীকালের মধ্যে আপনাদের দুজনকে দুজায়গায় ট্রেনিংয়ের জন্য চলে যেতে হবে। বাকি রাতটা শান্তিতে ঘুমোন। নাসরিন আপনাদের সাথে থাকবে। সকালে ব্রেকফাস্ট সারা হলে নাসরিন আপনাদের আমার কাছে নিয়ে যাবে।

কথা শেষ করেই আলী রেজা পাশের ঘরে তার অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে চলে গেলেন। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে আলী রেজাদের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম। একই সঙ্গে নাসরিন এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। মুখখানা হাসি হাসি। এতক্ষণ নাসরিন মেয়েটির ছবি সুরৎ ভালো করে লক্ষ করার ফুরসৎ পাই নি।

এখন দেখলাম মেয়েটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী। তবে চেহারায় কিশোরীসুলভ চপলতা। চোখ দুটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কালো এবং গভীর। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। মাথার দুদিকে দুটি লম্বা বেণী। ডানদিকের সুরেখার ঠিক ওপরে একটা হালকা ক্ষতচিহ্ন থাকায় মনে হয় দুটি রেখা বুঝি মেয়েটির চোখের উপর কেউ ভুল করে বসিয়ে দিয়েছে। কিশোরী হলেও নাসরিনের বুকের গঠন পরিপূর্ণ, নিখুঁত। নাসরিন গাঢ় সবুজবর্ণের সালোয়ার কামিজ পরে আছে।

আমি হেসে বললাম, এসো কমরেড নাসরিন। এবার তোমার সাথে একটু কথা বলি। কিছুক্ষণ আগে তুমি যেমন সামরিক কসরৎ দেখালে তাতে একটু ঘাবড়ে গেলেও এখন ভয়টা একটু কমেছে।

আমাকে আপনাদের ঘুমের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। সামনের ঘরে গিয়ে দুজন চুপচাপ শুয়ে পড়ুন। কাল কথা হবে।

হেসে নাসরিন এসে নন্দিনীর হাত ধরল।

নন্দিনী বলল, তোমার মা বুঝি এখানে থাকেন না?

আম্মা ছুটিছাটায় এখানে এসে থাকলেও, বেনাপোলেই বেশি থাকেন।

তোমার আব্বা?

নন্দিনীর প্রশ্নের জবাবে নাসরিন বলল, আব্বা চাটগাঁর কাস্টম ট্রেনিং সেন্টারের কোর্স কো-অর্ডিনেটর। মাঝে মধ্যে এলেও মার সাথে বেনাপোলেই থাকেন। মাঝে মধ্যে আমাকে দেখতে এখানে আসেন। আমি একাই এখানে থাকি। এবার চুয়াডাঙ্গা কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষা দেব।

আমি বললাম, নাসরিন তুমি খুব অল্প বয়েসেই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেছ। একথা তোমার আব্বা আম্মা জানেন না নিশ্চয়ই?

কেন জানবেন না। রাজনীতিটা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমি যে পলিটিক্স করি আমার বাপ মাও এই আদর্শেরই সমর্থক। তবে সরকারি কর্মচারী বলে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

তোমরা কী ভাব বাংলাদেশে সাম্যবাদী দলের আদর্শই সঠিক?

আমাদের তো তাই বিশ্বাস। যাক এখন আর রাজনীতির আলোচনা নয়। আপনারা সামনের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। দুজন এক ঘরেই থাকবেন তো?

আজ রাতটা অন্তত থাকি।

হাসল নন্দিনী।

মশারি টাঙানো আছে। খাটে উঠে শুধু চারধারটা একটু গুঁজে দিন। আমি গিয়ে বাতি নিবিয়ে দিয়ে আসব।

নাসরিনের কথায় আমরা সামনের ঘরে এসে বিছানায় উঠলাম। নন্দিনী মশারি গুঁজতে লাগল। নাসরিন একটু পরেই এসে বাতি নিবিয়ে দিয়ে গেল। বাতি নেভাবার আগে আমাদের খাটের দিকে তাকিয়ে তার লাজুক মিষ্টি হাসি আমি মশারির ভেতর থেকেও এক ঝলক চকিতে দেখতে পেয়ে সংকোচিত বোধ করলাম। আলী রেজার কথায় একটু আগেই বুঝেছি আমরা যে স্বামী- স্ত্রী নই আলী রেজারা কীভাবে যেন আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল। পরে অবশ্য আমাদের পরিচয় পেয়েই আলী রেজা বুঝে গেছে আমাদের মধ্যে প্রণয় থাকলেও আমরা স্বামী- স্ত্রী নই। আমাদের আলোচনা নিশ্চয়ই পাশের কামরা থেকে নাসরিনরাও শুনেছে। এখন এ ব্যাপারে সংকোচ করেও কোনো ফল হবে না। ভেবে আমি নন্দিনীকে বললাম, আমরা যদি এদের ট্রেনিং ব্যবস্থায় রাজি হই তবে আগামীকালই তোমাকে এখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

আমি আলী রেজা সাহেবের প্রস্তাবগুলো শুনেছি।

আজ রাতেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

অর্থাৎ তুমি সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামে গিয়ে ট্রেনিং নেবে। আর আমি থাকব এদিকে।

আলী রেজা তো এ প্রস্তাবই তোমাকে দিয়েছিলেন। এখন তুমি ঠিক কর তুমি কী করবে?

আমাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

হবে।

তবুও যাবে?

কী করব বল? আমি হামিদার কাছে পরাজিত ও ছোট হয়ে বেঁচে থাকতে পারব না।

এটা তবে স্বীকার কর, দেশের স্বাধীনতা নয় প্রতিদ্বন্দিনীর প্রতি ঈর্ষাই তোমার অবচেতন বুক জুড়ে আছে। হামিদার স্বার্থ ত্যাগ ও দেশের জন্য জীবন বাজি রাখার প্রতিজ্ঞাকে তুমি সহ্য করতে পারছ না। ভাবছ এতে তোমার হার হয়েছে।

হতেও পারে। তোমাকে আমি ভালবাসি যখন তখন তোমার বৌকে জিততে দেব কেন? অবচেতন ঈর্ষা থাকতেও পারে। আমি এখন চেতন- অবচেতন বিচার করার মতো অবস্থায় নেই।

তোমার বুকের ওপর একটু হাত রাখব?

রাখো। ব্লাউজ খুলে দেব?

না থাক। এমনি তোমার বুকে মুখে একটু হাত বুলিয়ে দিতে মন চাইছে। আমরা এখন এমন এক পরিস্থিতিতে চলে এসেছি আবার যে দেখা সাক্ষাৎ হবে এমন গ্যারান্টি কোথায়?

তাহলে আর অত ভয় কি? আজ রাতটা তোমাকে দিচ্ছি। তোমার যেভাবে খুশি নাও।

আমি আল্লাকে ভয় পাই নন্দিনী। মনে হয় এই পাওয়াটা বৈধ বা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। কোথায় একটা সীমাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছি। এদিকে কামনায়, লোভে আমার বুকের পশম পর্যন্ত কাঁপছে। আমিও তো পুরুষ। আমি আর পারছি না।

আল্লার ভয় নয়। হামিদার ভয়ে তুমি কাঁপছ।

আল্লাহ যদি হামিদার রূপ ধরে আমার বিবেকের ওপর দৌরাত্ম্য করে তবে আমি কী করব নন্দিনী?

আমি বালিশে মুখ রেখে ফোঁপাতে লাগলাম। নন্দিনী হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে আমার বুকে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমি একটু শান্ত হলে আমার দিকে পেছন রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কী করব বুঝতে না পেরে বিছানায় উঠে চুপচাপ খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম। সারা কলোনীটা জুড়ে ঝিঁঝির একটানা শব্দ উঠছে। আমি মশারির ভেতর থেকেই এর স্বচ্ছ হালকা আবরণ ভেদ করে আকাশের তারা দেখতে পাচ্ছিলাম। শেষ প্রহরের পাখিরা এবং কলোনীর গৃহস্থদের মোরগ বাক দিয়ে উঠল। আমি নন্দিনীর খোঁপাভাঙা বিপুল কেশরাশিকে বালিশের ওপর দিকে সাজিয়ে দিয়ে আবার নিজের বালিশে শুয়ে পড়লাম যদিও জানি আজ আর ঘুম আসবে না। ওদিকে নাসরিনের ঘুমের আবছা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একবার ভাবলাম এ অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল নিঃশব্দে দুয়ার মেলে এ ঘর থেকে যেদিকে দুচোখ যায় পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু কোথায় যাব? তাছাড়া আমি তো নন্দিনীকে কথা দিয়েছি, এই যুদ্ধের সময়টা আমি তাকে একা ফেলে কোথাও যাব না। এখন কী নন্দিনী একা? আগামীকালই সে আবার নতুন পরিবেশে নতুন একদল উদ্যমী মানুষের মধ্যে ট্রেনিং নিতে চলে যাচ্ছে। আমিও এখানে অন্য একটি ক্যাম্পে অন্যদের মধ্যে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শেখার জন্য চলে যাব। নন্দিনীর সাথে কী আর সত্যি আমার দেখা। হবে? আজ একটু আগেই তো সে তার সর্বস্ব আমাকে উজাড় করে দিয়ে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল। আমি নিতে পারছি না কেন? যুদ্ধের ময়দানে এই নারী কী সত্যি আমার জন্যে অবৈধ? আমি যদি আজ এখান থেকে পালিয়ে হামিদার কাছে চলে যাই সেকি আমাকে কাপুরুষ, দেশদ্রোহী ভাববে না? আর আমি ঢাকায় গিয়ে কোথায় হামিদা নাম্নী এক মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পাব? এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই সকালের আলো এসে আমার মুখের ওপর পড়ল। পাশের ঘর থেকে নাসরিনের জেগে ওঠার শব্দও পেলাম। আমি আর শুয়ে থাকতে না পেরে তার নাম ধরে ডাকলাম, নাসরিন?

আপনারা জেগেছেন?

আপনারা নয়, আমি জেগেছি নাসরিন।

উঠে হাতমুখ ধোন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি চা নাস্তা দিচ্ছি।

আড়মোড়া ভেঙে জবাব দিল নাসরিন।

আমি বললাম, সকাল বেলা আমার চায়ের খুব বদ অভ্যেস। নাস্তার আগেই এককাপ বেডটির মতো হবে না নাসরিন?

কেন হবে না। একটু সবুর করুন এক্ষুণি দিচ্ছি।

বলল নাসরিন।

আমি বিছানায় বসে সকালের আলোয় ঘুমন্ত নন্দিনীর ছড়িয়ে যাওয়া কেশরাশি, মুখের ঈষৎ বিবর্ণ ক্লান্তি এবং শারীরিক ক্লান্তির নারীসুলভ সৌন্দর্য চোরের মতো দেখে নিতে লাগলাম। তার নাকের বা পাশে মাছির মতো একটা বড় তিল যেন তার সরলতার সাক্ষ্য দেবার জন্য জ্বলজ্বল করছে।

নিজের বৌকে অমন অবাক হয়ে দেখতে হয় নাকি?

হাসির খিল খিল শব্দ তুলে চায়ের কাপ হাতে নাসরিন।

আমি তাড়াতাড়ি মশারি সরিয়ে বাইরে আসতে আসতে বললাম, দুঃখ কষ্টে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেরিয়েই তো দিন কেটে যাচ্ছে। নিজের আপনজনকে চোখ ভরে তেমন করে আর দেখতে পেলাম কই?

বেশ তো দেখুন না। নিন চায়ের কাপটা ধরুন। চা খেতে খেতে নয়ন ভরে দেখুন। আমি মশারিটা তুলে দিচ্ছি। নাসরিন আমার হাতে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিয়ে মশারি তুলতে গেলে নন্দিনীর ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল, কি ব্যাপার আমাকে জাগাও নি কেন?

জাগাব কি, আপনার সাহেব তো ঘুমের মধ্যে আপনার রূপ দেখেই কূল পাচ্ছে না।

মুখের ওপর হাত রেখে হাসি লুকোতে চেষ্টা করল নাসরিন।

নন্দিনী তার আগোছালো চুল টেনে এনে খোঁপা বাঁধল। বিছানা থেকে নেমে শাড়ি ঠিক করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এর মধ্যে চাও পেয়ে গেলে? নাসরিন তো খুব ভাল মেয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমি ট্রেনিংয়ে চলে গেলে তোমার খুব অসুবিধে হবে না।

নাসরিন ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাদের সতর্ক করে বলল, একটু আস্তে কথা বলুন। কলোনীর মানুষজন জাগছে। নাস্তার পরই আপনাদের পাশের একটা বাড়িতে যেতে হবে। সেখান থেকে দুজনকে দুদিক চালান করে দেয়া হবে। আমি রুটি বেলে আনছি। শুধু রুটি আর চা। আর কিছু নেই ঘরে। এ খেয়েই সকালটা কাটাতে হবে।

আমি হাত নেড়ে আমাদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করলাম। নাসরিন নাস্তার যোগাড়ে অন্য ঘরে চলে গেলে আমি মৃদুস্বরে বললাম, মনে হয় চমৎকার ঘুম হয়েছে নন্দিনী।

কী করে বুঝলে?

আমি জেগে থেকে তোমার সুখনিদ্রা উপভোগ করার দৃশ্যটা প্রাণভরে দেখে নিয়েছি।

তুমি ঘুমাও নি?

ঘুম পাচ্ছিল না।

ঘুমের ওষুধ তো আমি বাৎলেছিলাম। তুমিই নিলে না। এখন আমার ঘুমন্ত দেহের বা রূপের প্রশংসা করে ভুলিও না তো।

আজ ছাড়াছাড়ির দিনটায় ঝগড়া করে তিক্ত করে যেও না নন্দিনী। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই সম্মান করি। লঙ্ঘন করতে সাহস হচ্ছে না বলে আমাকে কাপুরুষ ভেবো না। এটুকু অতৃপ্তি না নিয়ে গেলে আমরা পরিস্থিতির চাপে একদিন হয়তো পরস্পরকে ভুলে যেতাম। এখন আর ভোলার সম্ভাবনা নেই। অন্তত আমার পক্ষ থেকে।

নন্দিনী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর কী ভেবে যেন বলল, হামিদাকে আমি জিততে দেব না কবি। আমার কপালে যাই থাক এই মুক্তির লড়াইয়ে একটা যোগ্য ভূমিকা আমাকে নিতেই হবে। ট্রেনিং পিরিয়ডটা যত কষ্টকরই হোক আমি তাতে সফল হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসব। তোমার কাছে অনুরোধ, এই যুদ্ধটাকে তুমি অবহেলা কর না। বল করবে না?

আমি হেসে বললাম, যদি সুখ আর নিরাপত্তার কথাই ভাবতাম তবে কী আমরা কলকাতার জীবন ছেড়ে এখানে আসতাম? আমার ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবো না নন্দিনী। আমার প্রতিজ্ঞাও তোমার মতোই। আগে দেশের স্বাধীনতা, ঢাকায় ফিরে যাওয়া, তারপর ভাগ্যে যা আছে তা দেখা যাবে।

.

দর্শনা হল্ট স্টেশনের পাশেই রেল শ্রমিকের একটা কোয়ার্টারের দশ পনেরো জন মুক্তিযোদ্ধার একটা বৈঠকে আমাকে ও নন্দিনীকে নিয়ে নাসরিন হাজির হল। আমরা ঘরে ঢোকা মাত্রই আলী রেজা বলল, কবি সাহেব, এখানে বেশি কথা বার্তা বলা যাবে। না। পাঞ্জাবিরা কাস্টম কলোনী ও রেলকর্মচারীদের কোয়ার্টারগুলোকে গত রাত থেকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। মোজাফফর গ্রুপের যে দুজন আপনাদের কলোনীতে পৌঁছে দিয়ে গেছে তারা যাওয়ার সময় দর্শনা হল্টে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মালগাড়ির ভেতর ক্যামোফ্লাজ করে থাকা দশজনের একটা পাঞ্জাবি গ্রুপের ওপর হ্যান্ড গ্রেনেড ও হালকা চাইনিজ রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে এ্যাটাক করে শেষ করে দিয়েছে। খুব সাকসেসফুল অপারেশন। ব্রেভো। তবে দুজনের একজনের উরুতে রাইফেলের বুলেট একটা বিঁধে গেছে। লোকটার নাম লতীফ। সাহায্যের জন্য আমাদের একটা ক্যাম্পে এসে

উঠেছে। বুলেটটা আজই রিমুভ করতে হবে। আমরা নিজেরাই কাজটা করতে পারতাম কিন্তু স্পটেই লতীফের খুব রক্তপাত হওয়াতে সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। একজন ডাক্তার চুয়াডাঙা থেকে আজই নিয়ে আসতে হবে। এ অবস্থায় আমরা আর দেরি করতে পারছি না। কমরেড চক্রবর্তীকে কমরেড আলতাফ ও কমরেড হাসান এই মুহূর্তেই আমাদের সীমান্তের ওপারের ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। আর কবি সাহেব আপাতত আমার সাথে থাকুন।

আলী রেজার কথায় দুজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে নন্দিনীর দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। এবং তাকে তাদের পেছনে যেতে বলে ঘরের বাইরে পা বাড়াল। নন্দিনী মুহূর্তের জন্য একটু অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকালেও, পরমুহূর্তেই তার মুখে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

কবি, আমি যাচ্ছি।

আমার মুখ দিয়ে অকস্মাৎ যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল, খোদা হাফেজ নন্দিনী।

নন্দিনী দুজন কমরেডের সাথে কোয়ার্টারের বাইরে চলে গেলে আলী রেজা আমাকে বললেন, ট্রেনিং পাওয়ার আগেই আপনাকে অপারেশন শুরু করতে হচ্ছে কবি সাহেব। এখনই একজন ডাক্তারের জন্য আপনাকে চুয়াডাঙ্গা যেতে হচ্ছে। আমি আপনাকে যে ঠিকানা দেব সেখানে গেলে তারা আপনাকে একজন সার্জারীর ছাত্র ডাক্তারকে আপনার সাথে দেবে। তাকে নিয়ে আপনি এখানে এই কোয়ার্টারের তিন নং প্লটে ফিরে আসবেন। চলুন আপনাকে সব বুঝিয়ে স্কুটারে তুলে দিচ্ছি।

আমি একটু হতবাক হয়ে গেলেও আলী রেজার কথায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। তিনি আমাকে নিয়ে কোয়ার্টারের বাইরে এসে আগে থেকেই অপেক্ষমান স্থানীয় ভ্যান গাড়িতে চড়লেন। গাড়ি চলতে লাগল। যেতে যেতে তিনি বললেন, এই ভ্যানের চালক আমাদের লোক। এ আপনাকে আমাদের একটা প্রাইভেট স্কুটারে তুলে দেবে। মনে রাখবেন স্কুটার ড্রাইভারও আমাদের লোক। মুক্তিযোদ্ধা। সে আপনাকে চুয়াডাঙ্গা যে বাড়িতে নিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে প্রফেসর আবদুল মতিনকে আপনি আমার এই চিঠিটা দেবেন। তিনি সব ব্যবস্থা করে সন্ধ্যায় সার্জারীর ছাত্রটি সহ স্কুটারে তুলে দিলে আপনি রেল কোয়ার্টারে এসে রিপোর্ট করবেন। নিন এই চিঠি আর খামটার মধ্যে এক হাজার টাকা আছে।

আলী রেজা আমাকে পকেট থেকে চিঠি ও টাকার খামটা দিলেন। আমি হাত পেতে নিয়ে চিঠি ও টাকার খাম সাবধানে পকেটে রাখলাম।

.

ভ্যান গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে স্টেশনের বাঁ দিকের পথ ধরল। এতক্ষণে আমি একটু ধাতস্থ হয়েছি। আলী রেজার হঠাৎ সিদ্ধান্তে নন্দিনী ও আমার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা আমাকে একটু হতবাকই করে ফেলেছিল। এখন আমি একটু উপলব্ধি করছিলাম নিজের ইচ্ছাতেই আমি ও নন্দিনী জীবনের মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত রাজনীতি সম্বন্ধে আমার ও নন্দিনীর ধারণাই ছিল অস্পষ্ট। কিন্তু যুদ্ধটা ছিল প্রত্যক্ষ। আমরা আগরতলার যাত্রাপথে বামুটিয়া বাজারের কাছে কেবল মারণাস্ত্রের শব্দই শুনি নি। যুদ্ধের প্রকৃত হিংস্রতা এবং প্রিয়জনের মৃত্যুর দৃশ্যের সাথে নিজের পক্ষের লোকদের অমানুষিক আচরণও প্রত্যক্ষ করেছি। যুদ্ধ যে মানবিক ব্যাপার নয় বরং মানুষের সভ্য স্বভাবের অধঃপতন এটা আমার চেয়ে বেশি বুঝেছিল নন্দিনী। তবুও যুদ্ধ সুবিচার ও স্বাধীনতার জন্য আমাদের উভয়ের কাছেই ছিল একান্ত জরুরি। আর হামিদা তো লড়াইয়ের মধ্যেই তার বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজতে স্বামীকেও, যে কিনা একজন কবি, ছেড়ে যেতে দ্বিধা করে নি। যুদ্ধ যত নির্মমই হোক এখন আমি সম্ভবত এর সামনাসামনি এসে পড়েছি। এ অবস্থায় আমার পক্ষে মৃত্যুবরণ যতটা কাম্য, ধরা পড়াটা কিছুতেই নয়।

গাড়ীটা এতক্ষণে একটা গাঁয়ে এসে পড়েছে। আলী রেজা এবার আমার সাথে কথা বলার জন্য মুখ ফেরালেন। তার মুখে একটা উদার হাসি খেলে যাচ্ছে।

এবার একটি সিগ্রেট চলতে পারে।

আমি পকেট থেকে সিগ্রেট ও দেশলাই বের করে তাকে দিলাম।

এবারও আমি কোনো জবাব দিলাম না। তার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নিজে একটা ধরালাম।

এ সময় জরুরি কাজে চলাফেলার কেউ কাউকে সতর্ক করা মানে অযথা ভয় পাইয়ে দেয়া। তবুও নতুন মানুষ ও অচেনা জায়গা বলে আপনাকে কতগুলো নির্দেশনা দিতে চাই। ভ্যানগাড়ি আর একটু এগিয়ে আপনাকে স্কুটারে তুলে দেবে। সে গাড়ির চালক সশস্ত্র। যদি পথে কেউ গাড়ি থামাতে চায় গাড়ি থামবে না। আপনি কোনো অবস্থাতেই ড্রাইভারকে থামতে বলবেন না। আপনি গাড়িতে স্থির হয়ে বসে থাকবেন। তবে ড্রাইভার যদি কোথাও গাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে আপনি বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে ফলো করবেন। সে যদি বাধ্য হয়ে কাউকে চার্জ করে তবে ভাববেন সে সঠিক কাজই করেছে। তার ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সে কোথাও কোনো দোকানে চা খেতে নামলে আপনিও নামবেন। কোনো প্রশ্ন করবেন না। আপনি নিজে থেকে কারও কোনো জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন না। ড্রাইভার আমীনই কথা বলবে। আর মনে রাখবেন ধরা পড়ার চেয়ে মুত্যুই শ্রেয়।

আলী রেজার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভ্যান গাড়িটা মোড় ঘুরল। সামনেই পিচঢালা বড় রাস্তা। আলী রেজা ভ্যান থেকে নেমে পড়ল।

আসুন, জয় বাংলা।

জয় বাংলা।

আমিও আলী রেজার প্রতিধ্বনি করলাম।

সে হেসে বাঁক ঘুরে গাছপালা ঘেরা একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ভ্যানগাড়ি ততক্ষণে বড় রাস্তায় এসে উঠেছে। আর আমরা রাস্তায় ওঠা মাত্রই কোত্থেকে যেন একটা স্কুটার মৃদু শব্দ তুলে ভ্যানগাড়ির একরকম পথ আটকে দাঁড়াল।

ভ্যানগাড়ির চালক যার মুখটা এতক্ষণ আমি ঠিকমত নজর করতে পারি নি, কারণ আমি ও আলী রেজার কথাবার্তার মধ্যে সে একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকায় নি। এবার তার মুখখানা দেখলাম। একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক। পরনে ময়লা সবুজ লুঙ্গি ও ঘেঁড়া গেঞ্জি। পায়ে রবারের স্যান্ডেল। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং ফর্সা। গলায় রুপোর তাবিজ। আমার দিকে ফিরে বলল, স্কুটারে উঠে পড়ুন। জলদি।

আমি নিঃশব্দে স্কুটারে উঠে বসলাম। স্টার্ট চালু ছিল। গাড়ি চলাতে লাগল বাতাসের বেগে।

আমার নাম আমীন।

আমি হাদী মীর।

আপনার পরিচয় আমার জানা।

ড্রাইভার মুহূর্তের জন্য এক পলক আমার দিকে ঘাড় ফেরাল। হাসি মুখ। চমৎকার স্মার্ট চেহারা। স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ বাহু। সজোরে হ্যান্ডেল ধরে আছে। কালো রংয়ের হাফহাতা বুশ শার্ট ও জিনসের প্যান্ট পরনে। কানের ওপর ডান দিকে একটা সরু ক্ষতচিহ্নের দাগ। দাগটা কোঁকড়ানো ঘন চুলের ওপরও জ্বলজ্বল করছে। মোটা বলিষ্ঠ ঘাড় দেখলে বডি বিল্ডারের মতো মনে হয়।

আমি বললাম, গাড়িতে বসে সিগ্রেট- টিগ্রেট খেতে কোনো মানা নাইতো কমরেড?

আরে না, আরামসে খান।

বলেই ড্রাইভার গাড়ি স্লো করতে গিয়ে ব্রেক কষার শব্দ তুলল। আমি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি প্যাকেট বের করে সিগ্রেট ধরালাম। ড্রাইভারকে একটা দেব কিনা ইতস্তত করার মধ্যে আমীন বলল, আমাকে এখন দেবেন না। এখান থেকে পথে আর কোনো কথা নয়।

আমি হাত গুটিয়ে আনলাম।

.

আমরা বেলা তিনটায় চুয়াডাঙ্গা স্টেশনকে বাঁয়ে রেখে একটা মাঠের মতো জায়গায় এসে পড়লাম। মাঠটার মাঝামাঝি একটা ডোবার পাড়ে কয়েকটি খড়ের চালাঘর। সম্ভবত খুবই হতদরিদ্র দুএকটি পরিবার এখানে বাস করে। ঘরবাড়ি শ্রীহীন। পাটকাঠির বেড়ার জন্য ভেতরের উঠোন বা অন্দর দেখা যাচ্ছে না। আমীন বাড়িটার কাছে এসেই স্কুটারের গতি কমিয়ে আনল এবং একবার মাঠের চারদিকটা মুহূর্তের মধ্যে দেখে নিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথের ওপর গাড়ি তুলে এনে সোজা উঠোনে ঢুকে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিল।

আমরা এখন এখানেই অপেক্ষা করব। আমার পেছনে আসুন।

আমি নেমে আমীনের পেছন পেছন একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের ভেতর একজন মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোক কুলোয় চাল বাছছিল। আমীনকে দেখেই বলল, খাওয়ার ব্যবস্থা করব?

হ্যাঁ আমরা খাব।

দুজনের মতো ভাত- তরকারি হবে মনে হয়।

স্ত্রীলোকটি কুলোর চাল কায়দা করে একপাশে সরিয়ে এনে উঠে দাঁড়াল। আমীন আমার দিকে ফিরে বলল, আসুন হাতমুখটা ধুয়ে বসে যাই। আপনারও খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

আমি বললাম, কোথায় যেতে হবে?

আমার পেছনে আসুন।

আমীন আমাকে নিয়ে ঘরটার পেছনে এসে দাঁড়াল। এখানে একটা নেবু ঝোপের পাশে মাটিতে মটকা বসানো। মটকার মুখে টিনের ঢাকনার ওপর পানি তোলার মগ রাখা আছে। আমিন ঢাকনা খুলে পানি তুলে হাত মুখে ঝাপটা দিল। আমার দিকে ফিরে বলল, আসুন।

আমি মগটা হাতে নিয়ে বললাম, চিঠিটা যার হাতে দেব সেই অধ্যাপক সাহেব কী এখানে আসবেন? না আমাদেরই অন্য কোথাও গিয়ে দিতে হবে?

আপনাকে এখন আর কিছুই করতে হবে না। খেয়ে চৌকির ওপর গড়াগড়ি যাবেন। আমি গিয়ে মতিন সাহেবকে খবর দেব। তিনি এলে আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে তাই করবেন। আমি খেয়ে স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে যাব। এখানে আর ফিরব না। যেখান থেকে ফের আপনি স্কুটারে উঠবেন সে জায়গাটা প্রফেসর সাহেব আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কিংবা আপনাকে চিনিয়ে দিলে আপনি ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটেই চলে আসবেন। মনে রাখবেন এখন যে বেটি আমাদের খাওয়াবে সে এখানকার রাজাকার লীডারের স্ত্রী। আমাদের ফ্রেন্ড।

একটু হাসল আমীন।

আমি কথার কোনো জবাব না দিয়ে হাতমুখ ধুতে লাগলাম। স্ত্রীলোকটি ঘরের ভেতর থেকে একটা লাল গামছা নিয়ে বেরুল। আমীন গামছাটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আসুন। আমরা খেতে বসলে করিমন প্রফেসরকে খবর দিতে যাবে। আমরা যে পাড়াটা পেছনে রেখে এসেছি মতিন সাহবেরে বাড়ি সেখানে। আমার বা আপনার সরাসরি সেখানে যাওয়া বিপদজ্জনক। আপনি এখানে থাকবেন। আমি অন্য জায়গায়। সব ব্যবস্থা ঠিকমতোই হয়ে যাবে। চিন্তা করবেন না।

আমীনের কথায় আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বুঝলাম সব ব্যবস্থা শৃঙ্খলা মতোই এগোচ্ছে। আমার দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের মধ্যে থাকার কিছু নেই। হাতমুখ মুছে আমি চৌকিতে এসে বসলাম। সামনে ভাতের থালা। বাটিতে নলা মাছের শুকনো ভাজি, লালশাক আর ডাল। আমীন আমার পাতে মাছ ভাজা আর লাল শাক তুলে দিলে বলল, খান। করিমন ভালই রাঁধে। তাছাড়া খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। এখনই আপনি যাকে চান তাকে খবর দিতে যাবে।

আমীনের কথায় করিমন একটু হেসে পেছনের দরজার দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। সত্যি খাওয়াটা অমৃতের মতোই লাগল। আমার প্রচন্ড খিদে থাকায় প্রচুর ভাত খেলাম। মনে হল আমার খাওয়া দেখে আমীনও পরিতৃপ্ত, করিমনের রান্নাটা দারুণ, না?

আমি বললাম, নিঃসন্দেহে দারুণ।

আমাদের সাথে কাজ করলে আরও বহুবার আপনাকে এখানে আসতে হবে।

তবে যে বললেন রাজাকারের বৌ?

রাজাকারের বৌ হলে আমাদের মিত্র হতে পারে না? আমীনের কথায় ঠাট্টার ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে তিনি হেসে ফেললেন।

আমাদের একজন নেতৃস্থানীয় কমরেড রাজাকারের স্ত্রী সেজে এক রিকশাওয়ালার সাথে ঘর করতে হচ্ছে। কিছু বুঝলেন?

না। রহস্য রেখে খুলে বলুন।

ইনি দিনাজপুরের কমরেড আদিনাথ মজুমদারের স্ত্রী সবিতা মজুমদার। হেঁয়ালি করছি না কবি সাহেব।

তার কথা শেষ হবার আগেই উঠোনে রিকশার বেল শুনে সেদিকে মুখ তুললাম। একজন শীর্ণকায় লোক ঘরে এসে আমাদের দিকে হাত তুলে সালাম দিল। পরণে চেক লুঙ্গি। শ্যামবর্ণ চেহারা। বয়েস পাশের মতো। গায়ে হাফহাতা ময়লা গেঞ্জি। বলল, পথে করিমনের সাথে এই মাত্র কথা হল। সে মতিনকে খবর দিতে গেছে। খাওয়া হয়ে গেলে তুমি আর দেরি করো না। চলে যাও।

আগন্তুক কাঁধের গামছাটা হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমীন তাড়াতাড়ি বলল, একে রেজাভাই পাঠিয়েছেন। ইনি সঙ্গে ডাক্তারকে নিয়ে যাবেন। মতিন ভাইয়ের জন্য এর কাছে একটা চিঠি আছে।

ডাক্তার কেন?

একজনের গুলী লেগেছে।

আমাদের লোক?

না অন্য গ্রুপের।

বুকে?

ঊরুতে। খুব রক্ত গেছে। দুর্বল। আমাদের শেলটারে আছে।

থালা থেকে হাত তুলল আমীন, আমি হাত ধুয়ে আসছি।

আগন্তুক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি আস্তে খান। আপনার তাড়াতাড়ি করতে হবে না।

আমি বললাম, আমারও হয়ে গেছে। আমিও হাতটা ধুয়েই আসি।

বেশ যান।

আমি পেছনের দরজা দিয়ে আমীনের পেছনে এসে দাঁড়ালাম।

আপনি যার নাম বলেছিলেন ইনিই সেই কমরেড?

হ্যাঁ।

আমীন হাসল।

আমি বললাম, আপনারা সব রহস্যময় মানুষ। মনে হচ্ছে আমি একটা বেশ বীরত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছি।

আসলে তাই তবে ভয় পাবেন না, আমরাই জিতব।

বলে আমীন সোজা ঘরের ভেতর চলে যেতে উদ্যত হলে আমি বললাম, একটু দাঁড়ান। কমরেড আদিনাথকে তবে কোনো নামে ডাকব?

রিকশাওয়ালার নাম আবদুল্লা মিয়া। আপনি আবদুল্লা নামে ডাকবেন। তার স্ত্রী করিমন। মনে থাকবে?

প্রশ্ন করল আমীন। আমি বললাম, থাকবে বৈকি।

আমি আমীনের পেছনে ঘরের মধ্যে এলাম। আবদুল্লাহ চৌকির ওপর থেকে থালাবাটি মাটিতে নামিয়ে চাটাইয়ের ওপর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ঘরে ঢুকেই আমীন বলল, আমি তাহলে চলি।

এসো উঠোনে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলি।

একথা বলে আবদুল্লাহ আমীনকে নিয়ে ঘরের বাইরে স্কুটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দশ মিনিট অনুচ্চস্বরে কথা বলার পর আমীন স্কুটারে স্টার্ট তুলে উঠোন থেকে নেমে গেলে আবদুল্লা ঘরে এসে আমাকে বললেন, আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন। এইমাত্র আপনার পরিচয় জানলাম।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের লেখকরাও অংশগ্রহণ করছে এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের ব্যাপার। দেশের মানুষের সংগ্রামে যোগদান না করলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কোত্থেকে হবে। তবে কমরেড রেজার আপনাকে এখানে এই বিপজ্জনক মুহূর্তে পাঠানো সুবিবেচনার কাজ হয় নি। যে কোনো মুহূর্তে আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। হানাদারদের ইনফর্মারদের ওপর খুবই চাপ আসছে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিটার সদস্যদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য। খুব চাপ। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধি চাইছেন না মুক্তিযুদ্ধটা আওয়ামী লীগের হাত ফসকে দেশের ভেতরকার মার্কসবাদী বিপ্লবী গ্রুপগুলোর হাতে চলে যাক। এ অবস্থায় আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা কিংবা বিপ্লবী প্রস্তুতি নেই।

আমি বললাম, যুদ্ধটা কী দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আপনারা মনে করেন?

আমরা চাই এই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হোক। যুদ্ধ যতই বিলম্বিত হবে ততই আওয়ামী লীগের বুর্জোয়া অংশের সাথে তাদের তরুণ বিপ্লবী অংশের ভেতরকার দ্বন্দ্ব প্রকট হবে। ততদিনে দেশের সাধারণ মানুষের এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ব্যাপকতর হবে এবং মুক্তিযুদ্ধে দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী গ্রুপ হারিয়ে ফেলবে।

আপনি কী মনে করেন ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে?

আপনাদের নেতারা যারা এখন ভারত সরকারের অতিথি হয়ে কলকাতায় আরাম আর উদ্বেগের মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন তারা চাইলেই প্রবেশ করবে। এমনকি না চাইলেও প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে কে? কোটি কোটি শরণার্থীর অজুহাত তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মস্কোর সমর্থন তো আছেই।

বললেন আবদুল্লাহ ওরফে কমরেড আদিনাথ।

আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তা কিছুতেই মানতে পারবেন না। সারাদেশ তার কথাতেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি পাকিস্তানী শোষণের বদলে ভারতীয় শোষণ ডেকে আনতে পারেন না। আপনাদের তত্ত্বে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল রয়ে গেছে। দেশবাসী শেখ সাহেবের নেতৃত্বে এখনও ঐক্যবদ্ধ। ভারত এই যুদ্ধে আমাদের সাহায্য, সহানুভূতি ও আশ্রয় দিচ্ছে। সহানুভূতিকে আধিপত্য বলে ধরে নিলে আপনাদের ভুল হবে কমরেড।

এ নিয়ে আমাদের আর তর্ক করে কী হবে। ভুল কার ভাঙবে তা বোঝা যাবে কয়েকমাস পরেই। এখন যুদ্ধটাই প্রধান। মতান্তর ভুলে এখন সেটাই চালিয়ে যেতে হবে। আপনি এবার একটু বিশ্রাম নিন।

বললেন আবদুল্লাহ।

আমি বললাম, এখন কী আর বিশ্রাম নেব। বরং আসুন একটা সিগ্রেট ধরাই। নিন।

ধন্যবাদ, আমি ধুমপান করি না।

এসময় করিমন এসে ঘরে ঢুকল। ঢোকা মাত্রই আবদুল্লাহ বললেন, কি ব্যাপার, প্রফেসর আসেন নি?

তিনি এখনই আসছেন।

করিমন আবদুল্লাহকে ইঙ্গিতে তার পিছনে যেতে বলে ঘরের পেছনে চলে গেলে আবদুল্লাহও তার পেছনে গেলেন। আমি একা সিগ্রেট টানতে টানতে একটু কাত হয়ে চৌকিতে শোয়া মাত্রই দুচোখে ঘুম নেমে এল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগেই তৃতীয় এক ব্যক্তি ঘরে এসে প্রবেশ করায় আমি চোখ মেলে তাকালাম। একজন বৃদ্ধ লোক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। গায়ে শাদা পাঞ্জাবি। পরনে পায়জামা। চোখ দুটি খুব তীক্ষ্ণ সতর্ক এবং অনুসন্ধানী বলে মনে হল। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি দর্শনা থেকে এসেছেন?

আমি মুহূর্তের মধ্যে উঠে বসে জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

আমার নাম মতিন।

আপনার একটা চিঠি আছে।

আমি চিঠিটা বের করে অধ্যাপক মতিনকে দিলাম।

তিনি চৌকিতে বসে চিঠিটা খুললেন। এর মধ্যে আবদুল্লাহ ও করিমন ঘরে ফিরে এল। মতিন চিঠি পড়ে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললেন, সার্জারীর যে ছেলের কথা চিঠিতে লেখা আছে সে জরুরি কাজে এখন ঢাকায়। আমরা একজন নার্সকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। সার্জন না হলেও বহুদিন ঢাকায় সার্জিক্যাল অপারেশন কাটাছেঁড়ার কাজে সহকারী ছিল। বুলেটটা বের করে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে আসবে। বলবেন আহতকে রক্তদান ইত্যাদির প্রয়োজনে শেষপর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। বুলেটটা বের করার মতো অবস্থায় না থাকলে আমাদের নার্স সেটা করতে যাবে না। সেক্ষেত্রে সে ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ ঠেকাবার জন্য ওষুধপত্র নিয়ে যাবে এবং রোগীর সাথে কলকাতার পর্যন্ত সঙ্গ দেবে। এর বেশি এখান থেকে আমরা কিছু করতে পারছি না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকলাম।

এবার আমি উঠি। সন্ধ্যায় নার্স মেয়েটি এসে আপনাকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠবে। আসি তাহলে।

মতিন সাহেব আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তার সাথে হাত মেলালে তিনি সকলকে সালাম দিয়ে বিদায় নিলেন। ঘরের বাইরে গিয়ে আবদুল্লাহর রিকশায় উঠলেন। আবদুল্লাহ রিকশার দিকে যেতে যেতে করিমনকে বলল, অতিথিকে চা টা দিও।

রিকশা বেল বাজিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠল। এবার করিমন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, এখনই কী চা দেব?

না একটু পরে দিলেও চলবে।

তাহলে আপনি বিশ্রাম নিন। আমি একটু বাসি বাসনপত্রগুলো ধুয়ে ফেলি।

আমি শুলেই ঘুমিয়ে পড়ব।

পড়ুন না। পাঞ্জাবিরা না এলে আমি আপনাকে জাগাব না। মনে রাখবেন এটা রাজাকার সর্দারের বাড়ি!

হাসল করিমন ওরফে সবিতা মজুমদার। বয়েস চল্লিশের কম হবে না। তবে দেহের অটুট গড়নে তাকে যুবতীই মনে হয়। তার হাসিটা বেশ অকপট এবং উদার বলেই মনে হল। এবার আমিও হাসলাম, তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি, কী বলেন? আমি অবশ্যি আপনাদের অন্য পরিচয়ও জানি মিসেস মজুমদার।

এটা আমীনের ঠিক হয় নি।

আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার নয় সতর্কতার ব্যাপার। যে কোনো মুহূর্তে আমি ও আমার সঙ্গী ধরা পড়ে যেতে পারি। ধরা পড়া মৃত্যু নয়, অসহ্য দৈহিক নির্যাতন। আপনি জানেন না ধরা পড়া মুক্তিযোদ্ধাদের কী পরিমাণ নির্যাতন করা হচ্ছে। শুনলে গা কাঁটা দিয়ে উঠবে। আচ্ছা এখন শুয়ে পড়ুন, আমি একটু ঘরকন্নার কাজ করি। আর ঘুমোতে না চাইলে অপেক্ষা করুন দশ মিনিট

পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিউজ বলবে। রেডিও ঐ বালিশটার নিচে তোষকের তলায় লুকানো আছে। আমি সেন্টার ঠিক করে রেখেছি। শুধু অন করে দিলেই চলবে।

করিমন বেরিয়ে গেলে আমি তোষকের তলা থেকে হালকা ট্রানজিষ্টারটা বের করে সামনে রাখলাম। দশ মিনিটকে মনে হল যেন দশ ঘন্টা পার হচ্ছে। কলকাতায় থাকতেও স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার সুযোগ আমার বা নন্দিনীর তেমন হয় নি। যদিও ঐ বেতারের পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে একজন ছিলেন আমারই ভগ্নিপতি। হঠাৎ পারুল আর মিতুর মুখ চকিতে মনের ভেতর ভেসে উঠল। মামা আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব! এক্ষুণি ওপরে চলুন। হামিদার সাথে হোটেলের দেখা হওয়ার মুহূর্তটির কথা কেন জানি খুব মনে পড়ল। আমি রেডিওটা অন করে দিলাম।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটানা একটা ঘরঘর শব্দের জন্য ঘোষকের গলা শুনতে পেলাম না। যখন শব্দটা স্পষ্ট হল শুনতে পেলাম, গতরাতে সিদ্ধিরগঞ্জ স্টেশনের কাছে এক আক্রমণে আমাদের বীর মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ঢাকার সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দিলে ঢাকা শহর অন্ধকারে ডুবে যায়। হানাদার বাহিনী এখন সর্বত্রই দিশেহারা। এখন পর্যন্ত ঢাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয় নি বলে জানা গেছে। এই আক্রমণে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতরভাবে আহত হলেও অপারেশনের সময় সম্মুখ যুদ্ধে ৭ জন পাঞ্জাবি নিহত হয়। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে নারায়ণগঞ্জের কলাবরেটররা শহরে আরও দৃঢ় পাহারা বসাবার জন্য জেনারেল নিয়াজীর কাছে দাবি জানিয়ে দেনদরবার করছে। ঢাকা থেকে খবর পাওয়া গেছে যে টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও ভৈরবে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার মুখে দিশেহারা ঘাতকবাহিনী গায়ের সাধারণ চাষী পরিবারগুলোর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বাপ মায়ের চোখের সামনেই তাদের যুবক পুত্রদের গুলী করে মারা হচ্ছে।...

সংবাদ শেষ হলে রেডিওতে গান শুরু হল, একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি, আমরা।...

এসময় এককাপ চা নিয়ে করিমন ঘরে ঢুকল, নিন চা। ঢাকার খবর কি?

ভালো।

হেসে করিমন আমার পাশে এসে বসল। গানটা আরও একটু কমিয়ে দিলাম। এ সময় বাইরে রিকশার বেল বেজে ওঠায় করিমন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সম্ভবত সিস্টার মরিয়ম এসেছে।

বোরখা পড়া একজন মেয়েকে নিয়ে আবদুল্লাহ ঘরে এসে ঢুকল।

আপনাকে এক্ষুণি একে নিয়ে রওয়ানা হতে হবে। সন্ধ্যার পর আপনাদের যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ থাকবে না। উঠে পড়ুন।

আমি চায়ের কাপটা করিমনের হাতে দিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। সিস্টার বোরখার নেকাব সরিয়ে মুখ বের করলে দেখলাম, শ্যামলা চেহারার এক যুবতী। হাতে ধাত্রী মেয়েদের মতো একটা ভারী ব্যাগ। বলল, আমি যাচ্ছি আপনার সাথে। আমার নাম মরিয়ম।

আমি হাত বাড়িয়ে মরিয়মের ব্যাগটা নিয়ে বললাম, চলুন।

আমি আর মরিয়ম পাশাপাশি রিকশায় বসলাম। আবদুল্লাহ রিকশা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

.

আমরা সূর্যাস্তের আগেই চুয়াডাঙ্গা স্টেশন ক্রশ করে একটা মোটর পার্টসের দোকানের সামনে এসে নামলাম। মরিয়মই রিকশা থেকে নেমে আমাকে এখানে নামতে ইঙ্গিত করায় আমি নেমে গেলাম। আমাদের নামিয়ে দিয়েই আবদুল্লাহ রিকশা নিয়ে চলে গেল। আমরা দোকানটার বারান্দায় দাঁড়াবা মাত্রই হাওয়া থেকে যেন হু হু শব্দে স্কুটার নিয়ে আমীন হাজির হল।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। মনে হয় এখানকার অবস্থা ভাল নয়। মুজিব বাহিনীর একটা গ্রুপ এখানকার একটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বাড়ি আক্রমণ করে চেয়ারম্যানসহ কয়েকজনকে খতম করেছে। তার বাড়িতে শান্তিবাহিনীর বৈঠক হচ্ছিল।

আমি ও মরিয়ম ফুটারে উঠে বসা মাত্র গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করল। স্কুটার আবাসিক এলাকা ছাড়িয়ে মাঠের পথ ধরে এগোতে লাগল। দুপাশে ধানের খেতের মাঝ দিয়ে খোয়া বিছানো এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো রাস্তা। আমরা আসার সময় যে এপথে আসি নি তা বুঝতে পেরে আমি আমীনকে বললাম, আজ রাতটা অপেক্ষা করে রওনা হলে ভালো হত না?

না, তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যেতাম। পাঞ্জাবিরা এখানে ব্যাপকভাবে তল্লাসি শুরু করেছে। এরা কী যেন একটা টের পেয়েছে। শুনলাম সিদ্ধিরগঞ্জের পাওয়ার স্টেশনের কাছে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ফলে গত কালও ঢাকা শহর অন্ধকার ছিল। হানাদাররা ভয় পেয়ে এখানে যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই গুলী করছে। তাছাড়া আমার ওপর নির্দেশ আজই আপনাকে আর সিস্টারকে নিয়ে দর্শনায় ফিরে যাওয়ার।

স্কুটারের সামনে থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমীন আমার দিকে তাকালে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যে পথে যাচ্ছি এতে বিপদ নেই তো?

এখন সব পথেই বিপদ আছে কমরেড। প্রাণ হাতে করেই এ পথে যাচ্ছি। তবে ভয় পাবেন না, আমি ও সিস্টার কেউই নিরস্ত্র নই। প্রাণ বাঁচাবার মতো হাতিয়ার আমাদের দুজনের কাছেই আছে। বিপদে পড়ে গেলে আপনি হতভম্ব হবেন না। আমাদের ডিরেকশনে চলবেন।

এবার মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দিল আমীন।

আমি মরিয়মের দিকে তাকলে সে হেসে বোরখার নেকাবটা নামিয়ে দিল। এতক্ষণ তার মুখ খোলাই ছিল। আমি তাঁর আবৃত মুখখানা আর দেখতে না পেয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি পশ্চিমদিকে সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও আকাশের রক্তবর্ণ মিলিয়ে যায় নি। দুদিকে বিশাল সবুজ মাঠে আলো নিবে আসাতে সবুজের আস্তরণকে কেমন যেন একট কালচে দেখাচ্ছে। ধান ক্ষেতের ভেতর বা আশেপাশে কোনো কিষাণ বা মানুষজন চোখে পড়ছে না। এখানে পুরো অঞ্চলটাকেই আমার কেমন ভীতসন্ত্রস্ত বলে মনে হল। স্কুটারের শব্দে পথের ওপর থেকে একটা শেয়াল ধান ক্ষেতের আইল ধরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি বললাম, চলার সময় বামদিকে শেয়াল দেখলে কী হয়?

যাত্রা শুভ।

বলে মরিয়ম বোরখার ভেতরেই জোরে হেসে ফেলল। মরিয়মের হাসির শব্দে আমি আর আমীনও না হেসে পারলাম না। অনিশ্চিত আশংকার মধ্যে পথ চলতে গেলে মানুষের স্নায়ুর টানটান অবস্থা মানুষকে কতকটা বোকা ও প্রগলভ বানিয়ে ফেলে। আমি আর কথা না বলে চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্কুটারের হেড লাইট এখনও জ্বালানো হয় নি। অস্পষ্ট আলোয়ই আমীন একমনে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর খোয়া বিছানো অসমান পথে স্কুটার কেবল লাফিয়ে চলতে লাগল। নড়াচড়ায় গাড়ির ভেতরে আমি ও মরিয়ম অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমরা অনবরত পরস্পরের গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছিলাম।

.

রাত আটটার দিকে দর্শনা হল্ট স্টেশনের পেছনে এসে থামলে মরিয়ম বোরখা খুলে হাতের ওপর গুটিয়ে নিয়ে স্কুটার থেকে নামল। আমিও নেমে দাঁড়াতেই আমীন স্কুটারকে একটা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে ফিরে এসে বলল, আসুন আমার পেছনে।

আমরা তার পেছনে পেছনে চললাম। আমীন প্ল্যাটফর্মের দিকে না গিয়ে অন্য একটা ঘুরপথ দিয়ে আমাদের রেল লাইন পার করে একটা ছোটো কোয়ার্টারের সামনে নিয়ে এল। মনে হয় রেলের চতুর্থ শ্রেণীর কোনো কর্মচারীর আবাস। উঠোনে ঢুকে বাড়িতে কোনো লোকজনের সাড়াশব্দ পেলাম না। ঘরের ভেতর থেকে কোনো আলোর আভাসও দেখা যাচ্ছে না।

আমীন উঠোনে আমাদের নিয়ে কতক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল। যেন তার বারান্দায় উঠতে দ্বিধা হচ্ছে। মরিয়ম বলল, আমার ব্যাগে টর্চ আছে, জ্বালব?

আমীন কিছু বলার আগেই মরিয়ম ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে আলো ফেলল। ঘরের দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে। তালা দেখেই আমীন আতংকিত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে। এখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ানো ঠিক হবে না, চলুন।

আমরা উঠোন থেকে বেরুবার মুখেই হন্তদন্ত হয়ে একটি মানুষের ছায়া এসে আমীনের সামনে দাঁড়াল।

আমি রেজা, গুলী করো না।

আমীন ততক্ষণে তার পোশাকের গুপ্তস্থান থেকে পিস্তল বের করে ছায়ার দিকে নল উচিয়ে প্রস্তুত।

রেজা ভাই। কী ব্যাপার?

খুব বিপদ, লোকজন এ কোয়ার্টার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রোগী এখন আলিমপুরের আশরাফ হাজির বাড়িতে। লতিফের খিঁচুনি হচ্ছে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দরকার। তোমাদের সাথে ডাক্তার কই?

ডাক্তার এখন চুয়াডাঙ্গায় নেই। আমি মরিয়ম রেজা ভাই। বুলেটটা বের করতে পারি কিনা একটু চেষ্টা করে দেখতে দিন।

বলল মরিয়ম।

বেশ, তুমি এক্ষুণি আমীনের সাথে আলিমপুর চলে যাও। সেখানে রোগীর অবস্থাও খুব খারাপ। আর এদিকে হানাদার বাহিনীর একটা গ্রুপ রাজাকারদের সহায়তায় ঘণ্টা খানেক আগে কাস্টম কলোনীতে হামলা চালিয়ে নাসরিনকে ধরে নিয়ে গেছে। পিস্তলটা পেয়েছে। এরা এখন একটা প্রাইমারি স্কুলে আস্তানা গেড়ে আছে। কলোনীতে গেট পাহাদারকে গুলী করে মেরেছে। এরা লতীফদের আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে এসেছে। আমীন আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তুমি হাজির বাড়িতে চলে যাও সেখানেই আজ রাতের প্ল্যানটা জানতে পারবে। আমরা রাতেই স্কুলে পাল্টা আক্রমণ করে। মোজাফফর গ্রুপকে খবর দেয়া হয়েছে তারাও এ অপারেশন আমাদের সাথে থাকছে। তাছাড়া ইছামতী পাড়ের বাদুড়িয়া ক্যাম্প থেকে সদ্য পাঠানো মুজিবাদীদের একটা গ্রুপ আমাদের শেল্টারে আছে তারাও আমাদের সাথে এই আক্রমণে রাজি। সব মিলে প্রায় পঞ্চাশ জন। তুমি মরিয়মকে পৌঁছে দিয়ে আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরে এস।

বলেই রেজা আমার দিকে ফিরলেন, আপনি আমার সাথে চলুন।

ততক্ষণে মরিয়ম ও আমীন দৌড়ে সামনের দিকে চলতে লাগল। রেজা আমার হাত ধরে টেনে উল্টো দিকে দৌড়ে চলতে ইঙ্গিত করায় আমি তার ছায়ার পেছনে দৌড়াতে লাগলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। তবুও আমি প্রাণপণ আলী রেজাকে অনুসরণ করে যাচ্ছি। দশ মিনিট চলার পরই হাঁপাতে লাগলাম। এর মধ্যে অন্ধকার পথে আন্দাজেই আলী রেজা পথ ছেড়ে মাঠের ভেতর নেমে পড়ল।

এখন একটু আস্তে চলতে পারেন। হেঁটে চলুন। আলী রেজাও দৌড় থামিয়ে হেঁটে চলেছেন। আমি এমনিতেই হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এখন আশ্বাস পেয়ে হাঁটতে লাগলাম। মনে হল হাঁটু সমান ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলেছি। ঘাস আর কাদার গন্ধ। মাটি ভেজা বলে জুতো দেবে যাচ্ছে। অন্ধকারে উচ্চিংড়ে আর ফড়িংয়ের লাফালাফি চলছে। কোনো কোনোটা চোখেমুখে এসেও লাগছে। অন্ধকার এমন ভারি যে সামনে আলী রেজার ছায়ামূর্তিটা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

আপনি মোটামুটি সাহসী লোক কবি সাহেব। আমরা আপনাকে পরীক্ষার জন্য একটা কাজ দিয়ে চুয়াডাঙ্গা পাঠিয়েছিলাম। আপনি সফল হয়েছেন। আপনি এখন থেকে আমার সাথেই থাকবেন। তবে কমপক্ষে সাতদিনের একটা ট্রেনিং সেরে নিতে হবে।

আমার সামনে চলতে চলতে আলী রেজা হঠাৎ নম্র কণ্ঠে কথা বললেন।

আমি বললাম, রেজাভাই, আমি যুদ্ধ করতেই এসেছি। দীর্ঘদিন ট্রেনিং নিতে হলেও আমি তা নেব। আমার কোনো পলিটিক্যাল মোটিভেশন নেই কারণ অতীতে আমি কবিতা লেখা ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সাথেই জড়িত ছিলাম না। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা দেশকে হানাদার মুক্ত করা।

আপনার এ সময়ও কবিতা লিখতে হবে কবি। আপনার কোনো পলিটিক্যাল মোটিভেশনেরও আমি দরকার দেখি না। যেটা দরকার সেটা হল সফিস্টিকেটেড ওয়েপন যা আমরা এই মুহূর্তে ব্যবহার করছি সেসব চালানোর জ্ঞান এবং হাতিয়ার হেফাজতের জরুরি শিক্ষা। এসব বিষয় আমিই আপনাকে শেখাতে পারব। এর জন্য কোনো ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার দরকার নেই। আমি দেশের একজন প্রতিভাবান কবিকে এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করতে চাই। এর মধ্যে কোনো কবিতা হয়েছে?

এ পর্যন্ত কবিতা লেখার কোনো পরিবেশ বা অবসর জোটে নি।

আমার কথায় আলী রেজার চলন্ত ছায়াটা একটু দাঁড়াল। আমি তার পাশে যেতেই তিনি পিঠে হাত দিলেন।

এ পরিবেশেই আপনাকে লিখতে হবে। যুদ্ধ কাউকেই অবসর দেয় না কবি।

আমি বললাম, আপনার নির্দেশ আমি পালন করব কমরেড। তবে আজ রাতের অপারেশনে আমাকে আপনার পাশে থাকতে দিন।

এটা আমার পক্ষে খুব দায়িত্বজ্ঞানহীন ডিসিশন হবে।

আমি নাসরিনের এদের হাতে পড়াটা সহ্য করতে পারছি না। এরাতো পশুরও অধম?

নাসরিনের জন্য আমাদের পুরো গ্রুপটাই আজ প্রাণ বাজি রেখেছে। উদ্ধার করা যাবে কিনা জানি না। যদি এর মধ্যে মেয়েটাকে অত্যাচার করে মেরে না ফেলে তবে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মেয়েটার বাপ মা বিশ্বাস করে আমার হাতে ওর দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। আমার কথা এটুকুই, এরা নাসরিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্কুলটায় আটকে রেখেছে। এখনও যশোর ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় নি। সম্ভবত সকালে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মতলব। আজ রাতেই আমরা নাসরিনকে উদ্ধার করব। জ্যান্ত কিংবা মৃত তা যে অবস্থাতেই হোক।

আমার হাত চেপে ধরে বললেন আলী রেজা।

আমি আবেগের সাথে বললাম, এ অপারেশনে আমি আপনার পাশে থেকে চাক্ষুস সবকিছু দেখতে চাই রেজা ভাই।

আলী রেজা কতক্ষণ নিশ্চুপ ভাবে আমার উষ্ণ, কম্পিত হাতখানি চেপে ধরে রেখে যেন আবেগের শিখায় তার নিজের সিদ্ধান্তকে উত্তপ্ত করে বললেন, আপনি থাকবেন। আমার পাশেই থাকবেন।

আমি খুশিতে চিৎকার করে উঠলাম, জয় বাংলা।

০৯. দর্শনা হল্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়

রাত সাড়ে তিনটার দিকে আমরা দর্শনা হল্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললাম। আমরা সর্বমোট একাত্তর জন মুক্তিযোদ্ধা। আমি ছাড়া সকলেই ট্রেনিং প্রাপ্ত। সকলের

হাতেই আধুনিক অস্ত্র। মুজিববাদী গ্রুপের প্রায় সবার হাতেই স্টেনগান। দুএকটা এল, এম, জিও আছে। মোজাফফর গ্রুপও চাইনিজ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং একটা সাব মেশিনগান সঙ্গে করে এনেছে। কমরেড রেজার গ্রুপ অর্থাৎ আমাদের দলও সর্বাধুনিক চাইনিজ অস্ত্রে সজ্জিত। প্রত্যেকের বেল্টে বাঁধা গ্রেনেড। শুধু রেজা ভাই আরও চারজনের সাহায্যে একটা ভারী ব্যারেল এবং ব্যারেলের সাথে সংযুক্ত করার ব্যাটারী, স্ট্যান্ড, ইত্যাদি বহন করে এনে স্কুলের সামনের মাঠটার শেষপ্রান্তে একটা নালার উঁচু পাড়ে থামতে বললেন। আমাকেও একটা পিস্তল দেওয়া হয়েছে। যদিও আমি এ পর্যন্ত অস্ত্রটা চালাতে শিখি নি। তবুও দেওয়ার সময় আলী রেজা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে এর গুলীর পার্টসটা খুলে এবং লাগিয়ে আমাকে বিষয়টা মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং একবার মাত্র বুলেট খুলে অস্ত্রটার ট্রিগার টানার কায়দাটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন, নিন এবার এই বুলেটের কেসটা চেম্বারে লাগান ত দেখি।

মনে হয় পারব।

বলেই আমি পিস্তলটার বাটের দিকে বুলেটের কেসটা ঠেলে ক্লিক শব্দে ঢুকিয়ে ফেললাম। আলী রেজা বললেন, সাবাস। যখন তাক করবেন তখন দুহাতে পেছন দিকটা শক্ত করে ধরে তাক করবেন। হঠাৎ এক হাতে ধরতে গেলে হাত কাঁপবে। তাছাড়া আপনার আঙুল ও কবজি খুব নরম। তাক ফসকে যাবে।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অস্ত্রটা কোমরে গুঁজে আলী রেজার পেছনে পেছনে এ পর্যন্ত এসেছি। রওনা হওয়ার সময়ই অপারেশনের প্ল্যানটা সবগুলো গ্রুপের কাছেই আলী রেজা ব্যাখ্যা করেছেন। সবাই একমত হয়ে বিভিন্ন পথ ধরে এখানে রওনা হয়ে এসেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা না গেলেও মাঠের ওপারে একটা লম্বা টিনের চাল আন্দাজ করা যায়। পশ্চিম দিকে একটা দেয়ালের পাশে দুটি ছাদঅলা মাঝারি সাইজের বড় সামরিক জিপ দাঁড়ানো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল হানাদারদের একটা পঁয়ত্রিশ জনের পুরো গ্রুপ এখানে থাকলেও স্কুলের বারান্দায় কোনো আলোর ব্যবস্থা রাখা হয় নি। বারান্দায়, মাঠ কিংবা জিপ দুটোর আশে পাশে কোনো সেন্ট্রির চলাফেরা দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় সবাই স্কুল ঘরটার বিভিন্ন কামরায় ওঁৎ পেতে আছে। এদের সংখ্যাটা আলী রেজাই যোগাড় করেছেন।

নালাটার পাড় থেমেই আলী রেজা ও তার চার সঙ্গী প্রায় আড়াই হাত লম্বা ব্যারেলটা স্কুলের মাঠে রাখা গাড়ি দুটোর দিকে তাক করে ফিট করে ফেললেন। একটা ঝোলার ভেতর থেকে চকচকে ছোটো শেল বের করেই ব্যারেলের নিচের দিকে নিঃশব্দে বসিয়ে দিলেন। খুবই অনুচ্চ, প্রায় ফিসফিসানির মতো আনন্দ ধ্বনি বের হল সবার মুখ থেকেই। আমি বুঝলাম অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র কামান বসানোর সাফল্যে এরা উল্লসিত। হঠাৎ রেজা আমার দিকে মুখ এগিয়ে এনে বললেন, আর দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের সহযোদ্ধারা আমার নির্দেশমত

ঠিক ঠিক জায়গায় অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। এখানে আমার এই চারজনের ইউনিটের সাথে আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন। ফায়ারের সময় কানে আঙুল দিয়ে থাকবেন। ভয় পাবেন না।

আমি বললাম, আপনি?

আমি প্রত্যেকটা গ্রুপের পজিশন চেক করে সিগন্যাল দেব। কীভাবে দেব তা আপনি বুঝবেন না। যারা এ্যাকশন শুরু করবে তাদের বলা আছে তারা বুঝে যাবে। আমার এই গোলন্দাজ ইউনিট না নড়া পর্যন্ত আপনিও এখান থেকে নড়বেন না। মনে রাখবেন এটা হল অপারেশন কমান্ডারের হুকুম। একদম স্থির থাকবেন।

বলেই আলী রেজা কামানটার দুপাশে উবুড় হয়ে দুজন করে বসে থাকা সঙ্গীকে হাত দিয়ে একটা ইশারা করেই অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে মিলিয়ে গেলেন।

আমি ও আমার সঙ্গীরা নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকলাম। হঠাৎ কামানটার বাঁ পাশ থেকে একজন খুব নিচু স্বরে বলল, সিগন্যাল।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে অন্ধকার মাঠটার দিকে তাকলাম। না কোনো ইঙ্গিত বুঝতে পারছি না। শুধু ব্যারেলটা একটু উঁচু হয়ে উঠল বলে মনে হল। এদিকে আমার চারজন সঙ্গীর মধ্যে দুজন মাঠের দিকে মাথা একটু উঁচু রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কে একজন আমার কোমরের বেল্ট ধরে টান দিল, আমাদের মতো করে পজিশন নিন।

আমিও নিঃশব্দে কনুইয়ের ওপর ভার রেখে দুটি পা পেছন দিকে মেলে দিলাম। আমরা সকলেই নিষ্পলক তাকিয়ে আছি মাঠ আর ওপাশের ফুলটার দিকে। স্কুললটার ওপর পাতলা চাঁদ হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ায় একটা হালকা আলো যেন অন্ধকারকে ঈষৎ ফিকে করে দিল। এখন গাড়ি দুটির অবস্থান অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। স্কুলের বারান্দাটাও অস্পষ্টভাবে নজরে আসছে। কিন্তু শত্রুদের কোনো চলাফেরা দেখছি না। আমি ফিসফিস করে আমার পাশে শুয়ে পড়া সঙ্গীকে বললাম, দুশমনদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন কিছু বুঝছি না।

তারা ঠিকমতোই পজিশন নিয়ে আছে। একটু পরেই বুঝতে পারবেন।

তার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই নারী কণ্ঠের আর্ত চীৎকার শুনতে পেলাম। আর সাথে সাথেই স্কুলঘরের একটা দরজায় আলো জ্বলে উঠল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল পাঁচ ছজন শত্রু সেনা। এদের প্রত্যেকেই অস্ত্র উঁচিয়ে খোলা দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। মুহূর্তমাত্র। এরপরই ক্লাস রুমের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি মেয়েকে চুলের মুঠি এবং দুদিকে হাতপা ধরে কয়েকজন হানাদার ঝুলন্ত অবস্থায় বের করে আনল। এদের পেছনে একজন সার্চ লাইট উঁচু করে ধরে আছে।

দৃশ্যটা দেখামাত্রই আমি বুঝতে পারলাম নাসরিনের ওপর পাশবিক অত্যাচারের পর তার অচৈতন্য দেহটাকে পশুরা বাইরে নিয়ে এসেছে। রাগে, ঘৃণায় ও স্নায়বিক উত্তেজনায় আমি থর থর করে এমন। প্রবলভাবে কাঁপছিলাম যেন এই মুহূর্তে সারা দেহ কাঁপিয়ে আমাকে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করেছে। সম্ভবত আমার সঙ্গীদের একজন কেউ অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমার পিঠে হাত দিয়ে খুব শান্ত কণ্ঠে বলল, একটু ধৈর্য ধরুন। একটু পরেই আমাদের মেয়েটি রিলিজ হবে। প্লিজ কাঁপবেন না।

আমি একথায় গুঁড়ি মেরে লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, কমরেড এ্যাকশন শুরু হচ্ছে না কেন? আপনারা কামান দাগছেন না কেন?

এ্যাকশনতো শুরু হয়ে গেছে। আমাদের লোকেরা এদের সব পজিশনে হুকুমের অপেক্ষায় ওৎ পেতে আছে। ঐযে গাড়ি দুটি দেখছেন এখন ও দুটোতে আমাদের ছেলেরা পজিশন নিয়ে রেখেছে। কামান দাগলে মেয়েটি মারা পড়বে। আমাদের কমান্ডারের ওপর ভরসা রাখুন। আর কথা বলবেন না। চুপ।

আমি চুপ করে এক দৃষ্টিতে স্কুলের বারান্দার দিকে তাকিয়ে রইলাম। নাসরিনকে এরা এখন বারান্দার ওপর ছুঁড়ে ফেলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একজনকে মনে হল হাসতে হাসতে একটা সিগ্রেট ধরাল। কেউ আবার উবুড় হয়ে নাসরিনের নিরাবরণ অচৈতন্য শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়ে পরখ করে সঙ্গীদের কী যেন বলছে। আর পেছন থেকে ক্লাসরুমের অন্ধকার গহ্বর থেকে একটা লোক প্যান্টের বোতাম বা চেইন টানতে টানতে বেরিয়ে এল। তার গায়ে গেঞ্জি। দূর থেকেও তার ফর্সা গায়ের রং বোঝা যায়। সম্ভবত এ লোকটাই এদের অধিনায়ক। সে বেরিয়ে এসেই কী যেন বলল। লোকগুলো আবার নাসরিনের নগ্ন দেহটাকে চ্যাঙদোলার মতো দুলিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। যারা নাসরিনকে বহন করে মাঠে নামল তাদের পেছন পেছন বেশ কয়েকজন হানাদার লাইন বেঁধে মার্চ করে মাঠে নেমে পড়ল। গেঞ্জি পরা লোকটা এবং আরও কয়েকজন তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

আমার পাশের কমরেড হঠাৎ তার সঙ্গীদের বলল, টার্গেট।

সাথে সাথেই ব্যারেলটা একটু সরে বারান্দার মধ্যমণি লোকটাকে তাক করল। ততক্ষণে নাসরিনের দেহটাকে মধ্য মাঠে টেনে এনে নর পশুরা যে দৃশ্যের অবতারণা করল তা না দেখার জন্য আমি আমার মাথা ঘাসের ভেতর নামিয়ে এনে ধরিত্রীর বুকে কপাল ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

আমার পিঠে কে যেন হাত রেখে মোলায়েম কণ্ঠে উচ্চারণ করল, আমরা সিগন্যাল পাচ্ছি। কানে আঙুল। ফায়ার।

প্রচন্ড শব্দে ব্যাটারী কার্যকর হয়ে উঠলে আমি আচমকা মাটি থেকে মাথা ওপরে তুললাম। কোথায় সে সার্চ লাইট আর কোথায় সেই স্কুল ঘর কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু মাঠটার চারদিক থেকে আচমকা শুরু হয়েছে ধারাবাহিক এল, এম, জির ফটাফট শব্দ। এর মধ্যে কামান একটু বিরাম দেওয়া মাত্রই শুনতে পেলাম স্থান বদলের ইঙ্গিত। দ্রুত হাতে কমরেডের কামানটাকে কয়েক ভাগে আলাদা করে ফেলে নালাটার, নিচে নেমে গেল। আমিও তাদের সাথে নামলাম। এর মধ্যে কে একজন ওপর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের ওপর এসে পড়েই হুকুম করলেন, তিরিশ গজ ডানে।

বুঝলাম রেজা ভাইয়ের গলা। আমরা দ্রুত তিরিশ গজ আন্দাজ ডানে ছুটে এসে মাথা মাটিতে লাগিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার মাঠের মধ্য থেকে এক ঝাঁক গুলী আমাদের দেহের ওপর দিকে শিস্ তুলে চলে গেল। আমার পাশে মাটিতে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেই রেজা ভাই ও তার সঙ্গীরা ব্যারেলটা যুৎসই করে মাঠের দিকে তাক করল। কিন্তু এখন কারো উঠে বসার উপায় নেই কারণ মাঠের চারদিক থেকেই লাইট মেশিনগান ও চাইনিজ রাইফেলের গুলীর শব্দ উঠছে। এর মধ্যেই আলী রেজা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, এনিমি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু স্কুল ঘরটার ভেতর দুতিনজন পজিশন নিয়ে আছে। ভয়ে এলোপাথাড়ি গুলী চালিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই স্কুলটা আমাদের দখলে চলে আসবে।

আমি বললাম, নাসরিন?

মাঠের মধ্যে পড়ে আছে সম্ভবত এখনও বেঁচে আছে। তবে অজ্ঞান।

মাঠের মধ্যে অনেকগুলো হানাদার ছিল?

খতম। ঐ জিপগুলোর ভেতর আমাদের লোকেরা অন্ধকারে পজিশন নিয়ে ছিল। আমাদের গান থেকে প্রথম হিট করার সাথে সাথেই তারা মাঠে লাফিয়ে পড়ে সবাইকে খতম করে দিয়েছে। আমাদের এ্যাটাকে বারান্দার সেই গেঞ্জিপরা বদমাইশ মেজরটারও খুলি উড়ে গেছে।

আমাদের কারো কিছু হয় নি তো?

ছজন ডেড।

মাঠের অপারেশন নাসরিনের গায়ে গুলী লাগে নি তো?

আমার উৎকণ্ঠার কোনো জবাব না দিয়ে আলী রেজা হঠাৎ উঠে বসলেন। তার দেখাদেখি আমিও উঠে বসতে চেষ্টা করতে গেলে রেজাভাই আমার কাঁধে সজোরে চাপ দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

মাথা তুলবেন না। স্কুলঘরের ভেতরে হারামজাদাদের হাতে একটা রকেট লঞ্চার আছে আমাদের ভারী অস্ত্রটা এরা খুঁজছে। একটু আভাস পেলেই কামান শুদ্ধ আমাদের উড়িয়ে দেবে।

আমি এবার অবস্থাটা ঠিকমতো আন্দাজ করতে পেরে মাটির ওপর কপাল রেখে আস্তে বললাম, আল্লাহ দয়া কর। আমাদের বিজয় দাও।

আলী রেজা কতক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে মাঠের ওপর গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, রেজাভাই আপনার গায়ে গুলী লাগতে পারে। আমার পাশে শুয়ে পড়ুন।

আমি এবার ক্রল করে নাসরিনের কাছে পৌঁছুতে পারি কিনা দেখি। আপনার পিস্তলটা কোথায়?

এইত আমার হাতেই আছে।

আমি আলী রেজার দিকে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিলাম।

তিনি পিস্তলটা হাতে নিয়েই একজন সঙ্গীর দিকে নিচু হয়ে কী যেন বললেন। এই লোকটিই কামান থেকে প্রথম গোলা বর্ষণ করে স্কুলের বারান্দায় গেঞ্জিপরা মেজরটাকে খতম করেছিল। আলী রেজার ইঙ্গিতে সে কয়েক হাত গড়িয়ে গিয়ে ব্যারেলের পেছনে ব্যাটারির ওপর হাত রেখে পজিশন নিল। আলী রেজা এবার সরে এলেন আমার দিকে।

আমার পেছনে বুকে হেঁটে আসতে পারবেন?

আমি কোনো কিছু চিন্তা না করেই বললাম, পারব।

দ্যান ফলো মি।

আলী রেজা বুক ঘাসের ওপর হেঁচড়িয়ে কনুই দিয়ে চলতে শুরু করলেন। আমিও তাকে যথাযথ অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। উত্তেজনায় আমি ঘাসের ওপর কনুই ছোঁয়াবার কষ্টটা টেরই পেলাম না। শুধু হাঁটুর দিকে প্যান্টের ভেতরে একটা ঘসটানির জ্বলুনি অনুভব করলেও বেপরোয়া রেজাভাইকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমরা পনেরো গজের মতো এগোতেই আমাদের পেছন

থেকে বিপুল শব্দে গোলাবর্ষণ শুরু হল। রেজাভাই এগোনো বন্ধ করে ঘাসের ওপর মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। আমিও তার মতোই ঘাসে মাথা রেখে কানে আঙুল দিলাম। ব্যারেল থেকে শেল ছিটকে বেরুবার আলোর ঝলক এসে পড়ছে আমাদের ওপর। গন্ধকের গন্ধের মতো এক ধরনের ঝাঁঝাল গন্ধ এসে লাগল নাকে। আবার মাঠটার চারদিক থেকে এবং স্কুল ঘরের একটা জানালা থেকে প্রবল শব্দে গুলী বিনিময় চলতে লাগল। আলী রেজা ঘাসের ওপর মুখ চেপে রেখেই আস্তে বললেন, নার্ভাস লাগছে?

মোটেই না।

তাহলে এগোন।

আমরা আবার কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়েই থেমে পড়লাম। কারণ স্কুললটার ভেতর থেকে শিসের মতো এমন একটা শব্দ উঠেই আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে বিশ গজ পেছন তীব্র গর্জনে ফেটে পড়ল। মনে হল আমি বুঝি কালা হয়ে গেলাম। কিন্তু কিছু ভাববার আগেই আমাদের ব্যাটারী থেকে দুম দুম আওয়াজ তুলে আগুন ছিটকে যেতে লাগল। একটা ধোঁয়ার আস্তরণের ভেতর আমি ও রেজা ভাই তলিয়ে গেলাম। বিস্ফোরণের তীব্র গন্ধে চোখ জ্বলছে। এর মধ্যেই পিস্তলের বাট দিয়ে রেজা ভাই আমার পিঠে চাপ দিলেন।

স্টার্ট।

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

একটু এগিয়েই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেকগুলো মৃতদেহের পাশে চলে এলাম। রেজা ভাই থামতে ইঙ্গিত করলে আমি থামলাম। আমার সামনেই ইউনিফর্ম পরিহিত একজন পাকিস্তানী জোয়ানের হাতের অস্ত্রটি ছিটকে গিয়ে পড়ে আছে কয়েক হাত দূরে। রেজা ভাই বললেন, দেখুন ত মড়াটার বেল্টে একটা রিভলবার আছে মনে হচ্ছে।

আমি দেখলাম আছে। বললাম, খুলে নেব?

আপনি আমার হাতের পিস্তলটা ধরুন।

রেজা আমাকে আমার পিস্তলটা ফিরিয়ে দিয়ে লাশের খাপ থেকে রিভলবার বের করে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সেফটি পিন নামিয়ে বলে উঠলেন, খুব ভালো জিনিস। চাইনিজ মেড।

এসময় লাশগুলোর মাঝে একটা গোঙানি শুনতে পেয়ে আমরা উভয়েই হাতের অস্ত্র তাক করে অপেক্ষা করতে থাকলাম। রেজা ভাই বললেন, নাসরিন বেঁচে আছে। জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে।

আমি তার কাছে এগিয়ে যাব?

লাশটির ওপর দিয়ে আস্তে পার হয়ে যান।

আমি মৃত জোয়ানের শরীরের ওপর নিজের বুকটা তুলে দিলাম। তারপর আস্তে করে গড়িয়ে নাসরিনের একটা হাত ধরে ফেললাম। এবার তার গোঙানি ও এলোমলো কথা কানে এল।

যতখুশি মারো আমি বলব না। মাগো।

আমি বললাম, নাসরিন। শুনতে পাচ্ছ? আমরা এসে গেছি। হানাদাররা খতম।

নাসরিনের হাতে আমি মৃদু ঝাঁকুনি দিলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সম্ভবত নাসরিন আবার চেতনা হারিয়েছে। এ সময় রেজা ভাই গুঁড়ি মেরে আমার পাশে চলে এলেন।

আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। এখন কী করব রেজাভাই?

আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। যদি আবার জ্ঞান ফিরে ওকে উঠে বসতে দেবেন না। যে দুতিনজন এখনও স্কুলের ভেতর আছে এরা এখনই সারেন্ডার করতে বাধ্য হবে। মনে হয় রসদ ফুরিয়ে এসেছে। এখন আমাদের লোকেরা স্কুলল ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দেবে। বাছাধনরা যদি জান বাঁচাবার জন্য মাঠে লাফিয়ে পড়ে কিংবা এদিকে এগিয়ে আসে তবে সোজাসুজি পিস্তল থেকে ফায়ার করবেন। দুহাতে পিস্তলের বাট ধরবেন, হাত কাঁপবে না। আমি অন্য পজিশনের দিকে যাচ্ছি। একটু পরেই সকালের আলো ফুটবে। এর আগেই আমাদের সব খতম করতে হবে।

রেজাভাই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন শুনে আমি একটু ভয়ই পেলাম। বললাম, আপনারা এসময় এখানে থাকলেই ভালো হত। নাসরিন এখানে রয়েছে।

আমি না যাওয়া পর্যন্ত স্কুলঘরটায় এরা আগুন দেবে না। নাসরিনের জ্ঞান ফিরলে কী করতে হবে তা তো বলেছি। বুকে সাহস রাখুন। শেষ মুহূর্তে কোনো অঘটন যাতে না ঘটে সে দিকে সতর্ক থাকতে হবে। বুঝতে পারছেন না মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই হল মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য। যদি ওদের রকেট লঞ্চারটা হাতাতে পারতাম তা হলে খুব ভালো হত। মনে হয় সে

সুযোগ হবে না। সবকিছু আগুনে ছাই হয়ে যাবে। আর এ অপারেশনের পরই আমাদের সীমান্তের ওপারে পালাতে হবে। এরা এর মধ্যেই যশোর ক্যান্টনমেন্টে অয়্যারলেসে সম্ভবত বিপদের কথা জানিয়ে সংকেত পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে ভোরের আগে সেখান থেকে সাহায্য এসে পৌঁছুতে পারবে না। এর আগেই সব খতম করে আমরা পালাব।

কথা শেষ করেই রেজাভাই ক্রল করতে শুরু করলেন। আবার প্রচন্ড গুলীর শব্দ মাঠটার চারদিক থেকে এসে স্কুল ঘরের একটি বিশেষ ক্লাসরুমে আঘাত হানতে লাগল। মনে হচ্ছে শত শত রাউন্ড গুলীর আঘাতে ঘরটার টিনের বেড়া, দরজা-জানালা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমাদের পক্ষ থেকে গুলী বর্ষণের তোড় এমন বাড়ল যে, কুল থেকে মাঝে মধ্যে যে জবাব দেয়া হচ্ছিল তাও তলিয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমাদের পেছনের ব্যাটারি থেকে কোনো শব্দ পাচ্ছি না কেন? রকেটের বিস্ফোরণে এরা কী তবে শেষ হয়ে গেছে? নাকি আমাদের কামানটাই বিকল হয়েছে?

ভয় ও এসব এলোমেলো চিন্তাভাবনার মধ্যেই নাসরিন আবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। তার একটা হাঁটু একটু উঁচু হয়েই পড়ে গেল। আমি তার হাতটা মুঠোর মধ্যে রেখে মৃদু ঝাঁকুনি দিলাম।

নাসরিন, আমি হাদী মীর।

বুঝতে পারলাম না নাসরিন আমার উপস্থিতি টের পেল কী না। তার নগ্নদেহটা একবার পাশ ফিরতে গিয়েও পারল না। আবার সে সটান হয়ে ফোঁপাতে শুরু করল। আমি আবার নাসরিনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

নাসরিন, শুনতে পাচ্ছ?

পানি খাব। একটু পানি।

নাসরিন সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, নাসরিন, আমি হাদী ভাই। চিনতে পারছ?

পানি।

নাসরিন আবার অস্ফুট গোঙানিতে পানি চাইল। আমি পিস্তলটা কোমরে খুঁজে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি স্কুল ঘরটার চতুর্দিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রেজা ভাই আগুন ধরিয়ে দেয়ার হুকুম ঠিকমতো দিতে পেরেছেন বুঝলাম। নাসরিন ক্রমাগত ভাঙা আওয়াজে তার তৃষ্ণা ব্যক্ত করতে লাগল, পা-নি।

আমি মুহূর্তমাত্র হতভম্ব অবস্থায় থেকে পাকিস্তানী জোয়ানদের লাশগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেললাম। ভাবলাম যদি এদের বেল্টে কিংবা ইউনিফর্মের সাথে বাঁধা পানির বোতল থাকে? গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম সামনের দেহটার কাছে। একটু হাতড়েই পেয়ে গেলাম পানির বোতল। অনায়াসেই তুলে নিয়ে ছুটে গেলাম নাসরিনের কাছে। কর্ক খুলে ঢেলে দিলাম মুখে। আমার হাত ঠক ঠক করে কাঁপছিল। পানি ছড়িয়ে গেল নাসরিনের চোখে মুখে গলায়। এবার মনে হল নাসরিন সম্পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। আমি বললাম, নাসরিন আমি হাদী, হাদী মীর। তোমার কোনো ভয় নেই। হানাদাররা প্রায় সবই খতম। দ্যাখো রেজাভাই স্কুলটায় এ্যাটাক করেছে। এখন যুদ্ধ শেষ হবে। আমাদের জিত হচ্ছে। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ নাসরিন?

আমি পানির খালি বোতল পাশে রেখে নাসরিনের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে প্রশ্ন করলাম।

আমি এখন কোথায় হাদী ভাই?

স্কুলের মাঠে। আমাদের ছেলেরা স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভেতরে দুতিন জন এতক্ষণ প্রতিরোধ দিচ্ছিল। এবার বেরুবে কিংবা পুড়ে মরবে। দেখতে পাচ্ছ?

আমার কোমরটা নাড়াতে পারছি না। ওরা আমাকে কয়েকজন মিলে...

কথা বল না নাসরিন, আমি সব জানি। তুমি ওঠার চেষ্টা করো না। এটা রেজাভাইয়ের হুকুম। রেজাভাই অচেতন অবস্থায় তোমাকে এখানে দেখে গেছেন। আমাকে তোমার পাহারায় রেখে গেছেন। তোমার কোনো ভয় নেই।

আমাকে ওরা শেষ করে দিয়েছে হাদী ভাই। আমি উঠে দাঁড়াতে পারব না।

বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল নাসরিন।

আমি বললাম, সবই ঠিক হয়ে যাবে বোন। নিজেকে একটু শক্ত কর।

আমার কাছ থেকে এরা একটি কথাও বের করতে না পেরে দশ বারো জন মিলে...

আমি বললাম, আমরা সব জানি নাসরিন, একটু ধৈর্য ধর।

স্কুলে এনেই টেনে আমার কামিজ ছিঁড়ে, সেলোয়ার জোর করে খুলে নিয়ে...

একটু ধৈর্য, নাসরিন একটু অপেক্ষা। আমি তোমাকে ঢাকার ব্যবস্থা করছি।

আমি আমার শার্টটা দ্রুত হাতে খুলে নাসরিনের হাতে দেওয়া মাত্র সে তার নগ্নতা ঢাকার চেষ্টা করল। শার্টটায় তার উদোম নাভি ও নিম্নাংশ ঢাকা পড়ল বলে মনে হল। স্কুলের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় মাঠটা ফর্সা। আমি নাসরিনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মাত্রই মাঠটার চারদিক থেকে হই চই করে আমাদের সশস্ত্র গেরিলারা স্কুলের দিকে এ্যাডভান্স করতে লাগল। আর তক্ষুণি জ্বলন্ত স্কুলের জানালা থেকে তিনটি সশস্ত্র জোয়ান লাফিয়ে পড়ল স্কুলের বারান্দায়। সঙ্গে সঙ্গেই গুলীর ঝাঁক ছুটে গেল সেদিকে। আমিও আমার পিতল বারান্দার দিকে তাক করে দুহাতে বাগিয়ে ধরলাম। আমার হাত ও শরীর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে।

এক ঝলক গুলীর বাতাস কাটা শব্দ আমার ও নাসরিনের ওপর দিকে পার হয়ে গেল। নাসরিন আবার পাশ ফিরতে কাঁধ ও কোমর ফেরাবার চেষ্টা করছে। পারল না। ব্যথায় কঁকিয়ে কাঁদল, পারি না, হাদী ভাই। আমায় একটু ঘুরিয়ে দিন। আহ, ও মাগো।

আমি পিস্তল নামালাম।

পিঠে একটু ঠেলা দিন।

আমি পিস্তলটা রেখে নাসরিনের পিঠে আস্তে আস্তে ঠেলতে লাগলাম। এবার উপুড় হয়ে পড়ল সে। আমি বললাম, এই তো পেরেছ।

নাসরিনের পেছন দিকটা আবার উদোম হয়ে যাওয়াতে আমি শার্টটা টেনে ঢাকলাম। এখন শীতের প্রারম্ভকাল। বাতাসে একটু শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। আমার গেঞ্জি পরা থাকলেও বেশ শীত লাগছে। কিন্তু নাসরিনের পিঠে ঠেলা দেবার সময় বুঝেছিলাম সে দর দর করে ঘামছে। আকাশে চাঁদের ফালিটা এখন দক্ষিণ- পশ্চিম দিকে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। রাতের পাখিরা আগুনের শিখায় ও গুলীর শব্দের মধ্যেও কোথাও ডেকে চলেছে। খুব দূরের কোনো ঝোপঝাড় থেকে কোকিল ডেকে চলেছে। সম্ভবত রাতজাগা প্রাণিকুলদের মধ্যে চতুর্থ প্রহরের অতিক্রান্তি প্রাকৃতিক ইঙ্গিতের মতো ঘোষিত হল। বারুদের ঝঝে ভারী বাতাসেও জোনাকিরা জ্বলছে। ঝিঁঝির শব্দ উঠছে পেছনে ফেলে আসা নালাটার পাড় থেকে। এতক্ষণে সারা স্কুলটাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অথচ অনতিদূরে মানুষের বসতিতে এর কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। গুলীর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ বা কলরব এতক্ষণ শুনি নি। হানাদারদের জুলুম- অত্যাচারের ভয়ে সারা দেশের নিরুপায় সাধারণ মানুষ যেন বোবা হয়ে আছে। এর ওপর আছে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অপবাদ ও নির্মম পীড়ণ। গাঁয়ের মেয়েদের ওপর হানাদাররা যে পৈশাচিক আচরণ ও ধর্ষণলীলা চালাচ্ছে তাতে নাৎসীরাও লজ্জা পেত। অথচ এরা নিজেদের মুসলমান বলে সারা দুনিয়ার কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আজ হোক কিংবা কাল এরা পরাজিত হবেই। নীতিবোধহীন সেনাশক্তি আধুনিক মারণাত্রের জোরে ক্ষণকালের জন্য বিজয়ী হলেও পরাজয়ই এদের শেষ ভাগ্যলিপি। ইসলামের এমন অবমানকারীদের আল্লাহ নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। অমর্যাদাই এদের

ললাট লেখন। এইতো এরা এখন বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিযোদ্ধাদের চোরগুপ্তা আক্রমণের মুখে দিশেহারা। এখানে আমাদের ষাট সত্তরজন আনাড়ি গেরিলার কাছে পরাজিত।

নাসরিন এতক্ষণ উপুড় হয়ে শোয়ার আরামটা পেয়ে চুপ করেছিল। এখন আবার গোঙানির শব্দ পাচ্ছি। আর ফুঁপিয়ে কান্না। আমি বললাম, খুব কষ্ট হচ্ছে?

কোমরের পেছনের হাড়ে খুব ব্যথা হচ্ছে। নাঈয়ের নিচেও হুল ফুটানোর ব্যথা। আহ।

ভালো লক্ষণ। এতক্ষণ তো তোমার সারা শরীরই অসাড় ছিল। ব্যথাবেদনা বোঝার বোধশক্তি ছিল না। এখন অন্তত ব্যথার অনুভূতিটা ফিরে আসছে। তুমি ভালো হয়ে যাবে নাসরিন।

ওরা আমাকে একদম শেষ করে দিয়েছে। আমি আর বোধহয় হাঁটাচলা করতে পারব না।

এবার বেশ জোরে বিলাপ করতে লাগল নাসরিন। আমি তাকে এখন সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু আরও কিছুক্ষণ তাকে সহ্যের মধ্যে রাখতে পারলে হত। বললাম, আর সামান্য সময় মুখ বুজে পড়ে থাক বোন। তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। স্কুলের বারান্দায় এখনও দুতিন জন হানাদার পজিশন নিয়ে আছে। গুলী ছুঁড়ছে। এখানে মানুষের আওয়াজ পেলেই আমাদের নিশানা বানাবে। একটু চুপ করে থাক।

আমার কথায় নাসরিন ঘাসের ওপর ব্যথায় মুখ ঘসটাতে থাকল। এখন বিলাপ বন্ধ। মাঠের মাঝে যারা একটু আগে জয় বাংলা বলে হই চই তুলে অস্ত্র উঁচিয়ে স্কুলটা ঘিরে ফেলতে যাচ্ছিল তারা সবাই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে। বারান্দায় লাফিয়ে পড়া শত্রুদের এদের সবাই সম্ভবত দেখে সাবধান হয়েছে। কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে বলেও মনে হল না। স্কুলের আগুনটা এতক্ষণে প্রায় মিইয়ে এসেছে। জ্বলন্ত চালা, কড়িকাঠ ইত্যাদি হঠাৎ কাঠামোসহ ভেঙে পড়ল মাটিতে। দৃশ্যটা দেখেই আমাদের পক্ষের গুলীর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আগুনটা নিচে নেমে আসাতে মাঠের বুকে যে আবছা আলো ছিল তা এখন অন্ধকারে ডুবে গেল। বারান্দার দিকটাও নিস্তব্ধ। দুশমনরা আর জবাব দিচ্ছে না। এসময় হঠাৎ রেজাভাইয়ের গলা শুনতে পেলাম। তিনি স্কুলের মাত্র বিশ ত্রিশ গজ দূরে থেকে উর্দুতে শত্রুদের উদ্দেশ্যে কী যেন বললেন। আমি শুধু হাতিয়ার শব্দটাই বুঝতে পারলাম। পাকিস্তানীরা কোনো জবাব দিল না। তবে পাল্টা গুলীও না করাতে বোঝা গেল তারা সারেন্ডারের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছে না। এবার সারা মাঠ থেকেই আমাদের ছেলেরা সারেন্ডার সারেন্ডার বলে চীৎকার করে উঠল। তারপরই শুরু হল বেপরোয়া গুলীর ঝড়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একতরফাভাবে গুলীর তুফান বইতে লাগল। মনে হল সারেন্ডার করার জন্য বারান্দার নিচে আর কেউ বেঁচে নেই। পাল্টা একটাও গুলীর শব্দ না থাকাতে আলী রেজা মাঠের একদিক থেকে এ্যাডভান্স বলে কমান্ড দিলেন। গুলীর শব্দ জ্বলন্ত ভিটেটার দিকে এগোতে

লাগল। আমি অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নাসরিন তার নাভির তীব্র ব্যথায় আমার একটা পা চেপে ধরেছে।

আমাকে গুলী করে মেরে ফেলুন আমি আর সইতে পারছি না ওমা, মাগো।

নাসরিন আর কয়েক মিনিট, আমরা জিতে গেছি বোন। একটু পরেই তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

আমি তাকে পিঠের ওপর হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। সে আবার একটা বাচ্চা মেয়ের মতো বিলাপ করতে লাগল। ব্যথা নিশ্চয়ই খুব তীব্র যা নাসরিনের বিকৃত ও ভেঙে যাওয়া কণ্ঠস্বর থেকে আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, নাসরিন আল্লার নাম বল। বল আল্লাহ আল্লাহ আমাকে পানাহ দাও।

আমার কথামতো নাসরিন ভাঙা বিকৃত গলায় আল্লাহ, আল্লাহ বলে কাঁদতে লাগল। আমি নাসরিনের মাথায় হাত রেখে স্কুলের জ্বলন্ত ভিটে বাড়ির ওপর নজর রাখলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই সবাইকে হতবাক করে দিয়ে মাঠের বাঁ পাশে দাঁড়ান একটা জিপের হেড লাইটের আলো জ্বলে উঠল। জিপটার স্টার্টের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাড়িটা তীব্র বেগে এগিয়ে এসেই বাঁক ঘুরে রাস্তায় নেমে গেল। এর আগেই আমাদের ছেলেরা জিপটার দিকে গুলীবর্ষণ করলেও জিপটা বেপরোয়া রাস্তায় নেমে পালিয়ে গেল। অন্য জিপটার দিকে কারা যেন হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গ্রেনেড ফাটার বিকট শব্দ এলাকাটাকে কাঁপিয়ে দিলেও আমাদের বুঝতে বাকি রইল না দুশমনদের দুতিন জন আমাদের ফাঁকি দিয়ে চোখের সামনে পালিয়ে গেছে। গুলীর শব্দ থেমে গেলে আমি উঠে বসলাম। এক ধরনের হতাশা ও হতভম্বের মাঝে আমাদের বিজয় শেষ হল। একটু পরেই দূরের মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে এল। মনে হল গত রাতের এই প্রচন্ড গুলীর শব্দ, কামান এবং লাইট মেশিন গানের শব্দের মধ্যেও যেন এলাকাবাসী নির্বিকার। প্রাত্যহিক নিয়মেই যেন মোয়াজ্জিন আজান হাঁকলেন। আমার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। এখান থেকে গ্রামগুলো খুব দূরে নয়, আশেপাশেই ছড়ান। রাতের এই প্রচন্ড যুদ্ধের ভয়াবহতা তারা না বুঝলেও নিশ্চয়ই গোলাগুলির শব্দে ঘুমোতে পারে নি। অথচ কেউ দল বেঁধে গ্রাম থেকে এদিকে এগোল না। জানতে চাইল না এখানটায় গতরাতে কী ঘটেছে? নাকি সব ভয়ে উদাসিনতার ভান করে দূরে সরে থাকতে চাইছে?

মাঠটার এদিক ওদিক থেকে নানা গ্রুপের মুক্তিরা টর্চের আলো ফেলে পরস্পরকে বিজয়সূচক অভিবাদন ও আনন্দ প্রকাশ করছে। এবার মাঠের মধ্যে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ সিগ্রেট ধরাচ্ছে বুঝতে পেরে আমিও পকেট থেকে প্যাকেট খুলে একটা ধরালাম। এখন নাসরিনের কাতরানি একটু স্তিমিত হয়ে এসেছে। সম্ভবত নাসরিন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা অচৈতন্য হয়ে আছে। প্রতিহিংসামূলক ধর্ষণ যে কী ভয়াবহ ব্যাপার সে অভিজ্ঞতা তো আমার

আগেই খানিকটা হয়েছে। নাসরিনের ব্যাপারটা একেবারেই আমার কাছে অসহনীয়। ঘৃণায় আমি আবার পাশে পড়ে থাকা নর পশুদের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরালাম। নিষ্প্রাণভাবে কুঁকড়ে পড়ে আছে সব। হয়ত এদের নিজের দেশে এদের স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজন প্রেম ভালবাসা সামাজিকতা সবই আছে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই পশুদের হুকুম তামিল করতে এসে নিজেরাই পশুর অধম আচরণ করে মানুষের ধর্ম ও মানবিক বিবেক পরিত্যাগ করে একদম পশু হয়ে গিয়ে প্রাণ হারাল।

আমার তন্ময়তার মধ্যে আলী রেজা এসে কখন যেন নাসরিনের পাশে বসলেন। হঠাৎ চমকে আমি মুখ তুলে তাকালাম। পূর্ব দিগন্ত তখন ফর্সা হয়ে গেছে। যদিও সূর্যের লাল আভা তখনও দেখা দেয় নি। আমি বললাম, রেজা ভাই?

আমাদের এখন আর কথা বলার সময় নেই কবি সাহেব। আমাদের এখনই স্থান ত্যাগ করতে হবে। শত্রুরা অচিরেই এখানে এসে পড়বে।

আমি বললাম, নাসরিনের অবস্থানে তো সুবিধের নয়। সে হেঁটে যেতে পারবে না। এতক্ষণ জ্ঞান ছিল। আমার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছে। সে আপনাদের কোনো গোপনীয়তাই শত্রুর কাছে ফাঁস করে নি। সে কারণেই বেশি জুলুম চলেছে তার ওপর। এখন মনে হয় ব্যথায় জ্ঞান হারিয়েছে।

নাসরিনকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি কবি সাহেব, আমি জানি সে কিছু বলে নি। এখন তাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে। আমাদের লোক একজন বোকামি করে শত্রুদের ফেলে যাওয়া গাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। তা না হলে এগাড়িতেই সীমান্ত পার হয়ে যাওয়া যেত।

এখন তাহলে কী ব্যবস্থা করবেন?

এ মেয়েটার জন্য আপনার সাহায্য দরকার। আপনার ভগ্নিপতি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একজন হোমরাচোমরা। আপনি নাসরিনকে এক্ষুণি নিয়ে কলকাতায় রওনা হোন। সেখানে কোনো ক্লিনিকে রেখে তার চিকিৎসা করাতে হবে। খরচ আমরা দেব।

বললেন কমরেড আলী রেজা। তার গলায় পিতৃসুলভ মমতা ও আমার প্রতি গভীর বিশ্বাস ব্যক্ত হল। আমি বললাম, আমি তৈরি রেজা ভাই। আমি নাসরিনের জন্য সবকিছু করব। এখনি বলুন তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় কী উপায়ে?

সে ব্যবস্থা হচ্ছে। মোজাফফর গ্রুপের লোকেরা একটা ইউনিটসহ স্ট্রেচারে রোগীকে নিয়ে আপনাদের সীমান্ত পার করে প্রাইভেট কারে তুলে দেবে। কথা হয়েছে। আমরা লতিফকে

বাঁচিয়েছি। তারা এর প্রতিদান দিতে চায়। আমরাও এ সাহায্য নিতে বাধ্য। এমনিতে তাদের সাথে আমাদের আদর্শগত সংঘাত আছে। তবে এসময় সহযোগিতা।

কেমন যেন হতাশ গলায় আশার সংবাদ বললেন আলী রেজা। আমি বললাম, আপনার গলা কাঁপছে কেন রেজা ভাই? আপনার অপারেশন প্ল্যান কী সফল হয় নি?

হ্যাঁ হয়েছেই বলা যায়। তবে আমাদের ক্ষতিটা মারাত্মক। আমার ছজন সঙ্গীই মেশিনগানের গুলীতে শহীদ হয়েছে। কামানটার ব্যারেল ব্যাটারি সব লন্ডভন্ড। অস্ত্রের ক্ষতিটা আমি পুষিয়ে নিতে পারব। আপনাদের ফেরত দেয়া টাকায় অস্ত্র কেনা যাবে। কিন্তু যাদের আজ এই যুদ্ধে হারালাম তারা ছিল আমার আজীবনের আদর্শগত সাথী। উচ্চশিক্ষিত তাত্ত্বিক। বিপ্লবী ভ্রাতা। এদের ছাড়া আমাদের সমগ্র পার্টিটাই স্থবির হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। যাক আর দেরি করা উচিত হবে না। ঐ যে কমরেড মোজাফফরের লোকেরা স্ট্রেচার নিয়ে আসছে।

বললেন কমরেড আলী রেজা। গলা বিষাদে আক্রান্ত। দৃষ্টি উদাসীন। চারজন লোক একটা স্ট্রেচার এনে নাসরিনের পাশে রেখেই নাসরিনকে স্ট্রেচারে তুলে নিলো।

স্টেচারের মধ্যেই একটা সাদা চাদর ছিল। চাদরে তার দেহটা আবৃত করে দিলেন রেজা ভাই। নাসরিনের মুখ থেকে কোনো আহা উঁহু শব্দ নেই। ব্যথার কাতরানি নেই। সে সম্পূর্ণ অচৈতন্য।

আমি রেজা ভাইয়ের দিকে বিদায়ের জন্য মুখ তুললাম।

যান।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে গেলে রেজা বললেন, আমি বাদুড়িয়া ক্যাম্পে আপনার সঙ্গিনীকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে দেব। তিনি কলকাতায় গিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সব ব্যবস্থা আমরা করব। আমরা কয়েকদিনের জন্য ইছামতীর ওপারে অবস্থান নেব।

১০. নাসরিনকে কলকাতার একটি ক্লিনিকে ভর্তি

নাসরিনকে কলকাতার একটি ক্লিনিকে ভর্তি করে দেয়া হল। বর্ডার ক্রশ করেই আমি ও মোজাফফর গ্রুপের লোকেরা আট নম্বর থিয়েটার রোডের অফিসে ইমামের সাথে যোগাযোগ করি। ভাগ্য ভালো যে তাকে সেখানেই পেয়ে যাই এবং হরিপুর চেক পোষ্টের কাছে একটি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিই। তিনি সেদিন সন্ধ্যায় একজন ডাক্তার ও একজন নার্সসহ একটি এ্যাম্বুলেন্স মাইক্রোবাস পাঠিয়ে দিলে আমরা গভীর রাতে কলকাতায় পৌঁছি। ডাক্তার ও নার্সগণ মুহূর্তের মধ্যে নাসরিনকে ক্লিনিকের জরুরি বিভাগে তুলে নেয়। আমি

বুঝলাম ইমাম সাহেব সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। সম্ভবত এ ধরনের গুরুতর ঘটনা মোকাবেলা করতে করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি নাসরিনকে নিয়ে একাই এসেছি। মোজাফফর গ্রুপের লোকেরা নাসরিনকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে আমার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে যায়।

পার্ক স্ট্রীটের একটা দুতলা বাড়িতে ক্লিনিকটা। নাম রোজ ক্লিনিক। ক্লিনিকের লোজন নাসরিনের সাদা কাপড় ঢাকা দেহটাকে এ্যাম্বুলেন্সের ভেতরকার স্ট্রেচারসহ সরাসরি বয়ে এনে লিফটে ঢুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সে মুহূর্তে রোগীর সাথে না গিয়ে একটা সিগ্রেট জ্বালিয়ে বারান্দায় পায়চারী করছিলাম। এ সময় একজন মহিলা ডাক্তার এসে আমাকে বলল, ওপরে চলুন। জয়বাংলা সরকারের একজন সেক্রেটারি আমাদের অফিস কামরায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমি হাতের সিগ্রেটটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বললাম, চলুন।

ওপরে এসে দেখি ক্লিনিকের ডাইরেক্টরের অফিস রুমে ইমাম ও পারুল আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি ঢোকামাত্রই উভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সালাম জানাল। পারুল বলল, ভাই আপনি অক্ষত আছেন দেখে আল্লার শোকর আদায় করছি।

আমি হেসে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললাম, দেহের বাইরেটা অক্ষত আছে বোন তবে ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধটা কী এবং কোথায় চলছে আমি জানতে চেয়েছিলাম। এখন আমি তা জানি।

যুদ্ধটা আপনার কাজ নয় ভাই। লেখালেখিটাই আপনার কাজ। আশা করি আপনি এখন তা বুঝতে পারছেন। আমি দেশ থেকে আপনাকে স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লেখার জন্যই এনেছিলাম। কিন্তু আপনি ও নন্দিনী দিদি জিদ ধরে দেশের ভেতরে চলে গেলেন। এখন অন্তত আপনার যুদ্ধের সাধ মিটেছে।

বলল ইমাম।

আমি জবাব না দিয়ে চুপচাপ কতক্ষণ বসে থাকলাম। এরা আমার শুভার্থী এবং নিকট আত্মীয়। সরাসরি দেশের ভেতরে গিয়ে আমি বা আমার স্ত্রী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি এটা এরা প্রথম থেকেই চায় নি। ইমামের ইচ্ছে ছিল আমি কলকাতায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের ওপর কবিতা গল্প প্রবন্ধ লিখে মটিভেশনের কাজটা চালিয়ে যাই। এতে পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে কলকাতার লেখকদের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও বিনিময় বাড়বে। কিন্তু যুদ্ধের সময় পরিকল্পনা মোতাবেক কোনোকিছুই ঘটে না। কে জানতো আমার স্ত্রী তার ব্যক্তিগত শুভাশুতের চিন্তা না করে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। অথচ সে ইচ্ছে করলে নিরাপদে কলকাতায় বসে থেকে যুদ্ধের দিনগুলো কাটিয়ে

দিতে পারত। আর নন্দিনী? দুর্ভাগ্যই কী নন্দিনীকে আমার কাছে এনে দিয়েছে না আমিই কর্তব্যবোধের চেয়েও অন্যবিধ কোনো মানবিক তাড়নায় নন্দিনীকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পারুলের দিকে মুখ তুলে মিতুর কথা জিজ্ঞেস করলাম, তোরা মিতুকে আনিস নি কেন? মিতু কেমন?

মিতুকে এখানে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। ভালোই। জবাব দিল পারুল।

ইমাম বলল, আপনি যে রোগিনীকে নিয়ে এসেছেন তাকে দেখতে গেছেন ডাঃ অজয় রায়। এই ক্লিনিকের পরিচালক। এক সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমার সাথে আগে থেকেই পরিচয়। পরিচিত বলে এখানেই ব্যবস্থা করেছি।

খুব ভাল করেছেন।

ডাক্তার এখনই এসে অবস্থা জানাবেন। এখনও সম্ভবত জ্ঞান ফেরে নি।

জ্ঞান ফিরেছে।

ইমামের কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার রায় এসে ঘরে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে ইমামের দিকে ফিরে আমায় বললেন, দৈহিক পীড়ন যেমন মারাত্মক তেমনি মানসিক ভীতিও মারাত্মকভাবে চেপে বসেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে দুসপ্তাহ সময় লেগে যাবে মনে হচ্ছে। আপনারা সাত নং কেবিনে গিয়ে দেখে আসুন। এর নিকট আত্মীয় কেউ এখানে আছেন কি?

আমি বললাম, আমি আছি।

এর মা বাবা কেউ নেই?

ওর মা বাবা এখনও কিছু জানে না সম্ভবত। তবে পরিস্থিতি তেমন হলে তাদের না হয় খবর দিয়ে আনানো যাবে।

বললাম আমি।

ডাক্তার আমার দিকে ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালে পারুল বলল, ইনি আমার ভাই কবি হাদী মীর। দেশের ভেতরে একটা অপারেশন থেকে ফিরলেন।

ডাক্তার রায় আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দরকার হবে না। সুস্থ হয়ে উঠলেই বরং গার্জিয়ানদের খবর দেবেন। তবে দিন পনেরো মিসেস ইমাম বিকেলের দিকে এসে রোগীকে সঙ্গ দেবেন। আর আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী আপনার কাছে পরে একদিন শোনা যাবে। এখন আপনারা গিয়ে রোগিনীকে দেখে আসুন।

সাত নং কেবিনে এসে দেখি একজন নার্স নাসরিনকে হাসপাতালের সাদা জামাপায়জামা পরিয়ে দিয়ে চুল আঁচড়ে পরিপাটি করে দিচ্ছে। এখন তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না দীর্ঘ সময় অজ্ঞান হয়েছিল। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে সে খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বললাম, নাসরিন আমি হাদী। এখন কেমন আছ?

নাসরিন কোনো জবাব দিল না। তার বেডের অপর দিক থেকে একজন নার্স বলল, এখন একে কোনো প্রশ্ন না করাই ভালো। মাত্র বিশ মিনিট আগে জ্ঞান ফিরেছে। ব্যথা বেদনা কমানোর ইনজেকশনের ফলে চোখ মেলে তাকিয়েছে। এখন একটানা চারঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠলে গা গতর নাড়াতে পারবে। আপনারা কথা বলে রোগীর টেনশন বাড়াবেন না।

আমার নার্সের কথায় চুপ করলে সে সেলাইনের টিউব ইত্যাদি ঠিক করতে করতে আমার দিকে ফিরে বলল, আপনাদের মধ্যে রেজা কে?

আমি বললাম, তিনি এখানে নেই।

তাকে বলবেন একবার রোগীকে দেখে যেতে। সেন্স ফেরার সাথে সাথে তার নাম বলছিল।

আমি বললাম, কমরেড আলী রেজা রোগিনীর গার্জিয়ান এবং রাজনৈতিক শিক্ষক। একজন মুক্তিযোদ্ধা। সময় পেলে তিনি নিশ্চয়ই একবার নাসরিনকে দেখে যাবেন। আমরা তাহলে আসি।

আসুন। কোনো চিন্তা করবেন না। দিন পনেরোর মধ্যে রোগী সেরে উঠবে।

আমরা ডাক্তার রায়ের চেম্বারে গিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইমামের গাড়িতে এসে উঠলাম।

গাড়ি পার্ক সার্কাসের দিকে মোড় নেয়া মাত্র ইমাম আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনার জন্য আরও একটি দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত কবি ভাই।

আমি হতভম্ব হয়ে ইমামের দিকে ফিরে দুঃসংবাদটি জানতে চাইলাম।

হামিদা ভাবি ঢাকায় গুরুতর আহত হয়ে একটা গোপন জায়গায় আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাকে সীমান্ত পার করে আনা এখন এই মুহূর্তে অসম্ভব। আবার দেশের ভেতরে অর্থাৎ রাজধানী ঢাকাতেই তিনি এখন যে অবস্থায় যেখানে আছেন যে কোনো মুহূর্তেই ধরা পড়ে যেতে পারেন। আমি মাত্র গতকালই আমাদের সোর্স থেকে এ খবর পেয়েছি। আপনার বোন বা ভাগ্নিকেও এখবর জানাতে পারি নি কারণ এদের উৎকণ্ঠা বাড়বে।

হামিদা কী গুলিবিদ্ধ হয়েছে?

না। সিদ্ধিরগঞ্জের কাছে একটা পাওয়ার গ্রীড কাটতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে উরুর হাড় ভেঙ্গে গেছে। তাকে দ্রুত সরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তার সাথের বিশজনের মধ্যে নজনই স্পট ডেড। বাকি এগারজনের একজন ভাবি যিনি গুরুতরভাবে আহত। বাকি দশজনের গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগে নি। এ সংবাদ আপনাকে এ সময় না জানানোই ভালো ছিল। তবে তাকে ঢাকার বাইরে নিয়ে আসার ব্যাপারে আপনি একটা পথ বাৎলাতে পারেন ভেবে আপনাকে বলা। অপারেশনের নেতৃত্বে দুজন ছিলেন। একজন পোলের ওপর ইলেক্টিফায়েড হয়ে শহীদ হয়েছেন। অন্যজন ভাবি, পোলের গোড়ায় সমস্ত দল নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। গোড়ায় যে মাইন পাতা থাকতে পারে চিন্তা করেন নি। হঠাৎ বিস্ফোরণ। আশেপাশের গাঁও গেরামের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত সাহায্যের জন্য এগিয়ে না এলে ভাবিসহ পুরো দলটাই ধরা পড়া যেত। এরা ব্যাপারটা হঠাৎ আন্দাজ করতে পেরে অত্যন্ত বিপদের মধ্যে রাত তিনটায় রাস্তাঘাটে এ্যাম্বুশ করে পাঞ্জাবিদের ঠেকিয়ে দ্যায় এবং ভাবিসহ অন্যরা নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পারে।

ইমামের কথায় হতবুদ্ধি হয়ে আমি ও পারুল গাড়ির ভেতর বসে পরপর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ইমাম এমন একটা মারাত্মক সংবাদ আমার বোনকেও জানায় নি। পারুলের মুখ দেখে বোঝা যায় ইমামের এই চেপে রাখার ব্যাপারে সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। ইমাম আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, আপনার বোনের কাছে বিষয়টা বললে সে অযথাই উদ্বিগ্ন হয়ে কান্নাকাটি করত। এখান থেকে ভাবিকে সাহায্য করার আমি যে সামান্য চেষ্টাচরিত্র করছি তাতে বাধা পড়ত। এখন আপনি কিছু একটা করবেন ভেবেই বললাম। আমার অপরাধ নেবেন না।

আপনি বলুন কলকাতায় বসে আমি এর এখন কী বিহিত করতে পারি? আমার মাথায় তো কোনো উপায় খেলছে না।

আপনি এই মুহূর্তে কিছু করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। তবে আমার একথা বলার কারণ যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে ঢাকায় রওনা হওয়ার মানসিক প্রস্তুতিতে রাখা।

আমি বললাম, আমি এই মুহূর্তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আপনি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে আমি এখনই রওনা দেব।

আমার কথায় পারুল ও ইমাম উভয়ই খুশি হয়েছে বলে মনে হল। আমি নন্দিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পের কথা নাসরিনকে আনার সময় টেলিফোনে ইমামকে জানিয়েছিলাম। পারুল বলল, দিদিকে সম্ভব হলে খবরটা পাঠানো উচিত।

আমি বললাম, নন্দিনী দুএকদিনের মধ্যে কলকাতায় আসবে। আমার গ্রুপ কমান্ডার আলী রেজা এতক্ষণে নিশ্চয়ই নন্দিনীকে নাসরিনের বিষয় জানিয়ে আমি যে কলকাতায় এসেছি একথা জানিয়েছেন। খবর পেলে সে আর দেরি করবে না। গাড়ি ইমামের বাসার সামনে এসে দাঁড়াল।

.

পরের দিন বেশ দেরিতে আমার ঘুম ভাঙল। বেলা নটায় মিতুর চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল, মামা উঠুন, এক ভদ্রলোক সকাল থেকে আপনার জাগার জন্যে বসে আছেন।

কোথায়?

ড্রইংরুমে।

নাম জিজ্ঞেস করিস নি?

মিঃ আলী রেজা।

মিতুর কথায় আমি লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। দ্রুত বেসিনে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে দেখি রেজাভাই মাথা নিচু করে চিন্তিত মুখে চুপচাপ বসে আছেন। আমি সালাম বলেই রেজা ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, রেজাভাই আপনি এসছেন?

আগে নাসরিনের কথা বলুন।

তাকে আমার ভগ্নিপতি একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তির ব্যবস্থা করে রেখেছিল। গতকালই তার জ্ঞান ফিরেছে। শুধু রাতের খবরটা আমি নিতে পারি নি। আমিও খুব বিপদগ্রস্ত রেজাভাই। খুব ক্লান্ত।

আমাদের কোলাকুলির মধ্যে মিতু ও পারুল এসে ঢুকল।

সকালে ইমাম রোজ ক্লিনিকে টেলিফোনে জেনেছে মেয়েটি আজ সকাল থেকেই উঠে বসতে পারছে। তার পরিপূর্ণ সেন্স ফিরে এসেছে এবং আপনার আর আলী রেজা সাহেবের খোঁজ করছে। তাকে ডাঃ রায় সব খুলে বলেছেন। এখন মোটামুটি ভালো আছে, চিন্তার কিছুই নেই। ভাই আপনি মেহমানকে নিয়ে খাওয়ার টেবিলে চলে আসুন। নাস্তা আর কফি দেয়া হয়েছে। আপনাদের জামাই অফিসে গেছেন। আসুন নাস্তা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বলল পারুল।

আমি বললাম, এ আমার বোন পারুল, এটা মিতু, ভাগ্নি। আর ইনি আমার গ্রুপ কমান্ডার কমরেড আলী রেজা। আর নাসরিন এর ছাত্রী। আমরা দর্শনায় এর নেতৃত্বেই একটা অপারেশনে সফল হয়েছি। চলুন রেজাভাই ভেতরে গিয়ে নাস্তা খেতে খেতে এদের সাথে আলাপ করবেন।

আমরা এসে নাস্তার টেবিলে বসলাম। কলা, ডিম, আপেল আর পাউরুটি সাজানো খাবার টেবিলে। আলী রেজা দেখেই খুশি হয়ে বললেন, এত নাস্তা বেশ কিছুকাল আমার কপালে জোটে নি কবি সাহেব। আগে কিছু খেয়ে নিই তারপর কথা বলব। নাসরিনের ভালো ব্যবস্থা করেছেন আপনার বোন আর ভগ্নিপতি এতেই এ পরিবারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতায় সীমা নেই।

পারুল হেসে বলল, এটা আপনি কী বলছেন রেজা ভাই, আপনারা দেশের ভেতরে লড়ছেন, প্রাণ দিচ্ছেন, এটা তো আমাদের কর্তব্য।

তোমাকে বোন আমি ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করব না। তোমরা যে মেয়েটিকে ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছ সে আমার কন্যা তুল্য। তার ভালোমন্দের সাথে আমার বিবেক জড়িত। তার চিকিৎসার সমস্ত টাকা আমি দিতে এসেছি।

নাসরিনের চিকিৎসার খরচ আপনাকে বহন করতে হবে না রেজাভাই। যে ক্লিনিকে তাকে আমরা ভর্তি করেছি সে ক্লিনিকের ডাঃ রায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আহত একজন যোদ্ধার চিকিৎসার ব্যয় ক্লিনিকই বহন করবে বলে জানিয়েছেন। তারা আমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেবেন না। নিলে বাংলাদেশের সরকারই তা বহন করত। আপনি কেন দেবেন?

পারুল রেজা ভাইয়ের কাপে কফি ঢেলে দিতে গেলে তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি বলছিলেন আপনি খুব বিপদগ্রস্ত। কী ব্যাপার বলুন তো?

ঢাকার কাছে একটা অপারেশন আমার স্ত্রী মাইনের আঘাতে পঙ্গু হয়ে ঢাকায় আটকা পড়েছে। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে বিপদ হতে পারে। চিকিৎসাও হচ্ছে না।

রেজা ভাইকে সংক্ষেপে হামিদার বিপদের কথা জানালে তিনিও স্তম্ভিত হয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন, কী সাংঘাতিক! এতক্ষণ এখবরটা আমাকে বলেন নি কেন? আমাদের কয়েকটা শক্তিশালী ইউনিট ঢাকায় কাজ করছে। এ ব্যাপারে তারা খুবই সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া আমাদের যে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হল সেটা পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটিকে রিপোর্ট করতে হলেও ঢাকার কাছাকাছি এক জায়গায় আমাকে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। আর আপনি তো জানেন আমাদের একজন কমরেড গৌহাটিতে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের হাতে আটকা পড়ে আছে। তাকে ছাড়াতে হলেও আমাকে ঢাকা হয়ে আসামে ঢুকতে হবে। আপনার স্ত্রীর অবস্থানের খবর আমাকে জানালে তার চিকিৎসার ভার আমাদের ইউনিটগুলো নিতে পারবে বলে ধারণা করি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রেজা ভাই। আমার ভগ্নিপতি এখনও আমার স্ত্রীর অবস্থানের কথা আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। শুধু বলেছেন তিনি শাজাহানপুরে একটি বাড়িতে আপাতত আশ্রয় পেয়েছেন। আশ্রয়টি খুব নিরাপদ নয়। সেখান থেকে তাকে অবিলম্বে সরিয়ে আনতে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের লোকেরা সাধ্যমতো সাহায্য করবে। আমাদের একটা মেডিক্যাল ইউনিট আছে তারা চিকিৎসার ব্যবস্থাও করবে।

আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন রেজাভাই। কফি পান শেষ হলে আমি বললাম, রোজ ক্লিনিকটা কাছেই। চলুন নাসরিনকে দেখে আসি।

রেজাভাই বললেন, এখন সাড়ে দশটা বাজে আর একটু অপেক্ষা করে গেলে সম্ভবত আপনার বান্ধবী নন্দিনীকে সাথে নিয়ে যেতে পারবেন। আমি বাদুড়িয়া থেকে সরাসরি কলকাতায় এসেছি। তাকে গত রাতেই আপনার এখানে আসা, নাসরিনের ঘটনা সব জানিয়েছি। তিনি পারমিশন নিয়ে বেলা বারটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। আমি ম্যাসেজ পৌঁছে দিয়ে রাতেই রওয়ানা হই। নন্দিনী ভালোই আছেন। তবে আপনার জন্যে দেখলাম খুবই চিন্তিত।

পারুল রেজা ভাইয়ের কথায় চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

কবি ভাইকে আরো এক কাপ কফি দেব?

দে।

পারুল আরো এককাপ কফি আমার কাপে ঢেলে দিয়ে এক চামচ চিনি মিশিয়ে দিয়ে বলল, দিদি যখন বারটায় বাসায় এসে পৌঁছুবেন তখন একটু অপেক্ষা করেই বেরুন।

আমি কোনো কথা না বলে পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পারুলের কৌতূহলী চাওনি থেকে নিজেকে আড়াল করতে চাইলাম। আমার বোনও সম্ভবত আমার হৃদয়ের এক দোদুল্যমান অন্তরালকে উদঘাটনের চেয়ে নীরব থাকাই বেহতের ভেবে রেজা ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বলল, আপনারা অন্য কামরায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। দিদি যদি বারটায় আসেন তবে নাওয়া- খাওয়া করেই ক্লিনিকের দিকে বেরুলে ভালো হবে। আমি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে রান্নার পাট চুকিয়ে ফেলব। মিতুর আব্বাও এর মধ্যেই আশা করি ফিরবেন।

রেজা বললেন, সেটাই ঠিক হবে।

কফি শেষ করে আমরা উঠে গেলাম।

রেজা ভাই আমার কামরায় এসে সোজা জুতোসহ আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, গত কয়েক রাত ঘুমোতে পারি নি, আমি এখানে ঘন্টাখানেক গড়িয়ে নিতে চাই কবি।

আমি বললাম, ঘুমোন।

ঠিক ঘুম নয়, একটু শুয়ে গড়িয়ে আপনার সাথে কথা বলব। আচ্ছা, আপনার আর নন্দিনীর ব্যাপারটা কী বলুন তো? নিছক বন্ধুত্ব?

না নিছক বন্ধুত্ব নয় রেজা ভাই। আমি নন্দিনীকে ভালবেসে ফেলেছি বলেই মনে হচ্ছে। সম্পর্কটা আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। এদিকে আমার স্ত্রী রয়েছে যিনি মুক্তিযোদ্ধা, মারাত্মক আহত হয়ে ঢাকায় পড়ে আছেন। তার প্রতিও রয়েছে আমার গভীর ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ ও প্রেম। এ রকম কেন হয় রেজা ভাই আমি জানি না। আমি নিজেও আমার এ ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করতে পারছি না। আপনারা, সমাজ, আমার আত্মীয়স্বজন কেউ আমার এই দ্বিমুখী প্রেমের কোনো স্বীকৃতি দেবেন না জানি, কিন্তু আমি কাউকেই নিজে থেকে পরিত্যাগ করতে পারব না। অদৃষ্টে আমার যাই ঘটুক।

আমি অত্যন্ত আগ্রহভরে জবাব দিলাম।

আমার কথা শুনে রেজা ভাই হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে গেলেন।

আপনি খুব জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলেছেন। এর পরিণাম কী হবে বলা খুব মুস্কিল।

আমি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নন্দিনীর সাথে আমার পরিচয়ের পূর্বাপর সব ঘটনা কমরেড রেজাকে বলে গেলাম। তিনি গম্ভীর হয়ে সব শুনে আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে ধরালেন।

আপনার সমস্যার কোনো সমাধান আমার জানা নেই। তবে এই মুহূর্তে আপনার যে কর্তব্য রয়েছে তা আপনার স্ত্রীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। এ ব্যাপারে আমি ও আমার সহকর্মীরা যে যেখানে আছেন সাহায্য করবেন। আপনার সব কথা শুনে আপনার স্ত্রীর প্রতি আমি এ ধরনের নৈতিক দায়িত্ব বোধ করছি। আপনার ভগ্নিপতি যদি আমাকে পলিটিক্যাল রিকগনাইজ করেন এবং ঢাকা পৌঁছুতে সাহায্য করেন তবে আপনাকে সাথে নিয়ে আমি ঢাকার পথে রওনা হতে পারি।

রিকগনাইজের প্রশ্ন আসে কেন?

আমি অবাক হলাম।

আসে। এই স্বাধীনতা লড়াইয়ের প্রকৃতি এবং আদর্শগত দিকগুলো নিয়ে আমাদের সাথে আওয়ামী লীগের গুরুতর মতো পার্থক্য রয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তকাল পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানের অস্তিত্ব, ছ'দফা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মতো পার্থক্য ছিল কম। কিন্তু এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা শেখ সাহেবের নেই। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে আটক আছেন। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা এখন কার হাতে তা আমাদের জানা নেই। আপনার ভগ্নিপতি আওয়ামী লীগের প্রবাসী সরকারেরই সচিব পদমর্যাদার ব্যক্তি। তিনি আমাকে পছন্দ নাও করতে পারেন।

বললেন রেজাভাই। তার চেহারায় রাজনৈতিক কূট আদর্শবাদের তীর্যক রেখা ফুটল। আমি বললাম, আপনি আমার ভগ্নিপতিকে জানলে একথা বলতেন না রেজাভাই। তিনি একজন নিষ্ঠাবান, সৎ সরকারি কর্মকর্তা, তার প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত থাকতে পারে না।

আমার কথায় হাসলেন কমরেড রেজা।

ইমাম সাহেবকে তার বর্তমান দায়িত্ব ও অতীত কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদিসহ আমরা বিচার- বিবেচনা করেছি কবি সাহেব। তা না হলে আহত নাসরিনকে আপনার সাথে তার সাহায্যের আশায় এখানে পাঠাতাম না। আমি পূর্বাপর অনেক বিবেচনা করেই এখানে, আপনার বোনের বাসায় এসেছি। ইমাম সাহেব রাজনৈতিকভাবে বিচার না করে মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলোকে একটু সহায়তার হাত

বাড়ালে আমরা অর্থাৎ আমি আমার ইউনিট নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারি। আপনি তো জানেন আমাদের কী মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এই যুদ্ধের মধ্যে আমার বিচ্ছিন্ন কমরেডদের পুনর্গঠনের একটু সুযোগ পেলে আমি কুষ্টিয়া জেলায় একাই পাক বাহিনীর দৌরাত্ম্য ঠেকিয়ে রাখতে পারব। সম্ভবত ইমাম সাহেবও তা জানেন। মেজর জলিল যেমন তার এলাকায় একটা মারাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তেমনি আমিও পারব। মেজর জলিলের সাথে যেমন আওয়ামী লীগের মৌলিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও সহযোগিতা ও সমর্থন বন্ধ নেই তেমনি আমরাও এটুকু সহযোগিতা চাই। আমরা জানি আপনার ভগ্নিপতিই এই যুদ্ধকালীন জরুরি সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করেছেন। আমি এসব বিষয় নিয়েই তার সাথে আলোচনা করতে এসেছি। শুধু নাসরিনকে দেখতেই আসি নি। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানে, আমি এখন এখানে আছি।

আমি অবাক হয়ে আলী রেজার মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি হেসে আমার প্যাকেট থেকে আরও একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে তার মুখটা আমার কানের কাছে এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বললেন, এমনকি এতক্ষণে সম্ভবত আপনার বোনজামাই মহোদয়ও জেনে গেছেন কুষ্টিয়ায় কমরেড রেজা এখন তার বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছে। এখানকার ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক খুব কড়া। তাছাড়া আমি বর্ডার ক্রশ করেই ভারতীয় কতৃপক্ষের কাছে আমার প্রেজেন্স রিপোর্ট করেছি। আপনি কবি মানুষ, দেশের ভেতরের এবং বাইরের রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর কিছুই জানেন না। আমি বাংলাদেশের ভেতর থেকে পাক বাহিনীর আক্রমণ অত্যাচারের মধ্যে যতটা নিরাপদ কলকাতায় ততটা নই কবি সাহেব।

আমি মুহূর্তের মধ্যে কমরেড রেজার রাজনৈতিক গুরুত্ব যেন উপলব্ধি করলাম।

আমি বললাম, রেজাভাই আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। আমি ও আমার বোন ইমাম সাহেবকে আপনার সহযোগিতার প্রস্তাবে সম্মত করাব। অন্তত আপ্রাণ চেষ্টা করব।

রেজাভাই আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে চোখ মুদে সিগ্রেট টানতে লাগলেন। আমি কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দুয়ারটা ভেজিয়ে দিলাম।

ঘন্টাখানেক পরে পারুল কিচেন থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে মিতুর ঘরে ঢুকল। আমি তখন ভাগ্নির সাথে তার স্কুল সম্বন্ধে এবং নতুন বান্ধবীদের সাথে মেলামেশার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ করছিলাম। পারুল বলল, আপনার অতিথি কমরেড রেজার সাথে ইমাম কথা বলতে চায়। অফিস থেকে টেলিফোন। ইমাম ধরে আছে।

আমি লাফ দিয়ে উঠলাম এবং রেজা ভাইয়ের তন্দ্রা ছুটিয়ে দিয়ে বললাম, আপনার টেলিফোন। ইমাম ধরে আছেন।

রেজাভাই হাসলেন, চলুন।

আমি তাকে পারুলদের বেডরুমে এনে টেবিলে রাখা রিসিভারটা দেখিয়ে দিলে তিনি রিসিভারে হাত রেখে বললেন, আপনি একটু বাইরে যান। আর দুয়ারটা ভেজিয়ে দিন।

আমি বাইরে এসে দুয়ার ভেজিয়ে দিলাম।

পনেরো মিনিট পর কমরেড রেজা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে আমাকে ও পারুলকে অপেক্ষমান দেখে বললেন, আপনারা রান্নাটা বোধ আর খাওয়া হয়ে উঠল না। ইমাম সাহেব আট নম্বর থিয়েটার রোডে এক্ষুনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তাজউদ্দিন সাহেব এই মুহূর্তে আমার সাথে কথা বলতে চাইছেন। আমি তাহলে আসি কবি সাহেব। আপনার বোনকে একটু অনুরোধ করছি নাসরিনের একটু খোঁজ খবর নিতে। আসি ধন্যবাদ।

আমি ও পারুল আমরা উভয়েই কমরেড রেজাকে অনুসরণ করে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন।

আমরা হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানালাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন মাত্র। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে আমরা যখন ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা দিতে যাব তখন কে যেন পারুলের নাম ধরে পেছনের রাস্তা থেকে ডাকল। আমরা ফিরে দেখি খাকি প্যান্টশার্ট পরা নন্দিনী অন্য একটা ট্যাক্সি থেকে নামছে। প্রথম দৃষ্টিতে নন্দিনীকে চেনার কথা নয়। শাড়ির বদলে প্যান্টশার্ট শুধু নয়। নন্দিনী তার দীর্ঘ বেণীর বদলে চুল কেটে বব করে এসেছে। শুধু তার হাসিটাই অপরিবর্তিত। এগিয়ে এসে পারুলের হাত ধরে বলল, কেমন আছ পারুল, ইমাম সাহেব, মিতু এরা কেমন?

আমরা সবাই ভালো দিদি। বরং আপনার খবর বলুন, ট্রেনিং কেমন লাগছে?

খুব কষ্টকর। মানুষ সেখানে খুব নোংরা, লোভী। ম্লান মুখে জবাব দিল নন্দিনী।

আমি তার হাত আমার হাতে তুলে নিয়ে বললাম, আর কুশল জানার দরকার নেই, চলো ওপরে যাই।

নন্দিনী ওপরে এসেই পারুলকে বলল, তোমার একটা শাড়ি দাও তো পারুল। এই জবড়জং পোশাকগুলো খুলে একটু হালকা হই।

পারুল বলল, আসুন আমার কামরায়। শাড়ি ব্লাউজ দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে গোসলও দিতে পারেন।

নন্দিনী খুশীতে লাফিয়ে উঠল, এ বাসায় বুঝি প্রচুর জল পাচ্ছ। দ্যাখো, যেখানে ছিলাম সেখানে লাইন বেঁধে জলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হত। আমি বরং আজ একটু প্রাণভরে গায়ে জল ঢেলেই আসি।

পারুল শাড়ি ব্লাউজ দেবার জন্য নন্দিনীকে তার কামরায় নিয়ে গেলে আমি এসে আমার বিছানায় বসলাম। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না ইমাম কমরেড রেজাকে কী বিষয় আলোচনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। তবে এটা বুঝলাম তাজউদ্দিনের সাথে আলাপের সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে রেজা ভাই খুশি মনেই বেরিয়ে গেছেন। ইমাম যদি দুপুরে খাওয়ার জন্যে বাসায় আসত তবে সবকিছুই জানা যেত। মনে হয় না ইমাম আজ লাঞ্চ খেতে বাসায় ফিরবে।

নন্দিনীর টয়লেট থেকে বেরুবার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমার চোখ দুটিতে তন্দ্রাভাব এসে যাওয়াতে আমি একটা বালিশ ঠেলে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলে দেখি নন্দিনী আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে আনন্দ বাজার পত্রিকা পড়ছে। সদ্য স্নান সেরে আসার পরিচ্ছন্নতা তার চোখেমুখে। সে পারুলের একটা লালপেড়ে গরদ ও লাল ব্লাউজ পরেছে। চমৎকার লাগছে নন্দিনীকে। তবে তার বিশাল বেণী না থাকায় বব করা চুল ফ্যানের বাতাসে মুখে এসে পড়ায় পোশাকের সাথে চেহারাকে খাপছাড়া লাগছে।

আমি বললাম, চুল কেটে ফেলাটা কী ট্রেনিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক?

না।

তবে এমন ন্যাড়া হওয়ার কী দরকার ছিল?

তখন যদি জানতাম আমার চুলগুলো তোমার চোখে খারাপ লাগত না তাহলে ন্যাড়া হতাম না।

কপালের ওপর থেকে একগুচ্ছ চুলকে আঙুল দিয়ে সরিয়ে জবাব দিল নন্দিনী।

আমি বললাম, ভালো লাগত কিনা জানি না। তবে লম্বা বেণীর বদলে তোমার বব দেখে মনে হচ্ছে বেণীঅলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই তোমাকে মানাত ভালো।

এখন একেবারেই ভালো লাগছে না বুঝি?

এত উপেক্ষা করার ক্ষমতা কী আমার আছে?

মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলিও না তো।

আনন্দ বাজার পত্রিকাটা পাশে সরিয়ে রেখে জবাব দিল নন্দিনী। আমি বিষয়টা অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার আশায় বললাম, আবার কখন বাদুড়িয়ায় ফিরে যাচ্ছ?

আর যাচ্ছি না।

নন্দিনীর কথায় আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?

আমি আর ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছি না কবি।

কেন? সব কথা আমাকে খুলে বলল নন্দিনী।

নিজেকে বাঁচিয়ে সেখানে অবস্থান করা অন্তত আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সেখানে ভালো লোক নেই একথা আমি বলছি না। তবে এমন লোকও আছে যারা মনে করে ওদের লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করাই হল মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধ।

বলো কী নন্দিনী?

সর্বত্র কী ঘটছে আমি জানি না। তবে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। এ যুদ্ধ আলী রেজাদের মতো দেশের ভেতর থেকে পরীক্ষিত লোকদের নিয়ে চালাতে হবে। ভারতের সাহায্যে নয়।

বলল নন্দিনী। বুঝলাম অল্পকালের মধ্যেই নন্দিনীর মনে নিদারুণ বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। এ সময় তাকে ঘাটানো উচিত হবে না ভেবে আমি অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইলাম। বললাম, ঢাকা থেকে খুব খারাপ খবর এসেছে। দুঃসংবাদ।

দারুণ ঔৎসুক্য নিয়ে নন্দিনী আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

আমার স্ত্রী গুরুতর আহত হয়ে ঢাকায় আটকা পড়েছে। সম্ভবত দুচার দিনের মধ্যে আমি ও রেজাভাই ঢাকা যাচ্ছি।

আমার মুখে হামিদার দুর্ঘটনার সংবাদ এমন আবেগহীনভাবে উচ্চারিত হতে শুনে নন্দিনী নিস্পলকভাবে আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, বৌদির কী হয়েছে?

একটা অপারেশনে গিয়ে মাইনের আঘাতে উরুর হাড় ভেঙে গেছে বলে খবর এসেছে। সে যেখানে আছে জায়গাটাও নিরাপদ নয় যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারে।

তোমরা কখন যাচ্ছ?

এখনও স্থির হয় নি। ইমাম যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করবেন। আজই হয়তো ব্যাপারটা জানা যাবে। রেজা ভাই থিয়েটার রোডে গেছেন। যদি ইমাম লাঞ্চের জন্য বাসায় আসেন সব জানা যাবে।

আমি যদি যেতে চাই?

তোমাকে নিয়ে রওনা হওয়াটা ঠিক হবে না।

কেন?

বোঝো না, ঢাকা পর্যন্ত এসময় পৌঁছাটা আমাদের পক্ষেই কতটা বিপজ্জনক? কমরেড রেজাই সম্ভবত রাজি হবেন না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রতিজ্ঞা যখন নিয়েছ তখন ট্রেনিং শেষ করা কর্তব্য। তোমার ক্যাম্প সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ আছে তা ইমামকে জানাও। তিনি সম্ভবত তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন।

আমি ইমাম সাহেবকে কিছু বলব না। আর ঐ নরকেও ফিরে যাব না। যদি কিছু বলতে হয় তবে দেশের সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা আলী রেজাকেই বলব। এখন চল নাসরিনকে দেখে আসি।

নন্দিনী চেয়ার ছেড়ে ওঠে দাঁড়ালে আমি বললাম, বস। নাসরিন ভালোই আছে। আমরা লাঞ্চের পর সকলেই ক্লিনিকে যাব।

নন্দিনী বলল।

এর মধ্যে একটা ট্রে হাতে করে নন্দিনীর জন্য কিছু খাবার ও দুকাপ চা নিয়ে পারুল এসে ঘরে ঢুকল।

আপনাদের দুকাপ চা দিতে এলাম। একটু আগে ইমাম আবার টেলিফোন করেছিল। সুখবর। কমরেড রেজার সাথে আমাদের সরকারের আলাপ হয়েছে। ইমাম একটা ফয়সালা করে দিয়েছেন। ইমাম বলল, রেজা সাহেব খুব খুশি। দুপুরে আমাদের সাথে খেতে আসছেন। যাই আমি গিয়ে রান্নাটা সেরে ফেলি।

পারুলও রেজার প্রতি তার গভীর সহানুভূতির ইঙ্গিত দিল এবং ট্রেটা নন্দিনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসল। নন্দিনী ট্রে বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে চা ঢালতে ঢালতে বলল, তুমি যাও আমিও তোমাকে একটু সাহায্য করতে আসছি।

কোনো দরকার নেই দিদি। আমি একাই সব পারব। আপনারা বরং যুদ্ধের গল্প করুন। গতরাতে ইমাম বলেছে আমাদের ছেলেরা ঢাকায় নাকি খুব চোরা মার লাগাচ্ছে। একদম ভয় খেয়ে গেছে সবাই।

পারুলের মুখে বিজয়ের হাসি দেখে আমার খুব ভালো লাগল।

বেলা আড়াইটার দিকে রেজাভাইসহ ইমাম এসে বাসায় ঢুকেই বলল, তাড়াতাড়ি খানা লাগাও। খুব খিদে পেয়েছে।

আমরা সবাই এসে নিঃশব্দে খাওয়ার টেবিলে বসলাম। আমি মিতু ও নন্দিনী একদিকে। অন্যদিকে রেজাভাই ও ইমাম। পারুলের চেয়ারটা খালি রইল কারণ সে সবাইকে পরিবেশন করে তবে বসবে। খেতে বসেই রেজাভাই বললেন, কবি সাহেব আমাকে সাপোর্ট দিতে তাজউদ্দিন সাহেব রাজি হয়েছেন। আমরা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হব।

আমি বুঝলাম খুব খুশির কথা রেজাভাই।

খুব বেশি খুশির কথা নয়। কারণ দেশের ভেতর এখন প্রতিরোধ যুদ্ধ মারাত্মকভাবে সাহস দেখাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের ঘাঁটি তৈরি হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় ভারতীয় বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধজয়ের কৃতিত্বটা মুক্তিযোদ্ধাদের দেবে বলে মনে হয় না। আমার সন্দেহ ডিসেম্বরেই তারা হস্তক্ষেপ করবে।

আমরা কোনো জবাব দিলাম না। আমি ভেবেছিলাম ইমাম এর প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সেও কোনো জবাব দিল না। শুধু নন্দিনী বলল, রেজাভাই আমি কী আপনাদের সাথে ঢাকা যেতে পারব?

আপনি যেতে চাইলে নিয়ে যাব। আমি ভেবেছিলাম নাসরিনের ভার আপনার হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে দেশের ভেতর ঢুকব। আপনি যে আর ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরবেন না তা আমি বাদুড়িয়ায় আপনার চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম। এসব নিয়ে দুঃখ করে, নালিশ করে কোনো লাভ নেই বোন। এটা হল একটা আনঅর্গানাইজড ওয়ারফেয়ার। এ সুযোগে অনেক বাজে লোক এখানে ঢুকে পড়েছে। এদের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়। এদের আচরণে বিরক্ত হয়ে পুরো আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধটাকেই অর্থহীন ভাববেন না।

বেশ ধীরে সুস্থে কথাগুলো বলে রেজাভাই লোকমা তুলল। ইমাম আমার দিকে ফিরে বলল, দিদিকে আপনাদের সাথে নিন ভাই। নাসরিন না হয় আমাদের সাথে থাকবে।

তাহলে তো আমি খুবই নিশ্চিন্ত হয়ে রওনা দিতে পারি।

বললেন আলী রেজা।

পারুল আমার পাতে কোর্মার ঝোল তুলে দিতে দিতে বলল, দিদির এখন, এই মুহূর্তে ঢাকায় যাওয়া কী ঠিক হবে? যেখানে ভাবিকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে আপনাদেরই মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হতে পারে?

তুমি আর না বল না পারুল। আমি আসলে বৌদির কাছেই যেতে চাইছি। আমি তার কাছে থাকব। তার সেবাযত্ন করব। আমাকে পেয়ে বৌদি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন। আমি না গেলে তার উদ্বেগ দূর হবে না। এটা আমি জানি।

বেশ দৃঢ়তার সাথে কথা বলছে নন্দিনী।

ইমাম বলল, মন্দ বলেন নি। আমি আপনাদের ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে দেয়ার মোটামুটি নিরাপদ একটা ব্যবস্থা নিতে পারি। কয়েকজন সশস্ত্র লোক আপনাদের সাথে দিতে পারি।

না, এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু করতে হবে না। বরং ভেতরে এখনও আমার কয়েকটা ঘাঁটি আছে। ঢাকা পর্যন্ত এদের নিয়ে যেতে আমার কোনো অসুবিধেই হবে না। আমরা এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে বিশ্রাম নিয়ে এগোব। ভাগ্য ভালো থাকলে যানবাহনও পেয়ে যেতে পারি।

ঢাকায় যাওয়ার ব্যাপারে ইমামের সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন আলী রেজা। সম্ভবত এর কোনো একটা রাজনৈতিক দিক থাকতে পারে ভেবে আমিও আর কথা বাড়ালাম না। শুধু মিতু ছেলে মানুষের মতো আমাকে জিজ্ঞেস করল, মামা, আমরা আর কতদিন পরে ঢাকায় ফিরতে পারব?

রেজাভাই হেসে বললেন, কেন মা কলকাতা তোমার ভালো লাগছে না?

না চাচা। একদম না।

তোমার মতো আমারও। সে জন্যেই তো একটু আগে চলে যেতে চাই। কিছুদিন অপেক্ষা কর, আব্বা আম্মাকে সাথে নিয়ে তুমিও চলে আসবে।

মিতুকে এমনভাবে আশ্বাস দিলেন রেজাভাই মনে হল তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত।

.

খাওয়ার পর বিশ্রাম না নিয়েই আমরা রোজ ক্লিনিকের দিকে রওনা হলাম। বাসায় থাকল ইমাম আর মিতু। ক্লিনিকে পৌঁছেই ডাঃ রায়ের ঘরে গেলে তিনি সাদরে আমাদের বসতে বলে বেল টিপলেন। একজন নার্স মুহূর্তের মধ্যে দরজায় এসে দাঁড়ালে তিনি বললেন, সাত নং কেবিনের রোগিনীর চার্টটা দেখে আসুন।

একটু আগে দেখেছি স্যার। চমৎকার রিকভারি। গত রাতে খুব ভাল ঘুম হয়েছে। দুস্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে নি। আমার তো মনে হয় দুদিন এভাবে গেলে রিলিজ করে দেয়া যাবে।

গুড। নাসরিনের গার্জিয়ানরা এসেছেন। এদের ওর কেবিনে নিয়ে যান।

খুশি হয়ে পারুলের দিকে তাকালেন ডাঃ অজয় রায়। আমি ও পারুল তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রেজা ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে ডাক্তার রায় নিজেই তার চেম্বার থেকে আমাদের কেবিনে নিয়ে চললেন। আমরা সাত নম্বরে পৌঁছে দেখি নাসরিন তার বেড ছেড়ে একটা চেয়ারে বসে বেডের ওপর পা মেলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাদের দিকে ফিরেই রেজাভাইকে দেখতে পেয়ে একলাফে তার গলা জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ফুঁপিয়ে উঠল যে- আমি, পারুল, ডাক্তার ও নার্স দৃশ্যটির মর্ম বুঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

রেজাভাই ভেজা গলায় বললেন, শান্ত হও মা। এদের ধন্যবাদ দাও। এবার এদের দয়ায় বেঁচে গেলে। ইনি কবি সাহেবের বোন পারুল আর ডাঃ অজয় রায়।

বেশ কিছুক্ষণ নাসরিন কমরেড রেজার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদল। একটু শান্ত হলে আমি বললাম, নাসরিন আমরা আবার দেশের ভেতরে যাচ্ছি। তুমি সুস্থ হলে আমার এই বোনটি এসে তোমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যাবে। রেজাভাই না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে কলকাতায় থাকতে হবে। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না এবং চিন্তারও কোনো কারণ নেই।

নাসরিন তখনও রেজাভাইয়ের হাত ধরেছিল। আমার কথায় একটু অবাক হয়ে বলল, আপনারা আমাকে এখানে রেখে কেন ভেতর যাবেন? আমি আপনাদের সাথে যেতে পারি না?

তোমার শরীর- স্বাস্থ্য ঠিক হতে আরও বেশ কতদিন লেগে যাবে। আমার ধারণা এই যুদ্ধ বড় জোর আর দিন বিশেক চলবে। আমার এখন ঢাকায় যাওয়া নানা কারণেই দরকার মা। জানতো আমাদের বহু মানুষ এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা শহীদ হয়েছে তাদের কথা

আমি বলছি না। যারা নানা জায়গায় বাংলাদেশের ভেতরে বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে তাদের রক্ষা করতে হবে। পার্টিকে আবার সংগঠিত করতে হবে। তুমি তো আমাদের সব ব্যাপারই জান নাসরিন। তুমি এখানে যাদের সাথে থাকবে তারা খুব ভালো মানুষ। তারা তোমাকে আমার মতোই দেখাশোনা করবে। তাছাড়া কবি সাহেবের স্ত্রী ঢাকার কাছে একটা অপারেশনে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ঢাকায় পড়ে আছেন। তার সেখানে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

আমার স্ত্রী মারাত্মক আহত হয়ে ঢাকায় পড়ে আছেন সম্ভবত রেজা ভাইয়ের একথাটা নাসরিন ঠিকমতো বুঝতে না পেরে নন্দিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে থাকল। সে জানতো নন্দিনীকে দর্শনার কাষ্টম কলোনীতে আমি আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম এবং এক বা একাধিক রাত আমরা একসাথে ছিলাম। নাসরিনের মনোভাব বুঝতে পেরে নন্দিনী এগিয়ে এসে তার হাত ধরে মুচকি হাসল, আমাকে ভুল বোঝে না যেন। এ যুদ্ধে জেতার জন্য তোমাকে, আমাকে সবাইকে নানা পরিচয়ে নানাভাবে থাকতে হয়েছে, হবে। এখন ওসব নিয়ে দুর্ভাবনার দরকার নেই। আমিও এদের সাথে ঢাকা যাচ্ছি। আবার আমাদের একদিন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হবে। তখন আমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলব।

নাসরিন আমার দিকে ফিরে একটু হাসার চেষ্টা করল। আমিও। রেজা ভাই নাসরিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার আব্বা আম্মার খবর নিতে পারি নি। তবে আমাদের লোক কোনো না কোনোভাবে তাদের একথা জানিয়ে দেবে তুমি বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে আমার সাথে কলকাতায় নিরপদেই আছ।

নাসরিন খুব বাধ্য মেয়ের মতো কমরেড রেজার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল। পারুল এগিয়ে গিয়ে নাসরিনের হাত হাতে তুলে নিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি সকাল সন্ধ্যায় তোমাকে দেখে যাব। রিলিজ হলে আমার কাছে নিয়ে যাব। কোনো টেনশনের মধ্যে থেক না।

না কিছু ভাবব না।

বেশ দৃঢ়তার সাথে বলল নাসরিন। বুঝলাম নাসরিন সবকিছু কাটিয়ে উঠে আবার দর্শনার কাষ্টম কলোনীতে প্রথম দেখা মেয়েটির মতোই সাহসী হয়ে উঠেছে। আমি ডাক্তার অজয় রায়ের দিকে ফিরে বললাম, আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন ডাক্তার। আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ডাক্তার হাসলেন, চলুন আমার কামরায় গিয়ে একটু চা খাবেন সবাই।

আমরা ক্লিনিক থেকে হেঁটে বাসায় ফেরার পথে কমরেড আলী রেজা পারুলকে বলল, আমি এখন আর বাসায় ফিরছি না। আজ রাতেও সম্ভবত ফেরা হবে না।

পারুল বলল, আমাদের বাসায় কিন্তু আপনার থাকার কোনো অসুবিধে হবে না রেজা ভাই।

আমি সেটা জানি বোন। তবে দেশের ভিতরে যাওয়ার আগে স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে একটু আলাপ করে যেতে চাই। আমার ধারণা এ যুদ্ধ আর বেশি দূর এগোবে না। এর আগেই, এই দুচার দিনের মধ্যেই মিসেস গান্ধী বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর চেয়েও মারাত্মক এক দখলদার বাহিনী নামিয়ে দেবে। আর তোমাদের যুদ্ধের ইতি এখানেই। তোমাদের বিজয় মিছিল যখন পথে বেরুবে তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে অন্য একটা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ফিরে যাবে। এটাই ঘটবে। তোমার কাছে অনুরোধ তুমি শুধু আমাদের নাসরিনটাকে একটু নিজের আশ্রয়ে রেখ।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, আপনার ধারণাতো ঠিক নাও হতে পারে রেজা ভাই। সারা পৃথিবী আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে। পাকিস্তানের বদলে ভারত দখলদার সাজবে বিশ্বের মানুষ তা মানবে না। আমরাও অস্ত্র ত্যাগ করব না।

এটা কবির মতো কথা বটে। দেখা যাক, আপনার ধারণাই সত্য হোক। তবে আমি তো কবি নই হাদী সাহেব। গত চৌদ্দ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদের সাথে লড়াই করে চলেছি। মুখ কোনটা মুখোশ কোনটা তা এখন ধরতে পারি। আচ্ছা আপনারা বাসায় যান। আমি অন্য পথে যাব।

আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে একটু সাবধান থাকবেন রেজা ভাই।

আমার কথায় রেজা ভাই একটু হাসলেন। তারপর সোজা আমরা যেদিক থেকে আসছিলাম আবার সেদিকেই দ্রুত হন হন করে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি, নন্দিনী ও পারুল কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

১১. রাতে খাওয়ার টেবিলে

রাতে খাওয়ার টেবিলে নন্দিনী ইমামকে হঠাৎ এক আচমকা প্রশ্ন করে বসল, আমাদের সমর্থনের অছিলায় ভারতীয় বাহিনী কী বাংলাদেশ দখল করবে?

ইমাম অনেকক্ষণ এ কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারপর খুব শান্ত গলায় বলল, আক্রমণ বা দখল নয়। সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে পারে। তাদের সাহায্যেই যখন আমরা পাক হানাদারদের সাথে লড়ছি।

দেশের ভেতরে এখন প্রতিটি গ্রামে গ্রামে লড়াই চলছে। খান সেনারা মার খেয়ে ক্যান্টনমেন্টগুলোর দিকে সরে যাচ্ছে। বলতে গেলে সারা গ্রামবাংলা এখন ফ্রি জোন। এ অবস্থায় ভারতীয় বাহিনীকে আপনারা আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?

আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটা ঠিক নয়। ভারত ভাবছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে এভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে গেলে তাদের আসামে মেঘালয়- এমন কী পশ্চিমবঙ্গেও এ যুদ্ধ ছড়িয়ে যাবে। পরিণামে ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে নকশালপন্থীরা প্রভাব বিস্তার করবে। আর পরাজিত পাকিস্তানীরা তাদের সমস্ত আর্মস এমনেশন তুলে দেবে নকশালদের হাতে। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিণত হবে পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নবাদীদের লড়াইয়ে। ভারত এটা হতে দেবে কেন?

ইমামের কথার জবাবে আমি বললাম, কিন্তু ভারত যদি বাংলাদেশে ঢুকে বেরুতে না চায়?

আমরা মনে করি ভারতের এখন সে পরিস্থিতি নেই। তারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধটার একটা সমাপ্তি চায়। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের ভেতরকার নিয়ন্ত্রণ এখন কারো হাতে নেই। তাদের হাতে অস্ত্র থাকতে ভারত তেমন ভুল করতে পারে না। ভারত চায় না বাংলাদেশের মাটিকে চীনপন্থীদের গেরিলা তৎপরতার উর্বর ক্ষেত্র বানাতে। শেখ সাহেব যদি পাকিস্তানের কারাগার থেকে জ্যান্ত ফিরতে না পারেন তবে এ যুদ্ধ, এ আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যাবে মাওলানা ভাসানীর হাতে। তখন ভারত যা আশংকা করছে তাই ঘটবে।

এবার নন্দিনীর দিকে হেসে মুখ তুলল ইমাম।

আমি বললাম, এ জন্যই কী মাওলানাকে নজরবন্দি রাখা হয়েছে?

এ বিসয়ে মন্তব্য করা আমার পক্ষে অনুচিত হবে।

বলেই ইমাম তার প্লেটের ভেতর পানি ঢেলে উঠে গেলেন।

খাওয়ার পর নন্দিনী মিতুর সাথে থাকবে বলে চলে গেলে আমি ডাইনিং টেবিল থেকে সোজা আমার কামরায় এসে শুয়ে পড়লাম। দরজা ভেজিয়ে দিলেও ছিটকিনি তুললাম না। কারণ আমি

জানতাম নন্দিনী মিতুকে ঘুম পাড়িয়ে আমার সাথে কথা বলতে আসবে। শুধু পারুলের সামনে চক্ষু লজ্জার খাতিরে সে মিতুর কামরায় গিয়ে শুয়েছে।

আমার একদম ঘুম পাচ্ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও চোখের পাতা এক করতে পারছিলাম না। চোখ বুজলেই হামিদার যন্ত্রণাকাতর মুখ ভেসে উঠছিল। অনেকক্ষণ নন্দিনীর জন্য অপেক্ষা করে আমি দুয়ার খুলে বাইরে এলাম। সারাটা ফ্ল্যাটে বাতি নিভানো। শুধু একটা টয়লেটের ভেতরে বাতি জ্বলছে। টয়লেটের ভেতর থেকে কে বেরুবে কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে আমি একটা থামের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই মুখে পানি ছিটিয়ে নন্দিনীকে বেরুতে দেখে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম নন্দিনী নিজের ইচ্ছেয় আমার কামরায় ঢুকে কিনা। কিন্তু আমার ধারণা সঠিক হয় না। নন্দিনী বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে বেসিনের ওপরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার শাড়ি ঠিক করে টাওয়েলে হাতমুখ মুছে মিতুর ঘরের দিকে হেঁটে যেতে লাগল। একেবারে মিতুর দরজার কাছে চলে গেলে আমি খুব আস্তে তার নাম ধরে ডাকলাম। নন্দিনী আমার দিকে না ফিরেই চুপচাপ দরজার কড়া ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘুম আসছে না। এসে একটু কথা বল নন্দিনী।

আমার কথায় নন্দিনী একটু নড়ছে না দেখে নিজেই এক পা এক পা করে কাছে এসে তার হাত ধরলাম।

তোমার কী হয়েছে নন্দিনী?

কই কিছু হয় নি তো।

হঠাৎ আমাকে এড়িয়ে চলছ বলে মনে হচ্ছে। আমার কোনো কথায় বা আচরণে কী তুমি দুঃখ পেয়েছে?

না কবি। তোমাকে এড়িয়ে চলার শক্তি আমার নেই। আমি চেষ্টা করছি সমাজের চোখে যা অপরাধ, পাপ সেটার হাত থেকে তোমার মতো সরল মানুষকে বাঁচাতে। তুমি আমার সহায় না হলে মনে হচ্ছে পারব না।

বলেই নন্দিনী দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠল।

আমি নন্দিনীর ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নাকে নিজের হৃদয়ের ভেতর উথলে ওঠার সংক্রাম অনুভব করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, কেঁদো না নন্দিনী। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সহায়তা করব। লোকেরা তোমাকে আমাকে জড়িয়ে নানা কথা রটনা করার সুযোগ পাবে আমি

সেটা কেন হতে দেব? আমার ঘরে যখন তখন আমি আর তোমাকে ডেকে নেব না। তুমি এখন মিতুর সাথে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি তোমাকে ডেকে সত্যি ভুল করেছি। আমাকে ছাড়, আমিও গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি।

আমার কথায় নন্দিনী আরও জোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বেশ বিলাপ করে কাঁদতে লাগল, আমি তোমাকে ভালবাসি কবি। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। এ জগতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

আমি দিশেহারার মতো নন্দিনীর রোদনরত কম্পিত দেহকে বুকের ওপর রেখে একবার পারুলের ঘরের দিকে তাকালাম। না, সেখানে কোনো আলো নেই। মিতুর ঘুমের মৃদু আওয়াজ পাচ্ছি ঘরের ভেতর থেকে। এ ঘরের ভিতরে বোধ হয় একটা ঢাকা দেয়া টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

আমি বললাম, আমাদের এভাবে কেউ দেখতে পাবে নন্দিনী।

আমার কথায় নন্দিনী কান্না থামাল। কিন্তু আমার গলা জড়িয়ে ধরে রাখা হাত দুটি সরাল না। আমিও তা জোর করে এখন সরিয়ে দিতে পারছি না। এক অদ্ভুত অনুভূতি এবং বিহ্বলতা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় এই বিব্রতকর চিন্তা আসতেই নন্দিনী আমার গলা থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে বলল, চল তোমার ঘরে গিয়ে একটুখন বসব।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে নন্দিনীর পেছন পেছন আমার ঘরে এসে ঢুকলাম। আমরা উভয়ে ঘরে ঢোকা মাত্রই নন্দিনী ফিরে দাঁড়িয়ে ঘরের দুয়ার বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। কামরায় ভেতরকার নিকষ অন্ধকারে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধের মতো আন্দাজে আমার বিছানাটা স্পর্শ করতে এগোলে নন্দিনীর গায়ে হাত ঠেকল। নন্দিনী আমার হাতটা ধরে টানল, আমার পাশে বস কবি।

আমি বললাম, বাতি নেভালে কেন?

আলোকে ভয় লাগে।

অথচ একটু আগেই তুমি পাপ পুণ্যের কথা, লোক নিন্দার কথা বলছিলে। সমাজের চোখে যেটা মন্দ সেটার হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে মিনতি করেছিলে। এখন হঠাৎ কী হল নন্দিনী?

কিছুই হয় নি। আমি সমাজকে লোকনিন্দাকে মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম।

না নন্দিনী। তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে। বরং আমিই ছিলাম লোভী। একটু আগে আমিই ভুলে গিয়েছিলাম আমি নিজের দেশ ছেড়ে কেন এখানে এসেছি। ভুলে গিয়েছিলাম আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মাত্র কয়েকদিন আগে শত্রুদের সাথে সামনাসামনি একটা মারাত্মক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছি। যেখানে কমরেড রেজার প্রাণপ্রিয় সহকর্মীরা ফ্রন্টাল ফাঁইটে বীরের মতো প্রাণ দিয়েছে। নাসরিনের মতো একটা কিশোরী মেয়ের ওপর এক রকম আমাদের নাকের ডগায় বলাৎকার হয়েছে। মেয়েটির মানসিক ভারসম্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হওয়ার তার চিকিৎসার জন্য আমি দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসেছি। এসেই শুনেছি আমার মুক্তিযোদ্ধা স্ত্রী একটা অপারেশনে গিয়ে পঙ্গু হয়ে বিনা চিকিৎসায় বিপদের মধ্যে পড়ে তড়পাচ্ছে। আমি তার সাহায্যের জন্য ঢাকায় যাচ্ছি। মুহূর্তের লোভে আমি সব ভুলে যাই নন্দিনী। বরং আজ একটু আগে তোমার সামান্য প্রত্যাখ্যানে আমি আমার আসল চেহারাটা উপলব্ধি করে খুব ভয় পেয়েছি। মনে হয়েছে তোমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েছি আমি। যারা তোমাকে ট্রেনিং ক্যাম্পে অপমানের চেষ্টা করেছিল আমি তাদের চেয়ে কোনো অংশেই ভালো নই। আমাকে তুমি ক্ষমা কর নন্দিনী। এখন থেকে তোমার মর্যাদার কথা আমি মুহূর্তের জন্যও ভুলব না। মুক্তিযুদ্ধে তুমি যেভাবে ফতুর হলে তা আমার চেয়ে কে বেশি জানে?

আমি অন্ধকারে নন্দিনীর হাত ধরে তার পাশে বসলাম।

ফতুর? বল ধর্ষিতা হয়েছি। বল নষ্ট হয়েছি। বল নষ্টা নারীকে শেষ পর্যন্ত সকলেই ভোগ করতে চায়; কেউ ভালবাসতে পারে না। সে কারো দয়িতা প্রেমিকা হয় না। তাকে নিয়ে কোনো কবিতা লেখা যায় না।

নন্দিনী...

আমাকে বলতে দাও। তুমি এখনও দ্বিধা ত্যাগ করতে পার নি। আমি জানি তোমার স্ত্রী আছে। আমি না দেখলেও জানি হামিদা বানু সুন্দরী এবং তোমার কাম্য নারী। তাছাড়া তিনি বীরনারী। স্বামী সংসারের চেয়ে দেশকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। একজন বিবাহিত ব্যক্তিকে অন্য নারীর ভালবাসাটা যে নীতিজ্ঞানহীন অপরাধ এটাও আমার অজানা নয় কিন্তু পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ আমাদের জন্য কোন্ কোন্ নীতিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ অবশিষ্ট রেখেছে তা কী আমাকে বলে দিতে পার? এই কয়দিন আগেও তুমি আমাকে বলেছ তুমি আমাকে ভালবাস। বল, বল নি?

কিন্তু আমাদের পরস্পরের ভালবাসা সামাজিক আপত্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে না, নন্দিনী এখনও তোমাকে অকপটে বলছি তোমাকে ভালবাসি। আমার অন্তর থেকে ভালবাসি। আমার এটুকুই অপরাধ, সমাজের কাছে, আত্মীয়স্বজনদের কাছে। আমার স্ত্রী আছে। তাকেও আমি ভালবাসি। গভীরভাবে ভালবাসি। অথচ এই দুটি ভালবাসাকে একসাথে মেলাবার আমাদের আধুনিক জীবনে কোনো যুক্তি নেই। আমি যত সমকালীন সাহিত্য কাব্য উপন্যাস পড়ি সেখানে

দুটি নারীকে একসাথে ভালবেসে একসাথে ঘর করার কোনো দৃষ্টান্ত পাই না। যেটুকু আছে তা ধর্মীয় দৃষ্টান্ত। সম্ভবত এ দৃষ্টান্ত তোমার তেমন ভালো লাগবে না নন্দিনী। কারণ তুমি মুসলমান নও। আমি তোমাকে তা হতেও বলতে পারি না। আর তুমি মুসলমান হলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এটাও ভাবা যায় না। হামিদাই বা তা মানবে কেন? আমার মনে হয় হামিদা নিজেকে বিনাশ করে ফেলতেও দ্বিধা করবে না। তবুও এ পরিস্থিতি মেনে নিতে রাজি হবে না।

কেন হবেন না, বৌদি কী মুসলমান নন?

মুসলমান। তবে আমরা সবাই কী পাশ্চাত্য মূল্যবোধের বাইরে যেতে পারি?

তোমাদের ধর্ম যদি আমার জন্যে একটু আশ্রয় রেখে থাকে তাহলে আমার মতো ভিখিরির প্রতি তার মমতা হতেও পারে? আগে থেকেই তুমি তো বলতে পার না কবি?

এমনভাবে নন্দিনী কথা বলল আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। আমি বললাম, নন্দিনী বাতিটা জ্বালিয়ে দিই?

থাক না। বললাম তো এখন আলোতে আমরা আমাদের দুজনকে খোলামেলা দেখতে পেলে কথা এগোবে না। আমি কিছু বিষয় নিয়ে তোমার সাথে একটু একান্তে আলাপ করতে চাই। কবি সত্যি কী তুমি আমাকে ভালবাস? না আমি নিরুপায় বলে আমার প্রতি করুণা করছ?

নন্দিনী!

থাক, বলতে হবে না। আমিই বলছি শোন। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। এই ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে আমার সামান্য রূপ, আমার নিরুপায় অবস্থা এবং একটা দীর্ঘ সময়ের মেলামেশা ও একই সাথে দুঃখ বরণের মধ্য দিয়ে। রূপকে সামান্য বললেও আমার রূপ অর্থাৎ দেহের মোহও প্রকৃতপক্ষে তোমার কবি মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার দেহটাকে পেতে চাও। এর ফলে তোমার সংসার এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে বলে মনে কর। প্রথম ভেবেছিলে যাই ঘটুক, আমাকে তোমার চাই। কিন্তু এখন, আমার সাময়িক অনুপস্থিতি, হামিদা বৌদির বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের সংকল্প সব ঘটনা তালগোল পাকিয়ে গেছে। এখন তুমি ভাবছ, হামিদাকে তুমি ত্যাগ করে আমাকে স্ত্রী রুপে গ্রহণ করতে পার না। কারণ তোমার বিবেক বলছে এ এক গুরুতর অন্যায়। ঠিক কিনা?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলাম।

আমার কথার জবাব দিতে চাও না?

তুমি তো বললে আমার কিছু বলতে হবে না। যা বলার তুমিই বলবে।

হাঁ। আমিই বলব।

বলে যাও আমি শুনছি।

শোনো। প্রেম বা পুরুষ সম্বন্ধে তোমার সাথে সাক্ষাতের আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারে আমার পরিবার পরিজন এবং আমি নিজে ছিলাম অত্যন্ত গোঁড়া। আমাদের গাঁয়ের মুসলমান প্রতিবেশীদের সাথে আমরা প্রকাশ্যে সম্প্রীতির ভাব দেখালেও মনে প্রাণে ঘৃণা করতাম। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের সম্প্রদায়ের সামান্যতম কোনো আনুগত্য বা ভালবাসা ছিল না। আমাদের আনুগত্য ছিল ভারতের প্রতি। সবদেশে সব সংখ্যালঘুদের মনোভাব একই রকম। আমরা সব সময় ভাবতাম একদিন না একদিন ভারত এসে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবে। আমার নিজের দেশটা একদিন ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। আমার সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দুদের সেই সময় পর্যন্ত শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এই প্রতীক্ষার মধ্যেই আওয়ামী লীগ ছ'দফার দাবি তুললে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি হিন্দুর হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। হিন্দু মাত্রই ছ'দফার সমর্থক ছিল। কিন্তু এ ধারণা কারুরই ছিল না পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বৃটিশ আমলের হিন্দু জমিদার শ্রেণীর দ্বারা নিষ্পেষিত হলেও শিক্ষাদীক্ষা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে আর সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এমন এক অদ্ভুত জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে যা পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বা আকাঙ্ক্ষার সাথে মেলে না। উনসত্তরের গণ আন্দোলনের সময়ই পূর্ব বাংলার ভারতমুখী সাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল হিন্দুরা বুঝতে পারে ছ'দফার আন্দোলনকারী জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা এমন এক আন্দোলনের সূচনা করতে যাচ্ছে যা পাঞ্জাবি ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা শোষণতন্ত্র এবং উর্দুভাষীদের প্রাধান্যকে খর্ব করবেই। আবার অন্যদিকে ভারতেও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ সময় আমি পত্রপত্রিকায় তোমার রচনার সাথে পরিচিত হই। তোমার কবিতা আমার হৃদয়মনকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে আমার মধ্যে মুসলমানদের প্রতি যে গোপন ঘৃণার ভাব ছিল তা দূর হতে থাকে। আমি সীমাদির স্বামীকে ঢাকা থেকে তোমার কবিতার বই কিনে আনতে পীড়াপীড়ি করতাম এবং নিজেও একটু আধটু লিখতে চেষ্টা করতাম। তুমিই ছিলে আমার প্রিয় কবি। বিশ্বাস কর, তোমাকে এক নজর না দেখেই আমি তোমার ভক্ত ও আবেগের বশীভূত হয়ে যাই। ভেব না দেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় এবং বিপদমুহূর্তে তোমার পরিচয় পেয়েই আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। তবে তোমার তখনকার সাহস এবং দুটি অসহায় নারীর প্রতি দয়া ও কর্তব্যবোধ দেখে তোমার কবিতার চেয়েও তোমাকে ভালবেসেছি বেশি।

কথাগুলো বলে নন্দিনী একটা বড় নিশ্বাস ফেলে অন্ধকারে চুপ করে গেল।

আর কিছু বলবে?

তোমাকে বিবাহিত জেনেও তোমাকে কামনা করতে বাঁধেনি। আমার সমস্ত দেহমন তখন তোমাকে সঁপে দিতে আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার স্ত্রীর ছবি আমি এ জনমের মতো তোমায় হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পারব। কিন্তু আমি জানতাম না হামিদা এমন শক্তিশালী মেয়ে যে স্বদেশের জন্য নিজের স্বামীকেও তুচ্ছজ্ঞান করে এত অসুবিধার মধ্যে যুদ্ধের শপথ নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। বৌদি আমার সমস্ত অহংকারকে তছনছ করে দেয় যেদিন আমি পারুল ও মিতুর কাছে হামিদার শারীরিক বর্ণনা শুনি এবং তার তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তের কান্নার কথা শুনি তখনই বুঝতে পারি আমার সাধ্য নয় এই নারীর কাম্য পুরুষকে শুধু ভালবাসার জোরে দখল করে নিতে পারব। যে মেয়ে কর্তব্য পালনের জন্য নিজের পুরুষকে হেলায় অন্য নারীর দ্বারা বেদখলের বিপদ জেনেও ফেলে চলে যেতে পারে তার মনে প্রেমের ওপর ভরসা আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমি সাময়িকভাবে আমার দেহের মোহে তোমাকে ভোলাতে পারলেও, এ মোহ ভেঙে যেতে বেশি দেরি হবে না। হামিদার মতো সাহসী মেয়েকে যে একদা ভালবেসেছে সে আজ না হোক কাল তার জন্য অনুতাপে এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হবেই এবং আমাকে ভাববে সমস্ত অনিষ্টের মূল।

অর্থাৎ আমি তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করব। এই তো?

ঠিক তাই। তুমি স্বীকার কর বা না কর ঠিক তাই।

এই জন্যই বোধহয় ইসলামের একাধিক বিবাহের সুযোগটা খুঁজছ এবং ধর্ম পরিবর্তন করতেও চাও?

হ্যাঁ, তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। তোমার ধর্মের একাধিক বিবাহের ব্যাকগ্রাউন্ড এখন আমি বুঝতে পারি। খুবই বাস্তবসম্মত এই উদার অনুমতি। এই সুযোগ নিতে পারলে আমি তোমার সাথে ব্যাভিচারের পাপ থেকে বেঁচে যাই। আর তোমার রক্ষিতা হয়েও থাকতে হয় না। আমাকে বাঁচাও কবি। আমাকে বাঁচাও কবি। যদি আমাকে মুহূর্তের জন্য একবার একটুও ভালোলেগে থাকে তবে তোমার ভালবাসার দোহাই, আমাকে বাঁচাও।

বলেই নন্দিনী আমাকে অন্ধকারে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আমি জানি না নন্দিনী। তবে আমার প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করব না। তোমাকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করব না আমি। আমি আমার স্ত্রীকেও জানি। সেও তোমার মর্যাদা রক্ষা করতে কোনো কসুর করবে না। এর জন্য অনিচ্ছায় কেন তোমাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে?

আমার কথায় হঠাৎ নন্দিনীর কান্না থেমে গেল। সে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে সুইচ হাতড়ে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, অনিচ্ছায় তোমাকে কে বলল? স্বেচ্ছায় আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।

স্বেচ্ছায় নয়, বল আমি মুসলমান বলেই তুমি মুসলমান হতে চাও। তুমি তো ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জান না। এ যুদ্ধের পর একথা যখন জানাজানি হবে তখন এর পরিণাম চিন্তা করেছ?

পরিণাম?

সকলেই বলবে কবি হাদী মীর মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা অসহায় হিন্দু মেয়েকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেছে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিরা আমার কবিখ্যাতিতে কালিমা লেপনের চেষ্টা করবে। সকলে মিলে আমার জীবন অসহনীয় করে তুলবে।

আমার কথায় নন্দিনী খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে আমাকে দেখল। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিল দেয়ালের দিকে। সেখানে একটা পটচিত্রে কালিঘাটের আঁকা স্বাস্থ্যবতী কোনো দেবী বা বাংলার চিরন্তন বঁধুর মুখ।

এতদিন কিন্তু এসব খ্যাতি অখ্যাতি বা পরিণাম চিন্তা তোমার মনে ঠাঁই পায় নি।

ঠাঁই পায় নি কারণ কোনো পুরুষই তোমার মতো রূপসী নারীকে হাতের কাছে পেলে পরিণাম ভেবে দেখবে না। আমিও তো পুরুষ নন্দিনী। আমারও তো বন্য কামনা বাসনা আছে?

আমি কী খুবই সুন্দরী কবি?

জানি না, আয়নার নিজেকে দেখ গিয়ে।

আমার কথায় আমরা উভয়েই হেসে ফেললাম।

অবস্থাটা একটু হালকা হলে বললাম, চল তোমাকে মিতুর ঘরে দিয়ে আসি। রাত তো অনেক হয়েছে। একটু না ঘুমালে তোমার শরীর খারাপ হবে।

যাবার আগে আর একটা কথা বলতে চাই।

কি কথা?

ট্রেনিং ক্যাম্পে না ফেরার প্রকৃত কারণটা তোমাকে খোলাখুলি বলা হয় নি।

তুমি বলতে চেয়েছিলে কিন্তু আমিই শুনতে চাই নি। শুনে কী হবে, সব জায়গাতেই কিছু নোংরা লোকজন থাকে যারা মানুষ নামের কলঙ্ক। তাবলে মুক্তিযুদ্ধটাই খারাপ একথা তোমার মুখে শুনতে আমার ভাল লাগবে না বলে শুনতে ইচ্ছে করে নি।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

নন্দিনী বলল, আমি শুধু মানুষের লোভের কথা তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম তুমি সেটুকু শোনারও আগ্রহ দেখাও নি। আমি সেসব অসুবিধেকে পরোয়া করি না। কিন্তু যেজন্য ট্রেনিং ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমার মন বিষিয়ে গেছে সেটা কোনো লোভী মানুষের নোংরামো নয়। সেটা একজন নির্দোষ নিরপরাধ মানুষের হত্যাকান্ড। যা আমার চোখের সামনে ঘটেছে। যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও প্রতিরোধ করতে পারি নি। আমার দিনের আহার ও রাতের ঘুম যে দৃশ্যটি কেড়ে নিয়েছে কবি। যে অসহায় মুখখানির নিরুপায় দৃষ্টি ও ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনার দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফিরছে। যার ফলে আমার মনে হাজার হাজার বাঙালি বীরের আত্মত্যাগের মহিমা, আমার বোনের মৃত্যু, আমার ভগ্নিপতির নিখোঁজ হওয়া, আমার সম্ভ্রম লুণ্ঠন ইত্যাদি যা কিছু আমরা বাংলাদেশের মুক্তির জন্য উৎসর্গ করেছি, সবকিছুর ওপরই কালি ঢেলে দিয়েছে। মনে হচ্ছে আমি কোথায়, কাদের সঙ্গে আছি? কেন আছি? প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ কোথায় চলছে? কারা সেই মুক্তিযোদ্ধা? আর সেই মুহূর্তে ভেসে উঠেছে কমরেড রেজার মুখ, তোমার আর নাসরিনের মুখ। সুযোগ পেয়েই সেই নরক ছেড়ে আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে এখানে, যেখানে ইমাম সাহেবের মতো উদারচেতা দাদা, পারুলের মতো বোন আর মিতুর মতো সুন্দর শিশুরা স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কাল গুনছে। কবি, এই যুদ্ধের খারাপ দিকগুলো তুমিও কম দেখ নি কিন্তু আমি যা দেখেছি তা যেন কোনো বাঙালি নারীর দেখার দুর্ভাগ্য না হয়। আমিও যোদ্ধা, হত্যার মন্ত্র আমিও নিয়েছি। হানাদার পশুদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ। কিন্তু যে আমাদের প্রতিজ্ঞার সাথে শত্রুতা সাধন করে নি কিংবা এই লড়াইয়ের তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নিরপরাধ, যে একটা মসজিদে ঈশ্বরের গুণগান করছে, এমন অবস্থায় তাকে ধরে এনে বিনা প্রমাণে যারা তাকে গুলী করে মারল, আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে চাই না কবি। আমি তাদের ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি...

উত্তেজনায় ও গভীর ঘৃণায় নন্দিনী আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তার এ কান্নায় বাধা না দিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। নন্দিনী এমনভাবে কাঁদছে আমার মনে হল তার ভিতরের কোনো রুদ্ধ কপাটের খিল যেন কে ভেঙে দিয়েছে। আমি তার প্রতি আর কোনো সান্ত্বনার শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। বলতে পারলাম না, নন্দিনী শান্ত হও, তোমার সব দুর্ভাগ্যের কথা আমাকে খুলে বল। আমি শুধু নিবিড়ভাবে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার অন্তরের কাতরতার ঢেউগুলো অনুভব করতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে নন্দিনী

এক সময় স্তব্ধ হয়ে এল। আমি একবার তার আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখা হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে বললাম, এস তোমাকে মিতুর খাটে রেখে আসি। তোমার একটু ঘুমের প্রয়োজন।

নন্দিনী যেন হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে, নিজেকে আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেই নির্মমতার ঘটনা তুমি শুনতে চাও না?

চাই। এখন একাকী এই ঘরে যে বিষয় বা ঘটনা তোমাকে এমন কাতর করেছে তা যদি বলতে থাক নন্দিনী তবে তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তোমার শরীর কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। এ অবস্থায় আমি তোমার বিবরণ শোনার কৌতূহল দেখাতে পারি না। কাল সকালে তুমি তোমার চাক্ষুস দেখার বিবরণ দিও পরিবারের সকলের সামনে। আমার বোন, ভাগ্নি ও ভগ্নিপতিকে। রেজাভাইও শুনবে। এরা সবই মুক্তিযোদ্ধা। সবাই শুনুক সে কাহিনী। তখন বলতে গিয়ে তুমি আর কাঁদবে না। তোমার মধ্যে তখন ক্রোধ জেগে উঠবে। পশুত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের ক্রোধ। কান্না নয় ঐ ক্রোধ আমি আগামীকাল তোমার মধ্যে দেখতে চাই। নন্দিনী আমি তোমাকে আরও নিবিড়ভাবে ভালবাসতে চাই।

আমার কথায় নন্দিনী আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি তাহলে মিতুর কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

বলল নন্দিনী। আমিও দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়ে বললাম, এস নন্দিনী।

.

আমার দুচোখে আর ঘুম নেই। নন্দিনী কী দেখে এমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তা ভাবতে লাগলাম। আমি চিন্তা করে পাচ্ছি না প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে? যদিও নন্দিনী তার বলার সময় ঘটনার একটা আতংকজনক ইঙ্গিত দিয়েছে। তবুও ঘটনার বৃত্তান্ত সে বলে নি। কে জানে আগামীকাল কী বর্ণনা তার মুখ থেকে শুনতে হবে? নিশ্চয়ই এমন কোনো ঘটনা যা নন্দিনীর মতো এক লাঞ্ছিত নারীকেও মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পের শপথ বাণীতে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। সে বিবরণ আমাকেও কী নন্দিনীর মতো দ্বিধান্বিত করে তুলবে? তাহলে সে বর্ণনা আমার না শোনাইতে উত্তম। অথচ আমি নন্দিনীকে একটু আগে কথা দিয়েছি আমরা একটি পরিবারের সবাই মিলে এবং কমরেড রেজাসহ এ কাহিনী শুনব। আমি বিছানায় এপাশ ওপাশ করেও চোখে ঘুম আনতে পারছি না। এর মধ্যে দুটি সিগ্রেট ফোকা হয়ে গেছে। ঘুম না পেলে সাধারণত আমি বিছানায় গড়াগড়ি যেতে পারি না। বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ি কিংবা রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে পায়চারী করি। কিছুই ভালো লাগছিল না। একবার ভাবলাম, নিচে নেমে গিয়ে দারোয়ানকে বলি গেট খুলে দিতে। একটু ঘুরে আসি কিংবা একটু এগিয়ে গিয়ে পার্কসার্কাসের কোনো রাতজাগা দোকান

থেকে সরভাসানো গাঢ় চা খেয়ে আসি। আমি জানি কলকাতার এদিককার মুসলমান পাড়াগুলোতে এমন অনেক চায়ের দোকান আছে যা সারারাত খোলা থাকে। হয়ত চা খেয়ে একটু পায়চারী করে এলে মনের ভার নেমে যাবে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়তেও পারি।

আমি বিছানা থেকে নেমে শার্ট প্যান্ট পরে নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। বারান্দায় এসেই মনে হল একটু শীত লাগছে। আমার ঘড়িতে এখন রাত দেড়টা। রাত বারটার পর থেকে শুরু হয়েছে ডিসেম্বরের এক তারিখ। শীতের আমেজটা বুঝলাম। শীত আসছে অথচ আমার বা নন্দিনীর শীতের কোনো কাপড় কেনা হয় নি। সিঁড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই কে যেন পেছন থেকে ডাকল।

কবি ভাই কী নিচে যাচ্ছেন?

আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ইমাম তার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার পেসে এসে দাঁড়িয়েছে।

আপনি এখনও জেগে আছেন?

ঘুম পাচ্ছিল না। দেখলাম আপনি ঘর থেকে বেরুলেন।

আমারও ঘুম পাচ্ছে না। নিচে রাস্তায় পায়চারী করতে যাচ্ছি।

আপনার আপত্তি না থাকলে আমাকেও নিন না।

চলুন।

দাঁড়ান, আপনার জন্য একটা কোট এনে দিই।

বলে ইমাম ঘরের ভেতর চলে গেল। আমি সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই সোনালি বোতামঅলা একটা নীল ব্লেজার এনে আমার হাতে দিল।

নিন আপনার শীতকালটা এটা দিয়ে পার করে দিতে পারবেন। আমি মাত্র একটা শীতে পরেছিলাম। নতুনই আছে।

আমি ব্লেজারটা গায়ে দিয়ে বললাম, একেই বলে রাজার কপাল।

ইমাম বলল। সেও একটা কাশ্মীরি শাল গায়ে চাপিয়েছে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

.

আমরা রাস্তায় খানিকক্ষণ পায়চারী করে একটা গলির ভেতরকার চায়ের দোকানে এসে ঢুকলাম। কাউন্টার পার হয়ে টেবিলে বসা মাত্রই তিনজন সঙ্গীসহ রেজাভাই এসে দোকানে ঢুকলেন। কাকতালীয় যোগাযোগ। আমি হাত তুলে রেজাভাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করতেই তার সাথের তিন সঙ্গী হকচকিয়ে আমার দিকে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে দেখেই রেজাভাইকে আড়াল করে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের ডান হাত পকেটে ঢোকান। এ অবস্থায় আমিও হতভম্ব হয়ে গেলাম। ততক্ষণে রেজাভাই ব্যাপারটা আন্দাজ করে সঙ্গের লোকদের হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন, আরে এতরাতে আপনারা এখানে কী করছেন?

ইমাম হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঘুম আসছিল না বলে রাস্তায় আমরা একটু পায়চারী করব বলে বেরিয়েছি। আর কবি ভাইয়ের সরে ভাসা চা পছন্দ।

ইমামের কথায় দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পকেট থেকে হাত বের করে একটু শিথিল ভঙ্গিতে একটা টেবিল দখল করে বসে পড়ল। কমরেড রেজাও ইমামের সাথে হ্যান্ডসেক করে আমাদের টেবিলে এসে বসলেন।

এরা তিনজন আমার লোক। মুক্তিযোদ্ধা।

খুব অনুচ্চকণ্ঠে রেজাভাই কথা বলছেন।

আপনার কলকাতার কাজ সম্ভবত শেষ। এবার ভেতরে যাওয়ার ব্যাপারে কী ভাবছেন?

আগামীকাল সন্ধ্যায় কলকাতা ছেড়ে যাব। আমি জানি এখানে ভারত সরকারের কাছে আপনি আমার জিম্মাদার। আপনার আর তাজউদ্দিন সাহেবের জন্যই এখানে আমার ওপর কেউ আপাতত নজর রাখছে না। আমিও এখানকার বন্ধুদেরকে আপনার সহযোগিতার কথা জানিয়েছি। তাদেরও ধারণা আগামী দুসপ্তাহের মধ্যেই ভারত আমাদের দেশের ভেতর হস্তক্ষেপ করবে।

ফিস ফিস করে, ইমামের কানের কাছে মুখ নামিয়ে রেজাভাই কথাগুলো শেষ করলেন। ইমাম আর কিছু বলল না। চায়ের দোকানের বয়টা আমাদের সামনে সরেভাসা চায়ের কাপগুলো নামিয়ে রাখল। এখন একজন শিখ ভদ্রলোক ছাড়া দোকানে অন্য কোনো খদ্দের নেই। লোকটা সম্ভবত ট্যাক্সি ড্রাইভার। গলিতে ঢোকার সময় আমরা গলির মুখে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইমাম বলল, কাল সন্ধ্যায় রওনা দেবেন তো এখন এত রাতে সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে পথে পথে ঘোরা কী নিরাপদ?

আমি জরুরি কাজে অর্থাৎ আমার এই কমরেডের বিভিন্ন এলাকা থেকে তুলে আনতে কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল। ভেবেছিলাম সামান্য কিছু খেয়ে আপনার বাসায় গিয়ে আপনাকে জাগাব। আমরা চারজনই অভুক্ত।

আমি বললাম, তাহলে চলুন রেজাভাই বাসায় গিয়ে আমার বোনকে জাগিয়ে কিছু একটু মুখে দেবেন। এখানে তাহলে আর কিছু খাওয়ার দরকার নেই।

এতরাতে তাকে জাগালেই যে খাবার পাওয়া যাবে সেটা কী করে বলা যায়? তিনি তো আর আমাদের জন্য রেঁধে রেখে ঘুমান নি? তারচেয়ে বরং এখানেই চা- বিস্কুট একটু বেশি করে খেয়ে যাই।

দরকার নেই, চলুন বাসায় গিয়ে সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আপনারা রাতে কিছু খান নি, তাহলে তো এতক্ষণ খুবই কষ্ট পেয়েছেন। চলুন।

বলে ইমাম কাউন্টারের দিকে চায়ের দাম মিটাতে গেলে আমি রেজাভাইকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং পাশের টেবিলে চা পানরত রেজাভাইয়ের সঙ্গীদেরও ইঙ্গিত করলাম। আমার ইঙ্গিতে সঙ্গী তিনজন চা শেষ না করেই কাপ টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। তিনজনই যুবক এবং দেখতে ফর্সা এবং সুদর্শন। তারা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আমাদের টেবিলের পাশ কাটিয়ে কাউন্টার পার হয়ে বেরিয়ে গেলে আমি ও রেজাভাই তাদের অনুসরণ করলাম। ইমামও চায়ের দাম মিটিয়ে আমাদের পেছনে আসতে লাগল।

আমরা রাস্তায় নেমে দেখলাম রেজাভাইয়ের লোকেরা আমাদের থেকে পঁচিশ গজের ব্যবধান রেখে সামনে এগোচ্ছে। রেজাভাই হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে আমার হাতটা, ধরলেন, আমার সঙ্গীদের একজনকে তো আপনার চেনার কথা? এদের তিনজনই আসাম থেকে এখানে এসেছে। এরা তোরা বর্ডার দিয়ে আসামে প্রবেশ করেছিল। একজন টাকার স্যুটকেসটা আপনার সঙ্গিনীকে দিয়েছিল। এখন চিনতে পারছেন? ওই যে মাঝের জন। নাম ক্যাপটেন গজনফর। ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিল।

আমি পেছন থেকে মাঝের ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। এখন ঠিক চেনা যাচ্ছে না। তিনজনই সাফারীর মতো সাদা প্যান্টশার্ট পরা। তিনজনই বেশ লম্বাচওড়া। হাঁটছেনও সামরিক কেতায়। আমি বললাম, বাসায় গিয়ে পরিচয় হবে।

গজনফর আপনাকে দেখেই সম্ভবত চিনেছে। একটু আগে তার হাসি থেকে কিছু বুঝতে পারেন নি? স্যুটকেস এবং টাকা যে আপনারা পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের ঠিকানায় জীবন বাজি রেখে একথা আমি গজনফরকে জানিয়েছি। সে আপনার এবং আপনার বান্ধবীর সততায় অতিশয় মুগ্ধ।

তাকে তো আটক করা হয়েছিল ছাড়া পেলেন কী করে?

তাজউদ্দিন সাহেবকে তার আটকের কথা আমি বলেছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম এ ব্যাপারে সাহায্য করতে। তিনি আমার অনুরোধের খুবই মূল্য দিয়েছেন।

জানালেন রেজাভাই। আমরা হাঁটতে হাঁটতে পার্ক সার্কাসের মাঝামাঝি আমাদের বাসার গেটে এসে দাঁড়াতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। ওপরে এসে দেখি পারুলের ঘরে বাতি জ্বলছে। বারান্দায় আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েই পারুল দরজায় এসে মুখ বাড়াল, কী ব্যাপার তোমরা এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে?

ইমাম বলল, একটু পায়চারী করছিলাম রাস্তায়। বাইরে রেজা সাহেবের সাথে দেখা। এরা রেজা সাহেবের সঙ্গী। আমাদের বাসার উদ্দেশ্যেই আসছিলেন। এদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। আছে কিছু?

পারুল একটু বিব্রত হয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, সামান্য কিছু ভাত আর মুরগীর সুরুয়া গরম করে দিতে পারি।

চমৎকার, তাই দিন।

হেসে বললেন রেজাভাই।

ইমাম জিজ্ঞেস করল, ভাত কম থাকলে তোমার ভাঁড়ারে পাউরুটি পাওয়া যাবে না?

সকালের নাস্তার জন্য রাখা আস্ত দুটি পাউরুটি বের করে দিতে পারি।

তাই দাও। জলদি।

ইমামের কথায় পারুল রান্নাঘরের দিকে যেতে উদ্যত হলে আমি বললাম, আমি নন্দিনীকে জাগিয়ে দেব?

এত রাতে তাকে জাগিয়ে কষ্ট দেয়ার কী দরকার? আমিই খাবার এনে দিচ্ছি। আপনারা বরং খাবার টেবিলে একটু অপেক্ষা করুন।

.

আমরা সবাই টেবিলে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই মুরগীর গরম ঝোল, দুটি আস্ত পাউরুটি এবং একপ্লেট ভাত এনে পারুল রেজাভাইয়ের সামনে রাখল। আমি ও ইমাম ছাড়া বাকি চারজনই গোগ্রাসে খেতে লাগল। ইমাম বলল, খাওয়ার পর আপনাদের দুজনকে ড্রয়িংরুমে সোফায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে হবে। আর বাকি দুজন শোবেন কবি ভাইয়ের খাটে। একটু কষ্ট হবে।

রেজাভাই খেতে খেতে বললেন, কষ্টের কথা কেন বলছেন? আজরাতে দারুণ ঘুম হবে। এটাই সম্ভবত কলকাতায় আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ শেষরাত। আপনি নিশ্চিন্তে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

.

স্বভাবতই পরদিন দেরি করে ঘুম ভাঙল আমার। পারুলের ডাকে চোখ মেলে সোজা বিছানায় উঠে বসে গেলাম, এখন কটা বাজে?

নটা। আপনার বন্ধুরা সবাই নাস্তা সেরে ড্রয়িংরুমে জমায়েত হয়েছে। দিদিও আছেন। ক্যাপ্টেন গজনফরের সাথে কথা বলছেন। সেই যে যার টাকার ব্যাগ দিদি নিয়ে এসেছিলেন?

হেসে বলল পারুল।

আমি বললাম, আমাকে জাগাস নি কেন?

ইমাম বলল আপনি ক্লান্ত, আজই বিকেলে ঢাকার দিকে রওনা হবেন। একটু বেশি ঘুমিয়ে নিলে শরীর ঠিক থাকবে তাই ডাকি নি।

আমি বললাম, ঠিকই আছে। আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি, তুই টেবিলে নাস্তা লাগা।

ডাইনিং টেবিলে বসে খাওয়ার সময় নন্দিনী ক্যাপ্টেন গজনফরকে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, চিনতে পারছ?

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, রেজাভাইয়ের কাছে পরিচয় জেনেছি।

ক্যাপ্টেন গজনফর আমার পাশে এসে বসতে বসতে বললেন, আপনাদের কাছে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব? যে অবস্থায় আপনারা স্যুটকেসটা আমাদের লোকদের কাছে এনে পৌঁছে দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য। শুধু এটুকু বলতে পারি আপনাদের মতো লোক থাকলে দেশ দুর্ভোগ কাটিয়ে উঠবে। আপনাদের সাথে আমিও ঢাকায় যাচ্ছি। এখন থেকে সব সময় যোগাযোগ থাকবে।

.

খাওয়ার পর আমরা সবাই পারুলদের ড্রইংরুমে এসে বসলাম। রেজাভাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমরা বর্ডার ক্রশ করব। কলকাতা ছাড়তে হবে বেলা দুটোয়। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। কেউ কোনো ভারি জিনিসপত্র এমন কী একাধিক কাপড়চোপড়ও সঙ্গে নেবেন না। যতটা দ্রুত সম্ভব আমরা ঢাকায় গিয়ে পৌঁছতে চাই। যদিও জানি আমাদের ঢাকার ঢুকবার আগেই ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের বর্ডার ক্রশ করবে।

.

১২.

আঠারোই ডিসেম্বর মধ্যরাতে রেজাভাই আমাদের নিয়ে সদরঘাটে নৌকা থেকে নামলেন। যেভাবে আমাদের আসার কথা ছিল বলাবাহুল্য আমরা সেভাবে আসতে পারি নি। সেভাবে এলে আমরা ঢাকা এসে পৌঁছুতাম ষোল ডিসেম্বর নিয়াজির সারেন্ডারের এক সপ্তাহ আগে। নানা প্রতিকূল অবস্থায় এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে রেজাভাইয়ের নিজস্ব রাজনৈতিক যোগাযোগের সূত্র ধরে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমাদের পাশ কাটিয়ে উল্লসিত মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় বাহিনীকে পথ দেখিয়ে ঢাকার পথে নিয়ে গেছে। গুলীর শব্দে সারা বাংলাদেশের পল্লী এলাকাকে প্রকম্পিত করে যাওয়ার বিজয়োল্লাস আমরা চোখে না দেখলেও কানে শুনতে পেয়েছি। এই উল্লাস ধ্বনিতে নন্দিনী একবার লাফিয়ে উঠে রেজা ভাইয়ের হাত চেপে ধরেছিল, আমরা কি, রেজাভাই, এদের সাথে হেঁটে হেঁটেই ঢাকায় চলে যেতে পারি না?

রেজাভাই গম্ভীর মুখে হেসেছেন, পারতাম যদি আপনি আমাদের সাথে না থাকতেন। এখনকার সময়টার কথা বিবেচনা করতে হবে। এখনকার এই গ্রুপগুলো যারা ঢাকার দিকে এগোচ্ছে তারা একদিকে যেমন প্রতিহিংসা পরায়ণ তেমনি অনেক প্রিয়জনকে হারিয়ে ক্ষিপ্ত। যদিও হানাদাররা ষোল ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করেছে এবং ইন্ডিয়ান আর্মি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রক্তপাত বন্ধের। তবুও যুদ্ধ পরবর্তী বিশৃঙ্খলা ও হিংস্রতা দমনের ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে বলে মনে হয় না। সামাজিক অরাজক অবস্থা কতদিন চলবে তা এখনই আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় একটু ঘুরপথে পাড়াগাঁর নদীনালা ধরে আমরা এগোব। সদর রাস্তা ধরে যেতে চাইলে আমরা আরিচা

দিয়েই যেতে পারতাম। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করেছি আমরা নদীপথ ধরে একটু সময়ক্ষেপণ করে সদরঘাট গিয়ে নামব। এ ব্যাপারে আপনার কী কিছু বলার আছে কবি ভাই!

না রেজা ভাই। আমি আপনার ধীরে এগোনোর কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি। নন্দিনী একটু অস্থির হয়ে পড়েছে বটে। তবে বিলম্বে ঢাকার প্রবেশের ফল আখেরে আমাদের জন্য ভালোই হবে।

বলেছিলাম আমি। আমার কথার ওপর নন্দিনী হঠাৎ কথা চালিয়ে বলে উঠেছিল, আমি জানি না লাখ লাখ দেশত্যাগী নরনারী আর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যে এই মুহূর্তে নিজেদের বাড়িঘর এবং আত্মীয়দের মধ্যে পৌঁছুতে চায় না। আমার অবশ্যি আত্মীয় বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই। ঢাকা আমার দৈনন্দিন থাকারও জায়গা নয়। আমি এই মুহূর্তে ঢাকায় থাকতে চেয়েছিলাম কেবল একজনের জন্য। তিনি হামিদা বৌদি। জানি না বেচারা এখন কোথায় কী অবস্থায় আছেন।

নন্দিনীর মুখে হামিদার নাম শুনে সহসা আমার বুকটা কেমন যেন ধক করে উঠেছিল। সত্যি তো হামিদা এখন কোথায়? ষোল ডিসেম্বরের পর নিশ্চয়ই সে এখন আর আত্মগোপন করে নেই। হামিদা আহত মুক্তিযোদ্ধা, নিশ্চয়ই কেউ তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। হয়তো এখন সে হাসপাতালের সীটে শুয়ে আমার কথাই ভাবছে। আমার কথাই ভাবছে কি? হামিদা তার সাথে শেষ সাক্ষাতের সময় বলেছিল তাকে পরিত্যাগের আগে আমি ও নন্দিনী যেন অন্তত কয়েকটা দিন অপেক্ষা করি। কারণ তারও আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। হঠাৎ সে কোথায় গিয়ে উঠবে?

হামিদার এই সোজা সরল অভিব্যক্তিতে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হামিদা কত সহজেই আমার আর নন্দিনীর সম্পর্কটিকে মেনে নিয়েছিল। আমি হামিদাকে বহুদিন থেকে জানি। আমার স্ত্রী বলেই যে তাকে জানতাম এমন নয়। বিয়ের আগে থেকেই জানতাম। আবেগ ও বাস্তববুদ্ধির এমন একটি মেয়েমহিমা আমার পরিচিত বৃত্তের মধ্যে ছিল না বলেই হামিদাকে আমার চোখে পড়েছিল। আর হামিদা আমার দৃষ্টিতে চিরকালই ছিল এক আকর্ষণীয় সুশ্রী মেয়ে। হামিদাকে যে আমি কতটা ভালবাসি তা আর তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কোনো উপায় না থাকলেও আমার বর্তমানকালের বিপর্যয়কর সম্পর্ককেও আমি অস্বীকার করতে পারি না এবং পারছি না। আমার অপরাধ কী এই, আমি দুটি মেয়েকেই ভালবাসি?

নন্দিনীর কথায় রেজাভাইও কেমন যেন একটু বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রেজাভাই আমার দিকে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, আমার ধারণা আপনার স্ত্রী ষোল ডিসেম্বরের পর আপনাদের সাবেক বাসাতেই ফিরে এসেছেন। এখন তো আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন দেখি না। যদি তার শারীরিক অবস্থা একেবারেই সটান শুয়ে থাকার মতো না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বাসায় গিয়েই পাবেন। আর যদি শরীরের নিম্নাংশ পঙ্গু

হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে সম্ভবত হাসপাতালগুলোর কোনো একটায় পাওয়া যাবে। আমি শুধু এটুকুই আন্দাজ করতে পারি তিনি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর বিপদমুক্ত পরিবেশেই কোথাও অবস্থান করছেন। এ নিয়ে আপনি আর টেনশনে থাকবেন না। আর আমি তো কলকাতা ছাড়ার আগেই আমার পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল মেডিক্যাল প্রফেসনের লোকদের এবং ছাত্রদের ইন্সট্রাকশন পাঠিয়েছিলাম আপনার স্ত্রীকে খুঁজে বের করে চিকিৎসা করতে। আপনার দেয়া ঠিকানাও তাদের পাঠানো হয়েছিল। যদি সত্যি তারা তাকে পেয়ে থাকেন তবে জানবেন আপনার স্ত্রী যেখানেই থাকুন অযত্নে নেই।

আমি ও নন্দিনী পরস্পরের দিকে তাকালাম। কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না।

.

সদরঘাটে নেমে রেজাভাই বিশাল গয়না নৌকার মতো ডিঙ্গিনাওয়ের মাঝিদের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ডাঙায় উঠলেন। তার অন্যান্য কমরেডের সাথে আমি আর নন্দিনীও বাকল্যান্ড রোডের ওপর উঠে এলাম। আমি বহুক্ষণ ধরে সিগ্রেটের অভাবে কষ্ট পাচ্ছিলাম। সদরঘাট এসেই মনে হল এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনি। কিন্তু সমস্ত এলাকাটাই কেমন যেন অন্ধকার। এর মধ্যে ইসলামপুর কিংবা ওয়াইজঘাট রোড থেকে ক্রমাগত আকাশের দিকে গুলী ছুঁড়ে আনন্দ করার মতো শব্দ এবং হইহল্লা ভেসে আসছিল।

আমি বললাম, রেজাভাই একটা সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছে। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ধূমপান করি নি। আপনার কাছেও সিগ্রেট ছিল না। আমার কাছেও। এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনব তেমন দোকান দূরে থাক সারা সদরঘাটে রাত সাড়ে বারোটায় একটা বাতিও জ্বলছে না এটা কেমন কথা?

এই অবস্থা থেকেই ঢাকার পরিবেশটা আন্দাজ করে নিতে হবে। সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। এখন সিগ্রেটের চেয়ে যে জিনিসটা আমাদের বেশি দরকার তা হল কিছু খাবারের। আজ দুপুর থেকে নদীতে উপোষ দিয়ে চলতে হয়েছে। ভেবেছিলাম সদরঘাট নেমে হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে শহরের দিকে যাব। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন শহরের অবস্থা স্বাভাবিক নয়। মনে হচ্ছে হেঁটেই যার যার গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে। এখন বলুন আপনি কী এ রাতেই আপনার বাসায় যেতে চান?

প্রশ্ন করলেন রেজাভাই।

আমি বললাম, শহরের এ অবস্থায় নন্দিনীসহ হেঁটে হেঁটে শাজাহানপুর যাওয়ার ভরসা পাচ্ছি না রেজাভাই। যেরকম বেপরোয়া গুলীর শব্দ হচ্ছে তাতে নিরাপদে পথচলা বোধহয় সম্ভব হবে না।

তার চেয়ে আজ রাতটা আপনারা যেখানে যাবেন কিংবা থাকবেন আমাদেরও সেখানেই নিয়ে চলুন।

আমরা আপনার বাড়ির কাছেই আমাদের এক শেল্টারে যাব। খিলগাঁও বাগিচায়। চলুন আপনাদের রাসায় পৌঁছে দিয়েও যেতে পারব। তবে সারাটা পথ কিন্তু হেঁটেই যেতে হবে।

বলেই আমাদের তার সাথে চলার ইঙ্গিত করে রেজাভাই হাঁটা শুরু করলেন। আমিও নন্দিনীর হাত ধরে জমাট বাঁধা কালিমার মতো ঢাকা শহরের অন্ধকার উদরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম।

.

আমরা রাত আড়াইটার দিকে শাজাহানপুর আমার বাসার সামনে এসে দাঁড়ালাম। একতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে ঝিল পর্যন্ত লম্বা দালান। দালানটার শেষ দিকের তিনটে কামরা নিয়ে আমি ও হামিদা থাকতাম। আমাদের বাঁদিকে খাদেম সাহেব বলে একজন শ্রমিক নেতা সপরিবারে দুটি কামরা নিয়ে থাকতেন। প্রায় ন'দশমাস পর নিজের বাসার সামনে এসে মনটা কেমন যেন করতে লাগল। মনে হল একটা অজানা ভয়ে হৃদয় কাঁপছে। হৃদপিন্ডের দুলুনিতে শরীরটাও কাঁপছে। নন্দিনী বোধহয় আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করে আস্তে ফিসফিস করে বলল, এ বাসায় তো কেউ আছেন বলে মনে হচ্ছে না কবি। আমি কড়া নাড়ব?

রেজাভাই বললেন, আপনারা দাঁড়ান। আমিই ডাকছি।

আমার নড়ার সাহস হল না। রেজাভাই বারান্দায় উঠলেন।

অন্ধকারে দরজার কড়ায় হাত দিয়েই বললেন, ভেতরে লোকজন আছে মনে হচ্ছে।

রেজাভাই কড়া নাড়লেন।

কেউ আছেন বাড়িতে?

ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

রেজাভাই আবার কড়া নেড়ে বললেন, দরজা খুলুন হামিদা বোন। আপনার কবি এসেছেন।

রেজা ভাইয়ের আপনার কবি এসেছেন শব্দটি শুনেই নন্দিনী এতক্ষণ ধরে থাকা আমার হাতটি তার মুঠো থেকে অন্ধকারে নিঃশব্দে ছেড়ে দিল। কিন্তু এবারও ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

রেজাভাই বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে বললেন, ভেতরে কেউ নিশ্চয়ই আছে। মনে হয় ভয়ে সাড়া দিচ্ছে না। আমার মনে হয় কবি ভাইয়ের গলা শুনলে পরিচিত কেউ বাসায় থাকলে উঠে আসবেন। আপনি এসে ভাবিকে ডাকুন না।

এ কথায় আমি যেই সিঁড়িতে পা দিয়েছি অমনি পাশের বাসার বাতি জ্বলে উঠল এবং দুয়ার খুলে আমার প্রতিবেশী খাদেম সাহেব বেরিয়ে এলেন। দরজায় এসে তার স্ত্রী ও কন্যা কৌতূহল ভরে দাঁড়িয়েছে। খাদেম সাহেবের মেয়েটি হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, ওমা কবি চাচা এসেছেন। আমি গিয়ে পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি। চাচি তো বিছানা ছেড়ে নামতে পারবে না।

খাদেম সাহেব এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আল্লাহ আপনাকে সুস্থদেহে ফিরিয়ে এনেছেন এজন্য হাজার শোকরগোজার করছি। যান, ভিতরে গিয়ে দেখুন কী অবস্থা। আপনার স্ত্রী তো দুদিন আগে গুরুতর অবস্থায় বাসায় ফিরেছেন। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা স্ট্রেচারে করে তাকে এখানে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখে গেছে। কোমর থেকে নিচের দিকটা একদম নাড়াতে পারছেন না। দু'রাত আমার স্ত্রীই তার সাথে থেকে তার দেখাশোনা করছেন। আজ তিনি নিজেই বললেন তিনি রাতটা একাই থাকতে পারবেন। আমার মেয়েটা থাকতে চেয়েছিল তাকেও থাকতে বারণ করলেন।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার বাসার ভেতরে আলো জ্বলে উঠল এবং কপাট খুলে দিল খাদেম সাহেবের মেয়েটি।

আসুন, কবি চাচা, চাচিকে জাগিয়ে দিয়েছি।

আমি ভেতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। আমার ছোট তিন কামরার এই বাসায় যত আসবাব ও বইপত্র ছিল এর কিছুই নেই। বসার ঘরটা একেবারেই ফাঁকা।

খাদেম সাহেব বললেন, এ পাড়ায় বেপরোয়া লুটতরাজ হয়েছে। আমরা গাঁয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ষোল তারিখ ফিরে এসে দেখি আপনার, আমার আর পাড়ার পলাতক গৃহস্থদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমনকি চৌকি, খাট, লেপতোষক, বালিশ, বাসন কোসন সবই লুট হয়ে গেছে কবি সাহেব। আপনার স্ত্রীকে যারা এখানে আমাদের জিম্মায় রেখে গেছে তারা কোত্থেকে যেন একটা জাজিম এনে ফ্লোরে পেতে তাকে শুইয়ে দিয়ে গেছে।

একথা শুনে আমি দ্রুত গিয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকলাম। আমার পেছনে রেজাভাই, নন্দিনী ও রেজাভাইয়ের তিনজন রাজনৈতিক সঙ্গী।

ভেতরে ঢুকেই দেখলাম ফ্লোরে একটা খোলা জাজিমে বিছানো শাড়ির ওপর সটান শুয়ে আছে হামিদা। অসুস্থতার ধকলে শরীর খানিকটা শীর্ণ মনে হলেও বাহু উন্মুক্ত থাকায় স্বাস্থ্যের দীপ্তি একেবারে ম্লান হয় নি। তার বিশাল দুটিচোখ আমাকে দেখা মাত্রই পানিতে ভিজে গেল। মুখে ম্লান হাসিটি বজায় রেখেই বলল, কখন ঢাকায় এসে পৌঁছুলে?

এই তো দুঘণ্টা আগে।

আমার খোঁজ পেয়েছিল? এই আমার আহত হওয়ার খবর?

হ্যাঁ, জেনেছিলাম।

সে আসে নি?

কার কথা বলছ, নন্দিনীর?

আমি কিছু বলার আগেই পেছন থেকে নন্দিনী বলল, আমিও এসেছি বৌদি, তোমাকে একনজর দেখে জীবন ধন্য করতে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও বৌদি। ... বলেই নন্দিনী হুমড়ি খেয়ে জাজিমের পৈথানে হামিদার অনড় পা দুটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

হামিদা হাত বাড়িয়ে নন্দিনীর বেণীটা স্পর্শ করতে পারল মাত্র। নন্দিনীর কান্না এই স্নেহপর্শে দ্বিগুণতর বেগে ফুলে উঠছে দেখে হামিদা বলল, বিশ্বাস কর বোন আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

এ কথায় নন্দিনীর কান্না সহসা থেমে গেল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আমার অপেক্ষা? জানি কিসের অপেক্ষা। কবি আমাকে বলেছে তুমি নাকি বলেছ আমি এলে তুমি কবিকে ছেড়ে চলে যাবে। আমার মতো একজন পাপী মেয়ের লোভের কাছে পরাজিত হয়ে তুমি তোমার সংসার ছেড়ে চলে যাবে বৌদি? তুমি না একজন বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা? আমার মতো পাপীকে, লোভীকে এক্ষুণি গুলী করে মেরে ফেলতে পার না বৌদি? তোমার পকেটে তো শুনেছি সব সময় একটা পিস্তল থাকতো। আমাকে মেরে ফেল বৌদি, আমাকে শেষ করে দাও।

নন্দিনী শিশুর মতো বিলাপ করতে করতে হামিদার পায়ের তালুতে মুখ ঘষতে লাগল। এ অবস্থায় আমি দেখলাম হামিদা যেন উঠে বসতে চাইছে কিন্তু পেরে উঠছে না। আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার পিঠের নিচে আস্তে চাপ দিলাম। আমার দেখাদেখি রেজাভাইও হামিদার সাহায্যে এগিয়ে এসে তাকে আস্তে করে পিঠে হাতের ঠেলা রেখে বসতে সাহায্য করলেন। হামিদা বসেই নন্দিনীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আমি তোমাকে এবং কবিকে রেখে চলে যাওয়ার কথা যুদ্ধের দিনগুলোতে একবার ভেবেছিলাম নন্দিনী। তখন আমি সুস্থ ও সক্ষম ছিলাম। আমার একজন সতীন থাকবে। এটা ছিল আমার কাছে একদম অসম্ভব ব্যাপার। আমি এখন আর একজন নারী হিসেব সক্ষম নই। আমার স্বামীর যোগ্যও নই। যে কারণে একজন নারী অন্য নারীর আওতায় তার পুরুষকে এক মুহূর্তের জন্য ছাড়তে চায় না, আমার সেই সম্পদ, নন্দিনী, বোন আমার, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তা খুইয়ে ফেলেছি। আর তা কোনো দিন ফিরে পাব না। আমাকে আর কবিকে ফেলে তুই কোথাও যাস না নন্দিনী। আজ থেকে এ সংসার তোর। আমি পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, নিরাশ্রয় মানুষ। তোর কবির কোনো কাজে লাগব না। তবে কবিকে ছেড়ে কোথাও যেতেও পারব না কারণ তোর মতো আমারও এ সংসারে আপন বলতে কেউ নেই। কোথায় যাব? রাষ্ট্র হয়তো পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে। কেন হবে না? কিন্তু আমি তোদের সাথেই থাকতে চাই নন্দিনী। তোদের প্রেম ভালবাসা সন্তান সন্ততি দেখে সুখ পেতে চাই।

নন্দিনী আর থাকতে পারল না হাত দিয়ে হামিদার মুখ বন্ধ করতে গিয়ে বলল, আর বলো না দিদি, তোমার দুঃখ আমি আর সইতে পারছি না। তোমার তো যাওয়ার প্রশ্নই আসে না বরং তুমি দয়া করে তোমার সেবার সুযোগ দিলে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সেবা করে জীবন কাটিয়ে দেব। ভাবব, আমার সীমাদি শত্রুর গুলীতে পঙ্গু হয়ে আমার ঘরে আছে। কবির কাছে নিশ্চয়ই শুনেছ আমার হতভাগিনী দিদির কথা? আজ থেকে তুমিই আমার সেই দিদি। বলেই নন্দিনী হামিদাকে আকড়ে ধরে কাঁদতে লাগল। এ অবস্থায় হামিদার পিঠের নিচে থেকে হাতের ঠেকনা ছেড়ে দিয়ে আমি রেজা ভাইয়ের দিকে তাকালে রেজা ভাই হাসলেন, আমরা তা হলে আসি কবি সাহেব। পরে কোথাও না কোথাও আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে। ঠিকানা রেখে যেতে পারব না। জানেনই তো আসলে আমাদের কোনো ঠিকানা নেই। আমরা এই বিশাল উপমহাদেশের সর্বত্রই আছি। আপনি তো আমাদের দেখেছেন। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন আসামে, মেঘালয়ে, আগরতলায় আর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। আমাদের যুদ্ধটা কার সাথে তা আপনার জানা। আমি ভাবতাম দ্বান্দ্বিক নিয়মেই সবকিছুর সমাধান সম্ভব। কিন্তু আজ এ মুহূর্তে সামাজিক একটি সমস্যার সমাধান দেখলাম। এটা যে কোনো বস্তুতান্ত্রিক দ্বান্দ্বিক সমাধান নয় তা মানতে আমি বাধ্য। আমি তাহলে আসি কবি ভাই।